সমাজ-চিত্র



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত।



ইষ্টেণ্ড্ হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।



১৩২২



মূল্য ১৲ এক টাকা-মাত্র।

Printed by Jatindramohan Das
Wari Printing Works, Dacca.

আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ অকৃত্রিম বন্ধু

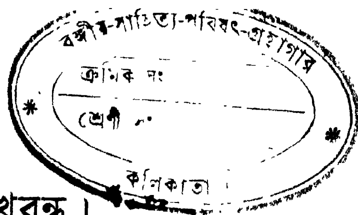
সুকৃত সাহিত্যিক

স্বর্গগত ৺ উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের

সুখ-স্মরণীয়

নামে

এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।



মুখবন্ধ।

এ সংসারে যদি কিছু জ্ঞেয় বা অনুসন্ধানের বিষয় থাকে, তবে তাহা—সত্য ; আর প্রার্থিত বা কাম্য যদি কিছু থাকে, তাহা—শান্তি ও মঙ্গল। ব্যক্তি মাত্রেই মানব-জগতের নিকট ঋণী, এবং মনুষ্য মাত্রেই মানব-জগতের সাধ্যমত মঙ্গল সাধনে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। 'সমাজ-চিত্র' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এতদুদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বজনীন মঙ্গল-উদ্দেশ্যে কোন প্রয়াসই একেবারে ব্যর্থ হইবার নহে।

সত্য লাভ এবং সত্য অবলম্বন ব্যতিরেকে শান্তি বা মঙ্গলের আশা বিড়ম্বনা মাত্র! কিন্তু ইহাও সত্য যে, স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সত্য অনেক স্থলেই অনেকের নিকট বড় প্রীতি-জনক হয় না। মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইলেও ঔষধ অধিকাংশ স্থলেই বিস্বাদ বা তিক্ত। এরূপ অবস্থায় আমার এই 'সমাজ-চিত্র' সকলের নিকট প্রীতিকর হইবে, এ অসম্ভব কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু যাহাদের লোক-জিহ্বার প্রশংসা বা নিন্দার উপরে নিজেদের জীবন, মৃত্যু বা অস্তিত্ব নির্ভর করে না, তাহাদের ইহাতে দুঃখিত বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই।

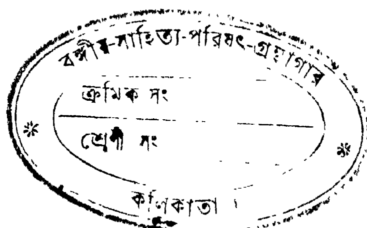
পাপের ও দম্ভের উচ্ছ্রিত শীর্ষ চূর্ণ করিবার জন্য ভগবানের বজ্র কোথায় কি ভাবে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা যেমন কেহই বলিতে পারে না, তেমন মঙ্গলময়ের প্রেরণা তাঁহার কোন্ মুখ্য বা গৌণ উদ্দেশ্যে কাহাকে কখন কোন্ কর্ম্মে নিয়োজিত করে, তাহাও মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। এক্ষেত্রে, এই উদ্যমও বোধ হয় অনন্তদেবের অনন্ত-সূত্রিত নিয়মেরই ফল!

'সমাজ-'চিত্র' প্রকাশিত হইল। ভগবানের কৃপায় যদি ইহা একটি লোককেও আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সংসারে সাবধান হইবার পথে সহায়তা করে, একটি অবস্থাপন্ন যুবককেও সংসারের কুটিল চক্রব্যূহ হইতে মুক্ত করাইতে পারে, একটি দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরও চিত্তে অনুশোচনা আনিতে বা একজন মোহান্ধেরও চক্ষু ফুটাইতে অথবা একটি নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার করাইতে পারে, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

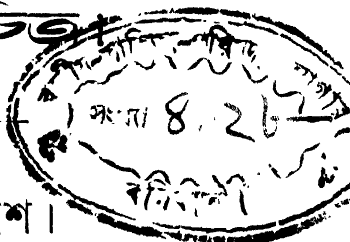
ইষ্টেণ্ড হাউস্, ঢাকা
৩১শে বৈশাখ,
১৩২২ সন।

ইতি
বিনীত
গ্রন্থকার।

"The people's praise, if always praise unmixed
And what the people but a herd confused,
A miscellaneous rabble, who extol,
Things vulgar and well weighed scarce worth the praise
They praise, and they admire they know not what,
And know not whom, but as one leads the other ;
And what delight to be by such extolled,
To live upon their tongues and be their talk,
Of whom to be dispraised were no small praise."



সমাজ-চিত্র



তদ্বিরী যশ।

পার্থিব জীবনের এক সম্পদ্ ধন,—আর এক সম্পদ্ যশ। ধন ও যশের সহিত মানুষের লৌকিক সম্পর্ক দু'দিনের তরে হইলেও, এ দু-ই বড় লোভনীয় পদার্থ,—দু-ই বড় প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

ধনের শক্তি অসামান্য। ধন ক্ষুধায় অন্ন যোগায়, তৃষ্ণায় জলদান করে। যে মান প্রাণ অপেক্ষাও বড়, সে মানও আসিয়া অনেক সময়, ধনের চরণে গল-লগ্নীকৃত-বাসে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় মাথা নোয়াইতে ভালবাসে। ধনের প্রসাদে কালপেঁচা কন্দর্পের পূজা পায়; সাইলক বা রক্তশোষ দাতাকর্ণের উচ্চ অভ্যর্থনায় সংবর্দ্ধিত হয়। রজত-কাঞ্চন-জড়িত গো বা গর্দ্দভও, বুদ্ধির প্রসঙ্গে, বৃহস্পতির সম্মান পাইয়া, মনের গৌরবে, একবার শৃঙ্গ-আস্ফালন বা পুচ্ছ-আন্দোলন করিয়া লইতে পারে। যেখানে যে গুণ বা শক্তি নাই, ধন সেখানেও সেই গুণ বা শক্তি টানিয়া আনিয়া, এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া লয়।

কিন্তু যেখানে গুণে ও ধনে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ঘটে, সেখানকার আর কথা কি ?—সেখানে কখনও ইন্দ্রের অমরা, একদিকে বজ্র-বিদ্যুতে শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করে,—অন্যদিকে নন্দন-কাননের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয় ; কখনও বা কুবেরের অলকা চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চল দৃষ্টিতে খল-খল হাসিয়া উঠে। ধন উপেক্ষার বস্তু নহে। অভ্যস্ত বৈরাগ্যের বলে, ধনের আড়ম্বরে অস্পৃষ্ট রহিতে শিখিলেও, লৌকিক জীবনে ধনকে একবারে অবহেলায় উড়াইয়া দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব ও অসাধ্য। ধন না হইলে, সংসার তিলার্দ্ধ কালও চলে কি ?

যশ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। ধনের যত প্রয়োজন, যশের তত প্রয়োজন নাই সত্য ; কিন্তু তত প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও, উহা ধন হইতে কোন অংশেও কম লোভনীয় নহে ; কোন কোন অংশে বরং অধিকতর গৌরবার্হ ও আদরণীয়। যশ অবশ্যই ধনের মত সংসার-জীবনের নিত্য ব্যবহার্য্য অপরিহার্য্য উপকরণ-রূপে আদর পায় না ;—যশ না হইলেও মানুষ বাঁচে ; সংসার অচল হইয়া পড়ে না। কিন্তু তথাপি মানুষ যশের জন্য চির-উন্মত্ত। এ উন্মত্ততা নিতান্তই অহেতুক উপসর্গ বিশেষ, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, যশের প্রসাদে পানা-পচা কদর্য্য পুকুর হইতেও প্রস্ফুট পদ্মের সৌরভ উত্থিত হইয়া থাকে। যশের জ্যোৎস্নায় পঙ্কিল জলে রজতের লহরী খেলে। অঙ্গারের অঙ্গেও, কারিকরের কৌশলে যশের প্রলেপ পড়িলে ক্ষণকালের তরে, অমল ধবল বিচিত্র অঙ্গরাগ ফুটিয়া উঠে। যশ সকলেই

চায়, এবং প্রায় সকলেই যশের জন্য মনে মনে লালায়িত রহে।

যশের আরও একটা মাহাত্ম্য আছে। বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি অন্য কোন পার্থিব পদার্থেরই সে মাহাত্ম্য নাই। যশ ইহলোকের গণ্ডী পার হইয়া, পরলোকের যবনিকা ভেদ করিয়াও, সময় সময় উঁকি দিতে সমর্থ হয়। উহা কখন কখন পরলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া, পরলোকগত যশস্বীকে আপনার সেই ভুবন-মোহন বাঁশরীর মন-মাতান মধুর সঙ্গীত শুনাইতে চেষ্টা করে; এবং তাঁহাকে অমর বর দিয়া, ইহলোকেও তাঁহার স্মৃতিটিকে অক্ষয় অমর সম্পদে বাঁচাইয়া রাখিতে যত্নপর হয়। অযোধ্যার রাম যশের প্রসাদেই চিরজীবী এবং ভারতের স্বর্ণসিংহাসনে চির-প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্রের কবি-কীর্ত্তিত সেই পঞ্চপাণ্ডব এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি এখন নাই, একথা বলিলে চলিবে কেন? যশের অক্ষয় ফণোগ্রাফে এখনও তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনিত এবং সেই বজ্র-গভীর নাদে পৃথিবী, তখনকার মত কম্পিত না হইলেও, এখনও রোমাঞ্চিত।

সোনা যেমন আসল ও কৃত্রিম, এবং পাইনের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর,—টাকা যেমন মেকি ও খাটিভেদে বিভিন্ন, যশও তেমন আসল ও কৃত্রিম ভেদে, এবং পাইনের তারতম্য অনুসারে অনন্ত প্রকারের। কিন্তু সকল শ্রেণীস্থ যশের বিভিন্নরূপ প্রকার প্রদর্শন,—বিস্তৃত যশ-কুলজীর অন্তর্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বংশাবলীর সম্যক্ পরিচয় প্রদান সহজসাধ্য নহে। সুতরাং, আমরা এই প্রবন্ধে যশকে অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে মাত্র

দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইলাম। একটি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ যশ,--আর একটি তদ্বিরী যশ।

যশোলালসা মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি সকলেরই আছে। কিন্তু পাত্রভেদে, যশোলালসার বিকাশ ও বিকারের মাত্রা-ভেদ বিস্তর। যশ বা সুনাম, মানব-নামধারী জীব মাত্রেরই প্রাণ-প্রিয় বস্তু। সকলেই উহা চায়, এবং চায় বলিয়াই যশ অর্জ্জনার্থ, আপন আপন প্রবৃত্তি, প্রকৃতি বা শিক্ষার অনুরূপ যত্ন করিয়া থাকে। এ অংশে যে ভাগ্যবান্, তাহাকে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, 'যশ যশ' করিয়া ঢুঁরিয়া বেড়াইতে হয় না; যশই যেন, তাঁহার আশ্রয়ে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত, তাহাকে খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করে। যাহার ভাগ্য তত প্রসন্ন নহে, সে বহু অন্বেষণে, বহু যত্নে, উহার সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই হতভাগ্য তাহাদিগের কথা পৃথক্। তাহারা যশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াও পোড়া যশের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না; অবশেষে যশের মালা ভ্রমে বিচটীর কণ্ঠী গলায় জড়াইয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

যশ কোথাও মদিরার মত উন্মাদক, কোথাও সুপেয় সরবতের মত প্রমোদক, এবং কোন কোন স্থানে, মলয় অনিলের ন্যায়, সুবাস-স্নিগ্ধ ও প্রাণ-পরিপোষক। কিন্তু সুরা ও সরবৎ না খুঁজিলে পাওয়া যায় না। মলয় অনিল, ইচ্ছাপূর্ব্বক উহার গতিরোধ না করিলে, আপনি আসিয়া আলিঙ্গন করে। যশের সম্বন্ধেও এই কথা। যশ যখন সুরা সরবতের অবস্থাপন্ন, তখন

উহাকে যোগাড় যন্ত্র করিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। আর যখন উহা মলয়-অনিল সদৃশ স্বয়ং-প্রবহমান, তখন আপনি আসিয়া আপনার সুগন্ধি নিশ্বাসে কর্ম্মী পুরুষের স্বেদার্দ্র ললাট চুম্বন করিয়া লয়।

যাহারা যশের নেশায় আত্মহারা হইয়া যশ-শিকারে বহির্গত হয়, যশ প্রায়শঃ তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না। তাহারা যতই উহার পানে অগ্রসর হয়, উহাও ততই, মরুর মরীচিকা, আবিল জলের আলেয়া বা আকাশের রামধনুর মত, দূরে দূরে সরিয়া সরিয়া রহিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর যশোলিপ্সুর বহু আয়াসলব্ধ যশই তদ্বিরী যশ। তদ্বিরী যশের অধিকাংশই অসার, অস্থায়ী, ভেজাল বা কৃত্রিম। উহা এই আছে,—এই নাই! যখন থাকে, তখন খুবই জাক-যমকের সহিত ফুটিয়া পড়ে; যখন যায়, তখন আবার তেমনই ভাবে যায়,— সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত বা বজ্রাহত ব্যক্তির প্রাণ-বায়ুর ন্যায়, কোন্ পথে কেমন করিয়া চলিয়া যায়, ভাল করিয়া কেহ তাহা টেরও পায় না। একবার গেলে উহার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না। যাবৎ থাকে, তাবৎ দিগঙ্গনাগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কুলু-কুলু উলুধ্বনিতে দেশের একার্দ্ধ আমোদিত ও অপরার্দ্ধ ঈর্ষ্যানলে কলুষিত করিয়া তুলেন। কিন্তু বিপরীত দিক্ হইতে বাতাস বহিবা মাত্রই,—সত্যরূপী প্রখর রবির আলোক-পাতে, উহা মাঘের কুয়াসার মত চক্ষের পলকে উড়িয়া বা শুষিয়া যাইতে থাকে, তখন হঠাৎ এক সঙ্গে সমস্ত ঢাক-ঢোল নীরব ও উলুর কলকণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া রহে।

অবিমিশ্র বিশুদ্ধ যশ কোনরূপ তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের অপেক্ষা রাখে না। উহা চিরদিনই সুকৃতির অনুসরণ করিয়া ফিরে এবং সেই সুকৃতি বা সদনুষ্ঠানের গৌরব ও গুরুত্ব অনুসারে উহার স্থায়িত্ব সংঘটিত হয়। কীর্ত্তিমান্ কৃতী পুরুষ প্রায়শঃ যশের কামনায় সুকৃতির অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা কখনও কর্ত্তব্যের অনুরোধে কঠোর ব্রতধারী হন, কখনও ধর্ম্মের পাদপীঠে প্রাণের টানে আত্মোৎসর্গ করেন, কখনও বা প্রীতি বা দয়ার মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, পরার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন। যশ তাঁহাদিগের পুণ্যব্রতের আনুষঙ্গিক ফল,—বিধিপ্রদত্ত পুরস্কার,—মানবীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার কল্যাণকর আশীর্ব্বাদ। এই শ্রেণীর লোক-আকাঙ্ক্ষিত, স্বয়মিচ্ছু জনসাধারণের প্রদত্ত যশই মানুষের ঐহিক অমরত্ব-বিধায়ক দুর্লভ সম্পদ্। এই যশের প্রসাদেই মানুষ মানুষের নিকট পূজা পায় ;—মানবশরীরেই দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যশোলালসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা হৃদয়িক উপাদান। মঙ্গলময় ভগবানের অনুশাসন-নীতিতে, মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত সমস্ত উপাদানই মঙ্গলবিধায়ক। কিন্তু সেই মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়িক উপাদানগুলিকে প্রতিনিয়তই নীতি ও সংযমের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথা মঙ্গল অমঙ্গলে,—অমৃত গরলে পরিণত হইয়া যায়। যে তাপ ভিন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচে না, সেই প্রাণরক্ষক তাপই যখন আবার আপন প্রতাপে সংযমের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনলের মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠে তখন তাহাতেই পুড়িয়া মরিতে হয়।

মানুষের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয়বিধ মনোবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, এবং সংযমের শৃঙ্খলে নিয়মিত রহিলে এই উভয়বিধ মনোবৃত্তিই সুফল প্রসব করিয়া থাকে। অন্য মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যে কথা, যশোলিপ্সা বা যশোলালসা সম্বন্ধে সেই কথা। নিঃস্বার্থকল্প, যশোলাভে বীতস্পৃহ ও পরকীয় কল্যাণ-সাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই প্রাণে কৃতার্থ, ঈদৃশ নিষ্কামধর্ম্মী, প্রেম ও দয়ার প্রতিকৃতিস্বরূপ জগৎপূজ্য প্রাণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু জীবিতকালে প্রশংসার মধুপানে উজ্জীবিত রহিব, এবং মৃত্যুর পরেও লোকের মনোমন্দিরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিতে পরিপূজিত হইব, এই আশা মনে পোষণ করিয়া, এবং কতেকটা যশোমদিরার অনিবার্য্য পিপাসায় ও কতেকটা প্রাণের স্বাভাবিক টানে, পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়া, পরার্থ আত্মবিসর্জ্জনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হন, এরূপ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাপুরুষগণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

এক্ষেত্রে যশের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাণে যশঃতৃষ্ণা প্রবল। যশোলাভের উপযুক্ত উপকরণ তহবিলে নাই। এ অবস্থায় যশোলাভ অদৃষ্টে না ঘটিতে পারে; কিন্তু তথাপি ঐ যশোলালসা হইতেও অন্য প্রকারে, বিশেষ ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যথার্থ যশোলালসা যশোলালসিত ব্যক্তির, পাপকর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে, একটা গুরুতর বাধা বা অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠে। যে যশ চাহে সে সর্ব্বদাই অযশস্য কর্ম্ম করিয়া অপবাদগ্রস্ত হইবার ভয়ে শঙ্কিত রহে।

যশ ও নিন্দা পরস্পরবিরোধী। যদিও দেখা যায় যে, একজনের কল্যাণে, একদিকে যে সময়ে অনুরাগী ও উদার রসনায় যশের ঝঙ্কার উত্থিত হয়, ঠিক্ সেই সময়েই, অন্য দিকে অনুদার ও বিদ্বিষ্ট রসনায় ঈর্ষ্যার গরল-উদ্গার উৎসারিত হইতে থাকে, তথাপি যশ ও নিন্দায় যে জল ও অনলের ন্যায় চির বৈরভাবাপন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া প্রশংসার কল-কল্লোল, সেইস্থান টুকু যুড়িয়া নিন্দার অনল এক সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। যিনি নিরপেক্ষ ন্যায়ের বিচারে জগতের হিত-কামনায় আত্মসুখের এক কণিকাও বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তিনিই যশ-শ্রীতে ভূষিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি যদি সর্ব্বতোভাবে নিস্কাম বা নির্ব্বিকার নাও হন, তথাপি উপযুক্ত মাত্রায় যশোলাভে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাঁহার পক্ষে যশের আস্বাদলাভ প্রয়োজনীয়ও বটে। বলিতে কি, যশের মন-উন্মাদন বংশী-ধ্বনি শ্রুতিপথে প্রবেশ লাভ করিয়া, যদি মানব-হৃদয়ে একটা বিস্ময়াবহ অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে না পারিত, তাহা হইলে, এই সংসার-মরুর, পরার্থ-উৎসর্গীকৃত অধিকাংশ প্রেম-মন্দাকিনীই অচিরে শুষ্ক হইয়া যাইত। পৃথিবীর কাব্য ও ইতিহাসগুলিও লোকোত্তর পুরুষদিগের অলোকসাধারণ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিত না। ঐ সকল কাব্য ও ইতিহাস প্রণেতৃগণ যদি এই প্রাণ-উন্মাদন সঞ্জীবন-রসের আস্বাদ-সুখ গ্রহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তাঁহাদিগের ভবিষ্য পুরুষদিগের জন্য অমৃতধারায়

অমন অফুরন্ত উৎস খুলিয়া রাখিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন কিনা, সন্দেহ।

মানুষ স্বভাবতঃই যশোলুব্ধ। তাহাতে আবার ইতিহাস, বিভীষিকাময়ী প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় অপযশগ্রস্ত দানব-চরিত্রের চিত্র পার্শ্বে অঙ্কিত রাখিয়া, জয়-শ্রীতে বিলসিত গৌরব-বিগ্রহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যশের ভেরী বাজাইয়া, মানুষকে দ্বিগুণ প্রলোভিত ও উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে ;—তাঁহার স্মৃতি যাহাতে এই মর্ত্তধামের অচির-নিবাসে চিরস্থায়িনী হইয়া রহে, তদর্থ তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়া লইতেছে। কাব্যও তাহার সুচিত্রিত পটে, ঐন্দ্রজালিক তুলিকা-স্পর্শে ঐ একই আলেখ্য আঁকিয়া রাখিতেছে ; আর যশঃ-কিরণ-উদ্ভাসিত সুকীর্ত্তি দেবীর ঊর্দ্ধস্থিত মন্দিরের দিকে মানুষের হৃদয়, মন ও প্রাণকে সবলে আকৃষ্ট করিতেছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক থাকুক, আর না থাকুক, যশের স্বভাব-লুব্ধ মনুষ্য, কালের যত্ন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্তর স্বরূপ ইতিহাস কিংবা জাতীয় হৃদয়ের অভিব্যক্তি—কাব্যের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে একবারে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে কি ?

বিশুদ্ধ যশ ইহলোকের বস্তু হইলেও দেব-ভোগ্য অমৃত। দেবতা যেমন উহার জন্য লালায়িত, অসুরও ইহার জন্য তেমন প্রলুব্ধ। স্মৃতিরূপিণী মোহিনী যত্নের সহিত দেবতাদিগকে উহা বণ্টন করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ অমৃত-পানে অমল-ধবল-অমর-কিরণে উদ্ভাসিত ও উৎফুল্ল রহেন। অসুরও কলে-কৌশলে

চুরি করিয়া, উহার ভাগ লইয়া, ছিন্নগ্রীব হইয়াও বাঁচিয়া থাকে; এবং সুযোগ পাইলেই, রাহুর বিকটমূর্ত্তিতে জগতের আনন্দপ্রদ আলোকপিণ্ড,—চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া বইসে। রামও যশস্বী,—রাবণও এক হিসাবে যশস্বী। কিন্তু রামের যশঃ-সঙ্গীতে জগতের প্রাণ শীতল হয়,—রাবণের যশোহুহুঙ্কারে পৃথিবীর প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যশের প্রসাদে রামও অমর,—রাবণও অমর। কিন্তু একের অমরত্বে আশা,—অন্যের অমরত্বে আতঙ্ক। একের কীর্ত্তি সুযশ নামে সম্পূজিত,—অন্যের কীর্ত্তি অখ্যাতি বা অপযশ আখ্যায় কলঙ্কিত। যে যশের ভিত্তি জগন্মঙ্গল্য ভাবের উপর, পরার্থিনী প্রীতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সেই যশের বিজয়-দুন্দুভিই দেবলোকে ধ্বনিত হইয়া থাকে, আর যে যশের ভিত্তি পরপীড়ন ও আত্মম্ভরিতার কমঠ-পৃষ্ঠে পিহিত, তাহারই নামে আকাশে উল্কা ছুটে, বাতাসে অনল বহে, সলিলে প্রবল তরঙ্গ উঠে এবং ভয়ার্ত্ত জীব-জগৎ হইতে 'ত্রাহি মধুসূদন' ধ্বনি সমুত্থিত হয়!

যশের প্রকার ও প্রকৃতি, প্রয়োজন ও বিকৃতি, এবং গুণ ও অগুণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। প্রকৃত যশস্বী ব্যক্তিও সংসারক্ষেত্রে পরকীয় ঈর্ষ্যা ও অসূয়াবশে, স্তুতির পরিবর্ত্তে, সময় সময়, নিন্দার দংশনে ক্লিষ্ট ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে এমন ভাগ্যবান্ যশস্বী পুরুষ কে, যিনি একই সময়ে, একদিকে স্তুতির বিনোদ পুষ্পমালায় সংবর্দ্ধিত,—অন্যদিকে নিন্দার কদর্য্য ক্লেদে লাঞ্ছিত না হইয়াছেন? আলেক্‌জাণ্ডার, জুলিয়াস্ সীজার, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির ত কথাই নাই।

প্রাতঃস্মরণীয় ভগবৎ পুত্র জগদ্‌বরেণ্য মহাত্মা খৃষ্টদেব এবং সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহরূপে পরিপূজিত বাসুদেবও এইশ্রেণীর পার্থিব লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যশের প্রকৃত পরীক্ষা কর্ম্মে ;—সাময়িক নিন্দা বা স্তুতিতে নহে।

প্রকৃত যশস্য কর্ম্মের সহিত যে যশের সম্পর্ক, আমরা সে যশের কথা বলিলাম। এই যশই খাটি যশ। কিন্তু আজি কালি দেশে আর এক শ্রেণীর যশ ও যশস্বীর নূতন অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শ্রেণীর যশ ও যশস্বীর সহিত অধিকাংশ স্থলেই যশস্য কর্ম্মের সম্পর্ক বড় কম! আদিতে প্রত্যেক জিনিষই সাধারণতঃ একবিধ থাকে। কালে ব্যবহারের দোষে বা গুণে উহাতে ভাল ও মন্দ বহু প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগের হেতু সমুৎপাদিত হয়। ঐ আদি অবস্থাই উহার আসল বা প্রকৃত অবস্থা। এখন অনেক জিনিষেরই সেই আদিযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আসল জিনিষের প্রকার বা অবস্থাভেদে রূপান্তর এক কথা,—আসলের স্থলে নকলের অনধিকার প্রবেশ আর এক কথা। আজি কালিকার এই "গিল্টির যুগে" আসল অপেক্ষাও নকলের বাজারই অধিকতর গুল্‌জার! সকল জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। যশেরও তাহা না থাকিবে কেন? পূর্ব্বকালে, লোক-হিত-কল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজনিত শ্রমভারে অবনত লোকদিগেরই যশোরূপ সম্পদ্ স্বতঃলভ্য ছিল। তাদৃশ লোকেরা আপন আপন সুকৃতি বলে, যে কীর্ত্তিলাভ করিতেন, তাহাই যশ আখ্যায় সর্ব্বত্র বিঘোষিত ও সম্মানিত

হইত। কিন্তু এক্ষণ এই শ্রেণীর খাটি যশ ব্যতিরেকেও, বাজারে আরও এক শ্রেণীস্থ যশের প্রচুর আমদানী হইয়াছে। এই নকল যশের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়, আসল যশও বাহিরে ফুটিবার পথপ্রাপ্ত না হইয়া অন্ধকারে মাথা গুজিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বত্রই চর্ব্বির স্থলবর্ত্তী যদি হয় ঘৃত, পেষিত তণ্ডুলের ক্বাথ যদি হয় দুগ্ধ, সৈন্ধব মিশ্রি এবং লবণ যদি হয় চিনি, তাহা হইলে, বিনা পরখে খাটি জিনিষ চিনিয়া লওয়া কেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক। এই হেতুই এক্ষণ কোন্ যশ প্রকৃত, কাহার জয়ধ্বনি প্রয়োজনায়, অনেক সময় লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, খাটি যশকে উপেক্ষার ভাবে সরাইয়া রাখিয়া দেয় এবং নকলকে আসল মনে করিয়া উহারই নামে উল্লম্ফন করে; এবং খাটি যশও ঐরূপে উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কায়, নারব জয়ঢাক কাঁধে লইয়া নীরব মিশিলের অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। চর্ব্বির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, খাটী ঘৃতের অভিমানে আঘাত লাগা কোন অংশেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

নকল যশগুলির সমস্তই তদ্বিরা যশের অন্তর্নিবিষ্ট। এই তদ্বিরা যশের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা কুত্রাপি স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, এবং তদ্বিরে বাধা পড়িলে বা তদ্বির থামিয়া গেলে, উহা আর তিলার্দ্ধকালও স্ববলে ও স্ববশে জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না।

পৃথিবীর সকল অকৃতী ও অকর্ম্মার দল যশোলোভে মুগ্ধ হইয়া, তদ্বিরা যশের অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়।

এই অস্থায়ী কৃত্রিম যশোলাভের জন্য তাহারা যে শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে, সেই আয়াস ও শ্রমটুকু, কোন সৎসঙ্কল্পে, তেমনই আগ্রহের সহিত প্রযুক্ত হইলে, তাহারা যে যশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া, আসলের পরিবর্ত্তে নকল পাইয়াই মনকে প্রবোধ দিতে উৎসুক হয়, সেই খাটি যশ-লাভেই কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু অধুনা যুগধর্ম্মে গোবর্দ্ধন ধরিয়া, গোকুল রক্ষায় কাহারও যত্ন, ঔৎসুক্য বা সামর্থ্য নাই,—রাস-লীলার মধুপানে প্রায় সকল রসনাই লালায়িত!

এদেশের কর্ম্ম-ভূমিতে, কর্ম্ম এখন প্রায় সকল বিভাগেই অল্পাধিক মাত্রায় ধিক্কৃত বা বিড়ম্বিত। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই আলস্য, অকর্ম্ম কিংবা কুকর্ম্মের পূর্ণ আধিপত্য। ধন, মান ও যশোলাভের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু তজ্জন্য সাধু, সৎ ও সরল পথে পা ফেলিয়া, শ্রম ও কষ্ট স্বীকারে অধিকাংশেরই মতি নাই। ধনলিপ্সু কর্ম্ম করিয়া, পরিশ্রমের কঠোর সাধনায়, ধনদা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভালবাসে না। আলস্যের সুখ-শয্যায় নয়ন মুদিয়া শুইয়া থাকিব, আর কুবেরের অলকা আপনা হইতে আমার পর্ণকুটীরে অজস্র ধারায় সোনার চাঁপা বর্ষণ করিবে,—রাতারাতি রথ্‌চাইল্ড বা জগৎশেঠ হইয়া নয়ন উন্মীলন করিব,—অনেক ধনার্থীরই এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। যশোলিপ্সুর পক্ষেও ঐ কথা; যশস্য কর্ম্মানুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিব না, তথাপি চারিদিক হইতে লোকে "শ্রুত্বাতিদূরে ভবদীয়া কীর্ত্তি"—এই মন্ত্রে আমার বন্দনা গাইবে। সুতরাং ধন লাভ ও যশ উপার্জ্জন, এই দুই দিকেই এক্ষণ শ্রম অপেক্ষা তদ্বিরের

প্রভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ধন চাই, কঠোরশ্রমে আয়ুক্ষয় করিব না, তদ্বির ও যোগাড় যন্ত্রের কৌশলে অনায়াসে ধন লাভ হইবে। যশ চাই, যশের জন্য স্বীয় এক তিল স্বার্থ উৎসর্গ অথবা শরীরের একবিন্দু ঘর্ম্মপাতও করিব না, অথচ তদ্বিরের কৌশলে যশঃশ্রীতে চিরবিলসিত রহিব। যাহারা শুধু এইরূপ তদ্বিরের আশ্রয়ে ধনার্জ্জনে উৎসুক, তাহাদিগের কেহ বঞ্চক, কেহ ঠক, কেহ চোর, কেহ ডাকাত; মিথ্যুক তাহাদিগের প্রায় সকলেই। তদ্বিরী যশোলিপ্সুদিগের সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাই প্রযুজ্য। তাহাদিগের মধ্যেও চোর,ডাকাত, দস্যু, বঞ্চক, ঠক ও মিথ্যুক,—এ সমস্তই আছে।

যাহারা তদ্বিরের কৌশলে, অন্যকৃত কর্ম্মে আত্মনামের সিল-মোহর বসাইয়া দিয়া যশস্বী হয়, তাহারা হয় তস্কর,—না হয় বঞ্চক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহারা মনে মনে আপনাকে চতুর-চূড়ামণি ঠাউরাইয়া লইয়া অষ্টপ্রহর বাহাদুরীর ভাবেই ডগ-মগ থাকে। যাহারা প্রতাপ, প্রভুত্ব ও শক্তিদ্বারা অভিভূত রাখিয়া ক্ষীণশক্তি যশস্বী ব্যক্তির যশ কাড়িয়া লয়, তাহারাই এক্ষেত্রে দস্যু। এই কর্ম্ম দ্বারা তাহারা লজ্জিত হয় না, বরং আত্মপ্রাধান্য চিন্তা করিয়া, গর্ব্বভরে দ্বিগুণ স্ফীত হইয়া উঠে। যাহারা পরের যশ অপহরণ করে বা পরের সুনামের উপর বাটপারি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের মনেও, ঐ উপায়ে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষাই বলবতী থাকে। কিন্তু তাহারা কখনও যশস্বী হইতে পারে না। তাহারা অন্যকে ভিখারী বানায় সত্য,—নিজে কখনও যশোধনে ধনী হইতে সমর্থ হয় না।

এখন প্রায় দেশের পোনে ষোল আনা লোকই তদ্বিরী যশের ভিখারী। এই যশ উপার্জ্জনের জন্য প্রায় সকলেই প্রাণপণে যত্নশীল। প্রতিভা নাই?—নাই বা থাকিল, অন্যের নিকট প্রতিভান্বিত নামে পরিচিত হইতে পারিলেই ত হইল। ধন নাই?—লোকে ধনী বলিয়া সম্মান করুক; মান নাই?—লোকে মানী বলিয়া বুঝুক; বিদ্যা নাই?—লোকে বিদ্বান্ বলিয়া সম্মান করুক। প্রতিভাকে জাগাইতে, ধনে ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে, মান বাড়াইতে এবং বিদ্যা লাভ করিতে যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, সে কষ্টে তনুক্ষয় করিয়া লাভ কি? তদ্বির বা যোগাড় যন্ত্রের চতুর-চাতুরিতে লোককে, ঐ সকল আছে বলিয়া, বুঝাইয়া লইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এই ভাবেরই এক্ষণ প্রবল আধিপত্য। এইকারণেই আজি কালি বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র পুস্তক লইয়া পরিশ্রম করে, প্রতিভাভিমানী সহাধ্যায়ীদিগের নিকট, তাহাদিগের কাহারও নাম গাধা, কাহারও নাম গরু। পুস্তক না ছুঁইয়াই পণ্ডিত হইব, না পড়িয়াই পরীক্ষায় পাস করিব, ইহা না পারিলে আর প্রতিভার বাহাদুরি কি?—এই বাহাদুরির পরিণাম অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দাঁড়ায় যে, পরীক্ষার সময়, বিদ্যালয়ের গর্দ্দভেরা বসিয়া লিখে, আর সুচতুর প্রতিভাশালীরা তাহাদের পাশে বসিয়া নকল করে, এবং অনেক সময়েই, এই তদ্বিরের প্রসাদে পরিণামে পাসের যশ না পাইয়া অভিশাপের নির্ঘাত আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে।

বর্ত্তমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাঁহারা তদ্বিরের অব্যর্থ সন্ধানে যশস্বী, তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্ব মাসিক সাহিত্য বা

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। যিনি কালি কলমে, 'খাচ্ছি, দিচ্ছি, নিচ্ছি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যোজনা করিয়া, একটা কথোপকথনের শিকলা গাঁথিয়া দিতে পারেন, অথবা ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের ছাঁচে ঢালিয়া নাটক নামে অকটা 'আজগুবি চিজ্' খাড়া করিয়া লইতে সমর্থ হন, তিনিই নাটককার। সে নাটককারও ছোট-খাট গোছের নহে, একবারে কালিদাস বা শেক্ষপীরের সমকক্ষ! দুটি কথা মিল দিয়া লিখিতে পারিলে, আর রক্ষা নাই, অমনি সে কবি-যশঃপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইল! তাহাকে নবীন, হেম বা রবি কবি বলিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে না, একবারে তাহার শেরিডান, সাথী, মিল্‌টন বা টেনিসনের সমান যশ পাওয়া আবশ্যক। "মনের কথা তাই লো তাই"—গোছের একটা কিছু কাহিনী লিখিয়া তুলিতে পারিলেই, লেখক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ে নাম লিখাইয়া বাঙ্গালার স্কট্ বা ডুমা হইতে উৎসুক হয়; এবং সূতা-ছেড়া ভাবশূন্য গদ্যে শব্দের একটা বোম্বার্ডমেণ্ট যে ফুটাইতে পারিল, তাহারই কার্‌লাইল, বা ইমার্সনের প্রতিভার উপর দাবি পহুঁচিল!

ঈদৃশ যশতৃষ্ণার তৃপ্তি কোথায়,—কিরূপে হইরে?—ইহা স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বোধ হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে অসম্ভব নহে। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাও তদ্বিরের গুণে, মাসিক সাহিত্য ও সংবাদ পত্রের মন-রাখা উদার দৃষ্টির প্রসাদে, অনেক সময়েই, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সার্টিফিকেট্ পাইয়া তরিয়া যাইতেছে!

সংবাদ-পত্র প্রভৃতি শুধু পরকীয় যশের তদ্বির দিয়াই নিরস্ত নহে। তাহারা এই উপায়ে আপনাদিগের নিজের তদ্বিরটাও

একটু করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।—এদেশে সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের অনন্ত নাম। কাহারও নাম 'বিশল্যকরণী', কাহারও নাম 'অস্থিসঞ্চারিণী', কেহ 'মৃত-সঞ্জীবনী,' কেহ 'প্রত্নতত্ত্বনন্দিনী'; কাহারও নাম 'ভাববিকাশ,' কাহারও নাম 'প্রেম-প্রকাশ' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সমসাময়িক সখিত্বের দুটী ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ দুটী ভাব পরস্পর বিপরীত ও বিরুদ্ধ। কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীই রুচি বুঝিয়া রোচক ও মন বুঝিয়া মোদক যোগাইতে না পারিলে, ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় না। ব্যবসায়ী সাময়িক সাহিত্যগুলির মধ্যে যাঁহারা মেছোবাজার বা বিলিংস্ গেটের বুলী ধরিয়া, নিদ্রিত মিঞাভাইদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আসর জমকাইতে উৎসুক, তাঁহারা পরস্পরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নবমীর পর্ব্বে তান ধরেন; আর যাঁহারা এখনও লোকের নিকট ভালরূপ পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা পরস্পার পরস্পরের প্রশংসায়, ষষ্ঠী ব্রতের 'বায়না বদলের' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 'বিশল্যকরণী' বলেন, 'অস্থিসঞ্চারিণীর' মত পত্রিকা বাঙ্গালায় আর হয় নাই, ইহা বিলাতের ওভারল্যাণ্ড মেইলের (Overland Mail) সমকক্ষ। আবার 'অস্থিসঞ্চারিণী' বলেন,—'বিশল্যকরণীর' কথা আর কি কহিব, 'বিশল্যকরণী' ভারতের টাইম্‌স্ (Times)। পরস্পর এইভাবে প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তাঁহারা কখনও দেশহিতৈষিতার নামে তীব্ররসিকতার বুকুনি ঝাড়িয়া, দেশের মঙ্গলবিধাতা রাজপুরুষদিগকে চটাইয়া তুলেন, কখনও বা মানী ও পদস্থ ব্যক্তির মানে আঘাত করিয়া

সাহসিকতার পরিচয় দেন। এই সকল অনুষ্ঠানই আত্মযশ-খ্যাপনের পরিপক্ক তদ্বির ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিজ্ঞাপন নব্যযুগের প্রধান ভাট। বিজ্ঞাপন অহোরাত্র সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বার দিয়া, রাজপথের উচ্চ স্তম্ভে বসিয়া, অথবা চলন্ত পদাতিকের ঘাড়ে চাপিয়া, বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ, চোরকে সাধু, সাধুকে চোর, ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল ও চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে! বিজ্ঞাপনের বলে যে কত কুসুম-সুবাসিনী তৈল, কত মনোমাদিনী আরক, কত দন্ত উৎপাটনী চূর্ণ, কত জ্বরভঙ্গ-গজাঙ্কুশবটীকা, ব্যাকরণ ও শিষ্ট প্রয়োগের শ্রাদ্ধ করিয়া, বাজারে যশের ঢক্কা বাজাইয়া আপন আপন পসার জমকাইয়া লইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপনের প্রসাদে কত পতিভিখারিণী পতিলাভ করে, কত অবরণীয় বর্ব্বর বরের গৃহশূন্যতা দোষ দূর হয়, কত পত্নী-বিয়োগ-বিধুর বৃদ্ধ, সংসার সরিৎ তরিবার উদ্দেশ্যে তরুণীর আশ্রয় লইয়া ঝটিকা-তাড়নে ডুবিয়া মরেন। যশের তদ্বিরে বিজ্ঞাপন অমোঘ অস্ত্র।

উকীল, ডাক্তার, মোক্তার ও কবিরাজ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও গুরুঠাকুর, প্রচারক, বক্তা ও লেখক যশের তদ্বিরে কে না আকুল,—কে না অধীর?—যোগাড়ী ডাক্তার সামান্য সর্দ্দির হাঁচিতে তীব্র কফ মিক্‌চার লাগাইয়া রোগীকে আড়ষ্ট করিয়া রাখেন, আর সুহৃদ্ সংবাদপত্রের প্রসাদে যক্ষ্মা আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্নপর হন। ফিকির-বাজ কবিরাজ কখন কখন পোণ্টার ভার হাতুড়ের

হাতে দিয়া, উপাধির মালা কণ্ঠে দোলাইয়া, চড়ক ও সুশ্রুতের অঙ্গে আধুনিক রুচির ডাক্তারি নিশান চড়াইয়া, আপনি ধন্বন্তরি সাজিয়া বসেন! কোথায় বা সে ধন্বন্তরি, আর কোথায় বা এই ভুঁই-ফোড় সহস্রমারী! এ সমস্তই যশের তদ্বির বা যশের অকালবোধন বা অধিবাস। স্বপক্ষীয় নাম-করা সাক্ষীর চির-অভ্যস্ত কারিকরিতে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া, অমনি সে মোকদ্দমার জটিলত্ব ও কুটিলত্বের অশেষ স্তর প্রদর্শন সহকারে, উহার বিস্তৃত বিবরণদ্বারা প্রণয়-বন্ধ সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা পূরণ করা হইল। এ দুরূহ মোকদ্দমায় উকীল বা মোক্তার ছিলেন কে?----অমূক বা অমুক। নামটি বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে ফুটিয়া পড়িল। ইহাও উকীল মোক্তারের পক্ষে যশেরই এক প্রকার তদ্বির বটে।

বক্তা বকিয়া বকিয়া, সভাগৃহে বিরক্ত শ্রোতার কান ঝালাপালা করিলেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বিঘোষিত হইল, অমুক বক্তা গ্লাডস্টোন বা কেশব সেনের স্থলবর্ত্তি। প্রচারকদিগের অধিকাংশই এক্ষণ লুথার বা সেণ্টপলের সমশ্রেণীস্থ। তিলক, নামাবলী ও ফোঁটার প্রসাদে সিঁধাল চোর বা দুর্দ্ধষ লাঠিয়ালও, কিরূপে সময় সময়, সাধুজী বা জগদ্গুরু, নামে তরিয়া যায়, অথবা কত ভেল্‌কীবাজ কল্কী অকালে প্রলয় ঘটাইয়া ভয় ও বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক স্থানেই গুরুজী ভাবেন বার্ষিক প্রণামী,—পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণা! শিষ্য বা যজমানের ইহকাল ও পরকাল গোল্লায় যাউক, সে ভাবনা ভাবিবার অবসর কোথায়? অথচ, নামাবলী,

জপের মালা, তিলক ইত্যাদি উপলক্ষণ ও কথায় কথায় হরি-নামের ফাকা আওয়াজে ভগবদ্ভক্তি, ধর্ম্ম ও পাণ্ডিত্যের বাহ্য বাহ্বাস্ফোটন করিয়া লন ষোড়শোপাচারে। ইহাই অধিকাংশ স্থানের চলিত ব্যবস্থা। যশের তদ্বির প্রায়শঃই অকাণ্ডে এইরূপ প্রলয় ঘটিয়া থাকে।

রাজা, জমিদারগণ ও ভূম্যধিকারীদিগের অনেকেই তদ্বির ও যোগাড়ের গুণে, কৃষীপ্রজার কষ্টসঞ্চিত শোণিত শোষণ করিয়া সেই মূল্যের যশের উচ্চ উপাধি ক্রয় করিয়া কৃতার্থ হন! তাহারা কখনও মধুর কথার মন-মাতান মোহিণীতে অজ্ঞ প্রজার মন ভুলাইয়া, কখনও বা পীড়নের অপ্রতিহত কৌশলে বাধ্য করিয়া, প্রজার 'সেলামী' সংগ্রহ করেন ও উচ্চ রাজপুরুষদিগকে সাক্ষী রাখিয়া, লোকহিতৈষণা বা দয়ার প্রবিত্র নামে, নিরশ্রুনয়নে ক্রন্দন করিয়া, নিরাকার জলে বক্ষ ভাসাইয়া দেন এবং মুক্তহস্তে সেই অর্থ "তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঢালিয়া দিয়া, সাহেব স্থবার দরবারে আসর যমকাইয়া লন। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এই সূত্রের অনুসরণে কত জনে যে পৈতৃক সম্পত্তি বিপন্ন করিয়া ঋণী হন এবং এইরূপে ঋণ করিয়া যশের ঘৃত পান করিয়া থকেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কেহ আপনার নাম জাকাইবার নিমিত্ত একটা ফাকা উপাধির আওয়াজে দেশ-ব্যাপী রব তুলিবার উদ্দেশ্যে অকারণ সোনার দানসাগর বা ধনীর মছলন্দ-বিহারী 'বিড়ালের বিবাহের' মত, অকালে রাজসূয়ের আয়োজন করেন। কেহ বা যশস্য কর্ম্ম করিয়াও উহা ঢাকিয়া রাখিবার কৃত্রিম অভিনয়ে হাস্যজনক অনুষ্ঠান করিয়া আঁপনার

যশোবিরাগী নাম ঘোষণার্থ অন্যরূপে যশের তদ্বির দিতে ভাল বাসেন।

এইরূপ সকল বিভাগীয় তদ্বিরী যশের হিল্লোলে আজি কালি দেশ ডুবু-ডুবু! যশস্বীর দুর্ব্বহ ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত! যাহারা পরধন হরণ, পরস্ত্রী গমন, পরের গৃহে অগ্নি প্রদানও পরপ্রাণ হনন প্রভৃতি ভীষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের নাম আততায়ী। এই শাস্ত্র-প্রণয়ন সময়ে মানুষ যশের ভিকারী ছিল না,—ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরাগী ছিল। তখন সত্যের সম্মান বৃদ্ধি করিতে যাইয়া লোকে আত্মখ্যাপন অপেক্ষা আত্মগোপনেরই অধিকতর গৌরব করিত। এই হেতু ধন্বন্তরিও আত্মকৃত চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতৃরূপে মহাদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন। ব্যাস ও আত্মকৃত দুর্লভ পদার্থের প্রণেতৃ স্থলে, ভগবৎ নামের আশ্রয় লইয়া কৃতার্থ হইতেন। তখন এরূপ তদ্বিরী যশের উৎকট উপসর্গ যদি সমাজে এতটা প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে, ইহা দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ঋষিপ্রণীত নীতিসূত্রে নিশ্চিতই তদ্বিরী যশে যশস্ব ব্যক্তিরাও আততায়ী শ্রেণীভুক্ত ও দেশের কল্যাণে বধার্হরূপে নির্দ্ধারিত হইতেন।

পরগাছা বা 'পেরেসাইট্'।

বর্ত্তমান যুগের সহরবাসী, বঙ্গীয় নব্য সভ্য সমাজের অনেকেই হয়ত, পরগাছা পদার্থটা কি, তাহা চিনিবেন না। তাঁহারা, সম্ভবতঃ, মূলগত অর্থ-উদ্ঘাটন-চেষ্টা কিংবা অভিধান-অন্বেষণ দ্বারা একটা অনুমান মাত্র করিয়া লইবেন; আসল জিনিসটি কেমন, ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু, 'পেরেসাইট্' (parasite) বলিলে, আর কোন কথা থাকে না। কারণ, এটি ইংরেজী আখরে লেখা বিলাতী নাম। সাহেব-মেমেরা পরগাছাকে 'পেরেসাইট্' বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, দেশী নাম অপেক্ষা বিলাতী নামেই, এখন এদেশে, অনেক জিনিসের গৌরব বাড়ে ও সহজে পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সকল পাঠকের সহজবোধ্য করিবার নিমিত্তই, পরগাছার পশ্চাতে 'পেরেসাইট্' নাম যোজনা করা হইল।

'চাঁদ' সওদাগর, দক্ষিণ পাটনে,—রাজা চন্দ্রধরের দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার 'মধুকর ডিঙ্গায়' অন্যান্য পণ্য-জাতের সহিত এক-ভরা নারিকেল বোঝাই করা ছিল। দক্ষিণ পাটনের লোকে নারিকেল কি পদার্থ, তাহা জানিত না। রাজা চন্দ্রধর নারিকেলের স্বাদ পাইয়া একবারে আত্মহারাবৎ মোহিত হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিতা মহাশয়, নারিকেল প্রস্তুত হয় কিরূপে?—নারিকেল জিনিষটা কি?"

সদাগর কহিলেন,—"গাছের ফল"। আবার প্রশ্ন হইল,—"সে গাছ কেমন ?" 'চাঁদ' উত্তর করিলেন,—

"চিরল চিরল পাত তার লত বেয়ে যায় আগে,
যে যায় নারিকেল পাড়িতে তারে খায় বাঘে।"—

"মহারাজ, বড় কষ্ট করিয়া নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। তথাপি দেখুন, মূল্য বেশী ধরা যায় নাই,—এক একটা নারিকেলের মূল্য উহার সমান ওজন কএক ভরি সোনা মাত্র।"

প্রবন্ধ লেখা চাঁদ' সওদাগরের বাণিজ্য নহে। বক্তব্য বিষয়ের যথার্থ তথ্য পাঠককে ভাল করিয়া বুঝানই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং নাম শুনিয়া যেন কোন পাঠককে গোলে পড়িতে না হয়, এই হেতুই, অদৃষ্টদোষে ও কালমাহাত্ম্যে এক্ষণ স্থানবিশেষে দুর্ব্বোধ (?) 'পরগাছার' সঙ্গে 'পেরেসাইটের' টিপ্পনী গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করা হইয়াছে। নতুবা একার্থবোধক বিভিন্ন ভাষায় দুটি' শব্দ একত্র বসাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না!

সামান্য কোন একটা বস্তুর নাম তুচ্ছ কথা,—অধুনা এ দেশের অনেক রীতি-নীতিও, বিদেশীর কাছে সার্টিফিকেট পাইলেই, আমাদিগের অধিকতর মনোমত হইয়া থাকে। ইউরোপের আগাষ্ট কোম্‌টি শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুরূপ কার্য্য করিলে,—আমাদিগের দেশীয় অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকের শ্রাদ্ধ বিষয়টা কি, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ ও অবসর হইল। মোক্ষমুলার বলিলেন,—"সংস্কৃত ভাষার ভিতরে পদার্থ আছে।" আমাদিগের ভিতরেও, সেই অবধি, অনেকে সংস্কৃতকে সম্মানের

চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, আমাদিগের সভ্যতাটা নিরবচ্ছিন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অতএব গ্রাহ্য করিবার অযোগ্য,—ইউরোপীয় সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। এক্ষণ, ইউরোপের বিজ্ঞ ও প্রাচীন সমাজনেতারা বলিতেছেন;—"ইউরোপের সভ্যতা কেবল মানুষ-মারা কল মাত্র"! আমরাও, সুতরাং চক্ষু উন্মীলন করিয়া, তাঁহাদিগের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব, বাঙ্গালার নিরেট 'নেটিভ' 'পরগাছাও', আজি, নিজ গুণে না হউক, বিদেশীর গ্রাহ্য 'পেরেসাইট্' নামের মাহাত্ম্যেই, তরিয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

পরগাছা লতার ন্যায় বৃক্ষের অঙ্গে জড়াইয়া থাকিলেও লতা আর পরগাছা এক কথা নহে। বন-শোভিনী লতা বন-তরুর অঙ্ক-অলঙ্কার বা গলার হার,—আর বনবাহার পরগাছা উহার গলগ্রহ বা গলফাঁস। লতা, কৃশ-তনু ও ক্ষীণদেহা হইলেও, জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে আত্মনির্ভরে দণ্ডায়মান হয়, এবং বিনয়ে নুইয়া,—যেন সরমে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া, প্রেমাকুলা অবলার ন্যায়, ধীরে ধীরে কর প্রসারিয়া, প্রাণের আশ্রয় বা অবলম্ব তরুর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহে! সে পেলব পল্লব ও প্রস্ফুট ফুলের মধুর হাসিতে আপনি হাসিয়া, তরুকেও হাস্যময় করিয়া তুলে, এবং মলয়ের আদরে হেলিয়া দুলিয়া, ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত রহিয়া, আপনার ভাবে আপনি ভাবুকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে! কিন্তু পরগাছার সহিত ভূরূপিণী জননীর কোন সম্পর্ক নাই। সে প্রাণান্তেও ভূমির রস আকর্ষণ দ্বারা আত্মনির্ভরে জীবন-যাপনার্থ কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত নহে। পরগাছা কোথা হইতে

উড়িয়া আসিয়া, অনিচ্ছুক তরুর তনু যুড়িয়া বইসে। তাহারা প্রায়শঃই বৃহৎ ও পুরাতন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, এবং ঐ বৃক্ষকাণ্ডের রস আকর্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে।

পরগাছা বহু প্রকারের। কিন্তু পুষ্পের গঠন-বৈচিত্র্য, সুগন্ধি, ও বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করিয়া, তাহাদিগকে, প্রধানতঃ ভাল ও ভালবাসিবার অযোগ্য, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্কিড্স্, 'পেরেসাইট' বা 'পরগাছা' হইলেও, এই ভাল শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। অর্কিড্সের ফুল পুষ্পজগতে, সাহেব ও বিবিদিগের নিকট, উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা অর্কিড্স্কে যথেষ্ট ভালবাসেন ও সম্মান করেন। যে শ্রেণীর পরগাছা ভাল, সেগুলিকে অতীব যত্নের সহিত, হরিৎকুঞ্জে (Green house) অথবা অর্কিড্স হাউসে (Orchid house) অর্কিডস্-প্রেমিকদিগের নিত্য নয়নরঞ্জন মানসে রাখিয়া দেওয়া হয়। উহাদিগকে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বর্দ্ধিষ্ণু রাখিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু যেগুলি শোভাশূন্য ও অকর্ম্মণ্য, সেগুলি, বিনা যত্নেই, মালিকবিহীন অথবা মুদ্রিতনেত্র মালিকের মূল্যবান্ বৃক্ষের সার শোষণ করিয়া, আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে, এবং অল্পকালের মধ্যেই বিস্তৃত কলেবরে বহু স্থান আবরিয়া লয়। ঈদৃশ পরগাছা, যে সুস্বাদু ফলবান্ বৃক্ষের উপর 'সওয়ার' হয়, দু'দিনেই উহার ফল-পরিমাণ দশ-আনি ছয়-আনি কমিয়া যায়। এই শ্রেণীর পরগাছা কিছুতেই সহজে মরিতে চাহে না। নানাদিকের প্রবল ঝড়-ঝট্কায়ও ইহাদিগের কিছু

হয় না ;—ঝড়ের তালে তালে মাথা নাড়িয়া, আপনারা মূলে স্থির থাকিয়া যায়। উপাদেয় ফলের গাছেই এই সকলের উপদ্রব একটু বেশী। পরগাছা আমগছকে জড়াইয়া ধরিয়া, অচিরেই উহাকে একবারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে।

উদ্ভিদের ন্যায় মনুষ্য-সমাজেও পরগাছা আছে। পর-বল শোষী প্রাণঘাতী রিপু, যেমন উদ্ভিদ-জগতে অকর্ম্মণ্য পরগাছা,—মানব-জগতের রিপু-পরগাছাগুলিও তেমনই পর-বল-পুষ্ট, পর-গলগ্রহ, কর্ম্মনাশা, অলস ও মানুষের মধ্যে ওছা।

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, মানবীয় পরগাছার মধ্যেও, ভাল ও মন্দ, সহনীয় ও অসহনীয় ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ আছে। ভালগুলি, সময় সময়, আশ্রয়-স্থানের শোভা বৃদ্ধি করে, অধিক স্থান যুড়িয়া বসিতে সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং কোন অংশেও মারাত্মক বা হানিজনক হইতে পারে না ; অবস্থা বিশেষে, বরং উপকারেই লাগিয়া থাকে। কিন্তু যে গুলি চিহ্নিত মন্দ, স্বভাবতঃ অনিষ্টকর, সে গুলির কথা স্বতন্ত্র। সেগুলি কেবলই স্বাধিকার বিস্তার দ্বারা সমস্ত কবলিত করিয়া লইতে চাহে, এবং আপনার অসার, অকর্ম্মণ্য ও কদর্য্য দেহের পুষ্টি সাধনে নিরত রহে। সেগুলি এমনই অদূরদর্শী, মোহান্ধ ও খল-প্রকৃতির যে, তাহাদিগের আশ্রয়-তরুটীকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের পরিণামটাও যে অন্ধকারময় করিয়া তুলে, ইহাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

উদ্ভিদ-পরগাছা যেমন বড় বড় গাছের,—মানুষ-পরগাছাও তেমন বড় বড় ধনী মানুষের অঙ্গলগ্ন উপাঙ্গ বা শোণিতশোষী

টিউমার (tumour)। একদিকে ফলবান্, অন্যদিকে ধনবান্,—এই দুইদিকেই ঐ দ্বিবিধ পরগাছার লক্ষ্য। সুমিষ্ট ফলবান্ আমগাছের উপর উদ্ভিদ পরগাছার আকর্ষণ যেমন প্রবল, মানবরূপী পরগাছারও তেমন ধনবানের উপরেই মমতার টানটা একটুকু বেশী কড়া। কিন্তু, সাধারণতঃ পরগাছার স্বভাব এরূপ হইলেও, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, পরগাছার লাঞ্ছনা, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সম্ভবপর।

ধর্ম্ম-জীবন, সত্যপরায়ণ, ঈশ্বর-নিষ্ঠ ধার্ম্মিক, ভক্ত, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু-করে, লোকালয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন, তথাপি পরগাছা তাঁহার পিছ্ ছাড়িতে চাহে না! ভক্তের পরগাছা—ভাক্ত। ভক্ত, জীবের উদ্ধার কামনায়, তাঁহার অশ্রু-গঙ্গাজলে ধোয়া মধুর হরিকথায়, প্রাণের পীযূষ-প্রবাহ ঢালিয়া দেন, আর ভাক্ত, সেই নির্লিপ্ত বিরাগের মুখ হইতে বৈরাগ্যের কথা কাড়িয়া আনিয়া, তাঁহার প্রাণের ভাব-রসনার লেহনে শুষিয়া লইয়া, অভিনয়ের ঢঙে, তাঁহার সেই অকৃত্রিম নয়নজল ও ঢল-ঢল ভাবের কৃত্রিম অনুকৃতি ফলাইয়া লয়, এবং আপনার চির চতুর নটবর প্রাণ বা বাবু-আনা 'দেলের' উপর আলখেল্লার ঢাকনি দিয়া, পসার জমকাইতে চেষ্টা করে। ভাক্ত এইরূপে ভক্তকে শোষণ করিয়া, নিজে প্রকৃত পুষ্টি লাভ করে না, অন্যকেও পুষ্ট করিতে পারে না। অথচ ভক্তের জীবন-সম্বল হরি-কথার পবিত্র মাহাত্ম্যকে লোক-সমাজে হীনপ্রভ ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে! এ পরগাছা নয় ত কি?

কৃতবিদ্য, বিজ্ঞ জ্ঞানীর পরগাছা,—তাঁহার যশোলিপ্সু বন্দী বা পার্শ্বচর ধামা-ধরা মূর্খের দল। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ যুগ-প্রবর্ত্তক লেখক, কঠোর সারস্বত-সাধনালব্ধ জ্ঞান-রত্ন ও গভীরচিন্তা-প্রসূত ভাবের মণি আহরিয়া, ভাষার সূতায়, মোহন-মণি-মালা গাঁথিয়া রাখেন; আর তাহাতে তাঁহার স্বদেশ, স্বজাতি এবং কখনও বা সমস্ত মানবজগৎ সমৃদ্ধ, সমুজ্জ্বল ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ মহামহীরুহের কাছেও পরগাছার অত্যাচার কম নহে। এই সকল পরগাছা অবশ্যই কোনরূপ কৃতিত্বের কোন ধার ধারে না। ইহারা চিরদিনই সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন ও পরিশ্রমে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্মুখ। ইহাদের কেহ আশ্রয়-পুরুষের মুখের কথা গ্রাস করিয়া' তাঁহার মনের ভাব চুরি করিতে চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ তাহার লেখার উপর 'বাটপারি' করিয়া আপনার নামে আসর গুলজার করিতে চাহে। ইহাদের এক শ্রেণী 'নামকা ওযাস্তে' সৌখীন গ্রন্থকার,—আর এক শ্রেণী 'পয়সাকা ওয়াস্তে' ব্যবসায়ী মোর্দ্দাফ্রাস! ইহারা রাজ-ব্যবস্থা অনুসারেও দণ্ডার্হ! সুতরাং ইহাদিগের সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন!

ভাগ্যবানের গৃহে, ভ্রাতা, ভগিনী, ভগিনীপতি, ভগিনীর অপত্য, পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, শ্বশুর, মাতুল ও শ্যালক প্রভৃতিও, সময় ও অবস্থাবিশেষে, পরগাছার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিরাট-গৃহের প্রসিদ্ধ শ্যালক পরগাছা—কীচক; কৌরবকুলের সর্ব্বজনপরিচিত মাতুল পরগাছা—শকুনি। ইহারা উভয়েই মহাভারতে ও ভারতীয়

লোকসমাজে চিরনিন্দিত ও ঘৃণার্হ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু, তাহা হইলেও, এবং "শ্যালকঃ কুলনাশায়- সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ" ইত্যাদি উদ্ভট বচনে শ্যালক ও মাতুলের কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিঘোষিত রহিয়া থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই এই সকল পরগাছা মারাত্মক নহে। ইহারা, অনেক সময়েই, একহাতে, একপ্রকারে শোষণ ও আর একহাতে, অন্য প্রকারে পোষণের পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে, যেখানে শুধুই শোষণের সম্পর্ক, সেখানেও ইহারা, মমতার দায়ে স্বভাবতঃ আবদ্ধ রহিয়া, শোষণের রসনা যথাশক্তি সংযত রাখে,—কদাপি প্রাণ ধরিয়া টান দিতে ইচ্ছা করে না! ইহারা যেমন শোষণ করে, তেমন আশ্রয়-পুরুষকে জনবলে সংবর্দ্ধিত ও স্বজনপালকরূপে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত ও সম্মানিত রাখিয়া, তাঁহার অন্যতর শোভার নিদান স্বরূপ হইয়া রহে।

পত্নী চিরদিনই পরগাছা। কিন্তু যখন তিনি পতির প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আপনাকে ভুলিয়া যান, যখন তিনি অভিন্ন-অস্তিত্ব প্রাণাধিকের দ্বিতীয় প্রাণরূপে প্রকৃতই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি পরগাছা হইলেও পরগাছা থাকেন না, সুখ-শীতল সঞ্জীবনী মহৌষধির ন্যায়, পতির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহেন। তিনি যদি তখন পতি-হৃদয়ের অমিয়ধারা শোষণ করিয়া লন একগুণে, সেই অমিয়কে আরও মধুময় করিয়া, ফিরাইয়া দিতে উৎসুক হন, সহস্রগুণে। এ ক্ষেত্রে পত্নী পরগাছা হইলেও 'অর্কিড্স্' শ্রেণীভুক্ত,—সৌরভ-সুষমায় আদরের আভরণ। এমন

পরগাছার কাছে, কোন্ তরু, সাধ করিয়া আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত হইবেন না? কিন্তু পত্নী যেখানে আদরের অমৃত, সোহাগের মধু শতজিহ্বায় শুষিয়া লইয়াও প্রাণের অভ্যন্তরে অতৃপ্ত; ললিত, লগ্নার নির্ম্মল প্রেমাশ্রুতে সতত অভিষিক্ত রহিয়াও, জ্বলন্ত দীপকের ঝঙ্কারে ও হুঙ্কারে নিত্য কল্লোলিত, সেখানকার কথা অন্যরূপ। যিনি হাসার প্রত্যুত্তরে ভ্রূকুটি, রাগের বদলে বিরাগ, ও মধুর বিনিময়ে লঙ্কা লইয়া নিঃশঙ্কমনে দণ্ডায়মান হইতে অভ্যস্ত, তিনিই পত্নীরূপিণী প্রকৃত পরগাছা—তিনিই পতিবিমর্দ্দিনী চণ্ডা বা পতিহৃদয়ের মার্কামারা 'পেরেসাইট' (Parasite)।

এতক্ষণ যে সকল পরগাছার কথা বলা হইল, সেগুলি সকল সময়েই সহনীয় এবং কোন কোন সময়ে প্রীতির আস্পদ ও আদরণীয়। কিন্তু এক্ষণে যে সকল পরগাছার কথা বলা হইতেছে, সেগুলির অত্যাচার প্রায় সকল অবস্থায়ই যারপর-নাই ভয়াবহ ও সর্ব্বাংশে সর্ব্বনাশকর। এই সকল মারাত্মক পরগাছার আক্রমণ হইতে দেশীয় রাজরাজড়া, জমিদার ও ধনীদিগেরই ভয় ও আতঙ্ক বেসী। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লতাজাতীয়, কতকগুলি তরুশ্রেণী ভুক্ত। লতাজাতীয় বিষবল্লরীর কথা বেসী করিয়া বলা অনাবশ্যক। ইহারা, রূপে, কৃত্রিম সাজসজ্জায় ও হাবে ভাবে মোহিনী,—শোষণে রাক্ষসী! ইহাদিগের নয়নহিল্লোলে বিষ ঝরে; কিন্তু লোকে অমৃতজ্ঞানে উহা লুফিয়া লয়! ইহাদিগের অধরে বিদ্যুৎ,—কিন্তু সেই বিদ্যুতের পশ্চাৎভাগে লুক্কায়িত বজ্র! এই লতা একবার কোন সমৃদ্ধ সন্তানের তরুণ

তনুতে লতাইয়া উঠিতে পারিলে আর কথা নাই,—অচিরেই শত রসনার তৃষিত আকর্ষণে, বেচারীর সুখ-স্বাস্থ্য ও ধন-প্রাণ সমস্ত শুষিয়া লইবে!

তরুশ্রেণীভূক্ত মারাত্মক পরগাছার মধ্যে দেশী ও বিলাতীভেদে দ্বিবিধ পরগাছা বা 'পেরেসাইট' দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ৺দীনবন্ধু মিত্রের নিমেদত্তের মত, অটলের বৈঠকখানায় মদ খাওয়াই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্যবসায় ও কর্ম্ম, ধনী জমিদারদিগের তাদৃশ মোসাহেব বা ইয়াররূপী দেশী পরগাছা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর পরগাছা কাহাকেও বেড়িয়া ধরিলে, সে কর্ম্মকে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মকে কর্ম্ম বুঝিয়া নিরন্তর ক্ষিপ্তবৎ পরিচালিত হইতে থাকে এবং অন্ধের ন্যায় আপন হাতে নুড়া লইয়া, আপনার সোণার লঙ্কা ছারখার করিয়া ফেলে! যেখানে ধনী জমিদার, যেখানে বৈঠকখানার বাহার, সেইখানেই এই শ্রেণীর পরগাছার পূর্ণ দরবার! কিন্তু মোসাহেব যখন যথার্থ বন্ধুতার আকর্ষণে মোসাহেব বা ইয়াররূপে কাহারও দ্বারস্থ হয়, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তাদৃশ মোসাহেব, পরগাছা নহে, ব্যথার ব্যথী, প্রকৃত অন্তরঙ্গ, প্রাণের সঙ্গী বা সখা। সখা ও ইয়ার সর্ব্বতোভাবেই স্বতন্ত্র পদার্থ।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে দেশ নায়করূপে বিশেষ গণ্যমান্য হইলেও, চরিত্রাংশে অতি জঘন্য জীব। দেশী বা সাহেবী সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ যেমন একদিকে তাহাদের বিদ্যা

বুদ্ধি বা বক্তৃতার কলকণ্ঠ, তেমন অন্যদিকে সহায় স্তুতি-বাক্য ও তোষামোদির নানারূপ কায়দা। তাঁহারা সুড়-সুড়ি দিতে, গাত্র কণ্ডুয়নের স্থান বুঝিয়া যথা সময়ে চুলকাইয়া দিতে, নানারূপে আরাম ও নিদ্রাকর্ষণের উপ-যোগী সংবাহন করিতে বিশেষ পটু। ঈদৃশ সহরের পুরাতন পরামাণিকগণ, নানাভাবে নানাসাজে যে সকল সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা তদ্বির দ্বারা জনসমাজে পরিচিত হইতে বা উপাধির বোঝা বহন করিতে লালায়িত, তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া নানারূপে তাহাদের রস শোষণ করেন। বিশেষতঃ যে খানে সম্মান-লোলুপা স্ত্রীলোক বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বরী সে খানে ত কথাই নাই। অব্যর্থ মন্ত্রপ্রয়োগে তাহারা একবার দন্ত বিদ্ধ করিয়া স্বার্থসাধনের শত পথ উন্মুক্ত করিয়া লন। ইহাও পরগাছা বই আর কি?

প্রবন্ধের উপসংহারে আর একটি মাত্র পরগাছার কথা বলিব। ইহার সহিত দেশী রাজরাজ্‌ড়া ও বড় জমিদার-দিগেরই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। কিন্তু কোন কোন সময় দেশী রাজরাজ্‌ড়া ও বড় জমিদারদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সর্ব্বনাশকর ও ভয়াবহ পরগাছা, অন্য কোনটীই নহে। তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিরূপী মনিবই এই পরগাছা রূপে গণ্য। এই পরগাছাকে বুকে টানিয়া লইলে, আর রক্ষা থাকেনা! কচ্ছপের কামড়,—গলা কাটিলেও ছাড়ে না! ইহারা, কৌশলে জোঁকের মত, শোষণ করে, এবং বিন্দুমাত্র রস থাকিতেও খসিয়া পড়ে না! অন্য পরগাছা,

কখন বয়স ফুরাইলে, কখন আদরে ভাঁটার টান পড়িলে, আপনা হইতেই গা ছাড়িয়া দিয়া ঢলিয়া পড়ে। মো-সাহেব বা ইয়াররূপী পরগাছাও, মোহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা সময় থাকিতে ভাবাকুল নেত্রে বিবেকের দৃষ্টি স্ফুরিত হইলে, সামাল-সামাল বলিয়া 'সেলাম' দিয়া আপনি সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে, সখের নেশা সময় থাকিতে ছুটিবার অবসর পাইলে, এবং পরিণাম চিন্তার শত চক্ষু একসঙ্গে উন্মীলিত হইলেও, এই শ্রেণীর কোন কোন পরগাছা অপস্থত হইবার পাত্র নহে। শত হস্তে ঠেলিয়া ফেল, সে লাগিয়া থাকিবে;—এক পা-ও হেলিবে না! তুমি আছাড়িয়া ফেলিতে চাও, সে আরও আঁকড়িয়া ধরিবে;—তুমি চক্ষু রাঙ্গাইলে, সে গলা শাণাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে! যাবৎ তোমার অস্তিত্ব, যাবৎ তোমার ধমনীতে শোণিতের চলাচল আছে, তাবৎ সে তোমাকে ছাড়িবে না। যদি ছাড়ে, এমন করিয়া ছাড়িবে যে তুমি আর কোন দিক দিয়া, তোমার আপনার রহিতে পারিবে না! তাই বলিতেছিলাম, যত রকমের পরগাছা আছে, এই শ্রেণীর পরগাছার তুলনায় সমস্তই হীনপ্রভ ও নিস্তেজ। ভাগ্যবন্তের ঘরে তিনিই ভাগ্যবান্, যাঁহার তৈলাক্ত তনু জীবনে কখনও ঈদৃশ পরগাছার শুভ দৃষ্টিপথে নিপতিত না হয়।

পরগাছার বীজাণু সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—প্রবেশ পথ পাইলে, একটু স্থানের সুবিধা ঘটিলে, পরিপোষণের একটু

সুযোগ হইলেই, ইহারা ক্রমে একেবারে সর্ব্বাঙ্গে জুড়িয়া বসিয়া রস শোষণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া লয়। ইহারা নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে প্রকট হয়। প্রথম হইতেই ইহাদের আক্রমণে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পশ্চাতে অনেক সময় বুঝিলেও ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তাই বলি যদি সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাও, তবে এই সকল পরগাছার দৃষ্টি পথ হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা কর।

উপাধি—না ব্যাধি ?

আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও নিত্য নব আবিস্কারে পরিপুষ্ট ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুবিধ ব্যাধির কথা লিখিত অছে। উহাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় ও তাহা দূরীকরণার্থ, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই, মহা-মহা মনীষিগণ আপনাদের মস্তিষ্কসাহায্যে ও জীবন-ব্যাপী পরিশ্রমে রক্তমাংসের দেহধারা মানব জাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহরূপে তাঁহাদের নিকট এজন্য ঋণী। অনেকেই জানেন যে, এখন কাল ও স্থান-মাহাত্ম্যে অনেক নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে; এবং উহাদের প্রশমন হেতু ব্যবস্থাও সাধ্যমত নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে। শারীরিক রোগের দুঃখ ও বিভীষিকা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ন্যূনাধিকরূপে অবগত আছেন। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করিব, তাহা দেশীয় কিংবা বিদেশীয় কোন শারীর-নিদানের রোগতালিকাভূক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা আমরা জানিনা। কিন্তু ইহা যে, শারীরিক ব্যাধির ন্যায়ই অনেক পরিমাণে সর্ব্বনাশকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্থূল-দৃষ্টিবিশিষ্ট সাধারণের চক্ষে ইহা উপেক্ষার বিষয় হইলেও, দেশের ও সমাজের মঙ্গলেচ্ছু সুধী ব্যক্তিগণের মানস-চক্ষে

উহা শারীরিক রোগের ন্যায়ই দুঃখপ্রদ ও আশঙ্কাজনক; আমরা ঐ ব্যাধিটির নাম ও লক্ষণ সহকারে বঙ্গায় বিদ্বজ্জন-সমাজে উপস্থিত হইতেছি; তাঁহারা ইহার কোন প্রতিকার আছে কিনা, এবং থাকিলে, কি প্রণালীতে উহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করুন।

আমাদের বক্তব্য ব্যাধিটির নাম—উপাধি-বিকার। প্রথম প্রশ্ন বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে; বলি, আপনারা এই রোগের নাম শুনিয়াছেন কি? আপনাদের শাস্ত্র ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রণীত। সুতরাং যাহা ছিল, আছে ও হইবে, তৎসমস্তেরই নিদান উহাতে আছে। নূতন মূর্ত্তিতে,—নূতন রোগরূপে ওলাউঠা যখন এদেশে প্রথম আতঙ্কের ডঙ্কা বাজাইল, আপনারা মৃদু মৃদু হাসিয়া মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন—"এ আর নূতন কিসে?—এ যে আমাদিগের চিরকালের চেনা, পুরাতন পরিচিতা,—শমনের প্রিয় পরিচারিকা দূতী।" এই বলিয়া বিসূচিকার তালিকায় উহার নাম লিখিয়া রাখিলেন। প্লেগ আসিল,—অমনি আপনাদিগের আয়ুর্ব্বেদ তাহার রেজেষ্টারী খুলিয়া উহাকে বায়ু, পিত্ত, কফের পুরাতন চক্রব্যূহেরই অন্যতম মহারথী বলিয়া দির্দ্দেশ করিল। অতএব, এরোগও আপনাদিগের কাছে নূতন বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা নিশ্চিত কথা। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, আপনারা ইহাকে ত্রিদোষজ উন্মাদরোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন। উন্মাদরোগ

অনেক প্রকারের,—ক্রোধোন্মাদ, মদোন্মাদ, ভাবোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, ইত্যাদি কত কি আছে। উপাধিবিকার কোন্ উন্মাদ, যাঁহাদের নাড়ীজ্ঞান আছে, তাঁহারাই তাহা ঠিক করিয়া লইবেন।

এদেশে এখন উৎকট পীড়া হইলে, বিশেষতঃ রোগের তরুণ অবস্থায়, শুধু কবিরাজের মুখ চাহিয়া কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারেরই ডাক পড়ে; পর্য্যায়ক্রমে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা লওয়া হয়। তাই জিজ্ঞাসা করি, বহুদর্শী ডাক্তার মহাশয় ইহাকে কি পীড়া বলিবেন? আপনাদের নিদান বা প্যাথলজী (Pathology) মনুষ্যকৃত; উহাতে নূতনের প্রবেশাধিকার আছে। আপনারা কি ইহাকে আপনাদের প্যাথলজি বহির্ভূত নূতন রোগ বলিবেন?—না Convulsion বা হিষ্টিরিয়া-বিশেষ বলিয়া পূরাতন লিষ্টেই রাখিবেন? কিন্তু বলুন দেখি, ইহা কি চিকিৎসা-সাধ্য,—না একেবারে দুশ্চিকিৎস্য?

অন্য প্রণালীতে এই ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ ও চিকিৎসা না থাকিলেও, হোমিওপ্যাথ মহাশয়ের তহবিলে অবশ্যই ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকা সম্ভবপর। একজন অতি সহজে রাগান্বিত হয়, হোমিওপ্যাথি তাহার এই রাগ-রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত! কেহ একটু বেশী হাসে বা সহজে কাঁদে হোমিওপ্যাথির ফার্মাকো-

পিয়ায় এ হাসি ও কান্নার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে! এসমস্ত রোগের ঔষধ আছে, উপাধি-বিকারের ঔষধ নাই,—একথা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। হেকিমীর কাবাব, কোরমা ও হালুয়ার কার্য্যক্ষেত্রেও এ রোগের বিকাশ না ঘটিয়াছে, এমন অনুমান করা অন্যায়। হেকিম সাহেব সম্ভবতঃ এ রোগের উদ্যম অবস্থাকে "দেওয়ানা" ও Re-action বা প্রতি ক্রিয়ার অবস্থাকে "দেউলিয়া" নামে নির্দ্দেশ করিবেন।

ওলাউঠা প্রভৃতির ন্যায় উপাধি-বিকারেরও তিনটি অবস্থা। প্রথম সংক্রমণ, তৎপর বিকাশ এবং সর্ব্বশেষে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। প্রেমে Court-ship বা পূর্ব্বরাগের উপাসনার যে ভাব বা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, উপাধি-বিকারের সংক্রমণ অবস্থায়ও প্রায় তাহাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রথম শ্যামরূপ দর্শন, তৎপর সেই শ্যামচাঁদের অধরনিঃসৃত বংশীরব শ্রবণ এবং ইহার পরেই পূর্ব্বরাগের উন্মাদ-উচ্ছ্বাস। এক্ষেত্রেও দরবার-গৃহে উপাধিধারী সজ্জিত পুতুলবৎ সেই নূতন ঢঙের পোষাক পরিচ্ছদ গর্ব্বিত শিরস্ত্রাণের সেই মলয়-দোলায়িত উচ্ছ্রিত পালকগুচ্ছ, কটিদেশ-শোভার্থবিলম্বিত সেই মহার্ঘ্য কোষ-নিবদ্ধ অসি, তাঁহার সেই অগ্রসংস্থাপিত আসন ও "পান-আতর" গ্রহণ সময়ের সেই অগ্রগণ্য আদর, প্রথমতঃ এই সকল কারণেই উপাধি-প্রেমিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর উপাধিপ্রাপ্তির

যশঃ-বংশী শ্রবনে প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠে। ইহাই এই রোগের সংক্রমণ-হেতু। উপাধি-বিকারের সংক্রমণ ঘটিলেই মানুষ একে আর হইয়া যায়। রাধার মন আর গৃহকার্য্যে বসিতে চাহেনা। সে তখন হলুদ বাটিতে আঙ্গুল পেষণ করে,—মুড়ি ভাজিতে খৈ ভাজিয়া ফেলে,—মাছ কুটিতে ছেলের গলায় বঁটি বসায়! উপাধি-সংক্রমণের এমনি ভয়াবহ অবস্থা বটে! ব্যাধির বিকাশ ঘটিলে অর্থাৎ রুগ্ন-ধাতু ব্যক্তি উপাধিগ্রস্ত হইলে, তখন যে অবস্থা ঘটে, তাহা আরও ভয়াবহ। তখন তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়,—চক্ষের দৃষ্টি আবিল হয়,—সরল গ্রীবা দুর্ব্বহ উপাধির বোঝায় বাঁকিয়া যায়,—পা আকাশে আঘাত করিয়া চলে,—এবং তাহার তর্জ্জন, গর্জ্জন ও নিনাদে প্রতিবেশীর প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে! প্রতিক্রিয়া বা শেষ অবস্থা আবার তেমনি শোচনীয়। তখন নহবৎ-খানার রোসন-চৌকী থামিয়া যায়; পুরুষানুক্রমি বন্দনা-গায়কের কণ্ঠরোধ হয়; আসবাবও একটির পর একটী খসিয়া পড়ে; বিলাসগৃহের আলোক নিবিয়া যায়; প্রাসাদে চামচিকা বাস করে! সে তখন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া পদাবলীতে তান ধরিয়া চিত্তের ভাব লঘু করিতে চেষ্টা করে। আর মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলেঃ—

“সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥”

উপাধি-বিকারের সংক্রমণ অবস্থার তিনটি মুখ্য লক্ষণ; গৌণ লক্ষণ একটি। এই রোগে সংক্রামিত সকলের মধ্যেই অবশ্য তিনটি লক্ষণ একবারে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না। যাহার পায়, তাহার অবস্থা অবশ্যই বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া পড়ে।

যাঁহারা অমর কীর্ত্তি রাখিয়া সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গে অথবা নামে উপাধির কোন বিচিত্র পোষাক অথবা উহার দ্ব্যক্ষর, চতুরক্ষর বা ষষ্ঠাক্ষরের মোহনমালা পরাইলে বিন্দুমাত্র তাহাদের শোভা বৃদ্ধি হয় না। সামান্য উন্নত মানবের শোভন ও আকাঙ্ক্ষিত এই সামান্য উপাধিবিশেষণ তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। সেক্ষপীয়র তাঁহার অমর ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন:—

"To gild the refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish :
Is wasteful and ridiculous excess."

স্বর্গগত ব্রীটিশ-রাজ-মন্ত্রী গ্লেড্‌ষ্টোন অসংখ্য লোককে লর্ড, ব্যারণ ইত্যাদি উপাধিতে ইঙ্গিতে ভূষিত করিতে সমর্থ

হইয়াও এতাদৃশ চতুরক্ষর-মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করিতে বারংবার উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সম্মান কোন অংশে লঘু হইয়াছিল ?—না—বরং তাঁহার চরিত্রের মহিমা আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়াছিল ? প্রয়োজন হইলে, এমন অনেক সভ্য-জগদ্বিশ্রুত ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। জগতের চিরপূজনীয় কর্ম্মরাশি সম্পাদন করিয়া, যাঁহারা মানবজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, উপাধি তাঁহাদের আভরণ নহে,—তাঁহারাই উপাধির আভরণ ; তাঁহাদিগের নামটিও অপরের শ্লাঘনীয় উপাধি। শত "কাব্যরত্ন" ও শত "কাব্যবিশারদ" উপাধি একদিকে, আর কালিদাস ও সেক্ষপীয়র প্রভৃতি নাম একদিকে। বাঙ্গালার কালিদাস বা সেক্ষপীয়র হইতে পারা, অতি লম্বা-চৌড়া "কবি" উপাধি অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে গৌরব-জনক। তাঁহাদের গরীয়ান্ নামের সহিত চেতন, অচেতন; যাহাই কেন না একবার প্রীতিসম্পর্কে সন্নিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম বিশেষণের উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, কোথাও পূজনীয়, কোথাও স্মরণীয়, কোথাও বা সুখ-স্মৃতি আবাহন-সূচক অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস কিম্বা জীবন-চরিত এ কথার সাক্ষ্য দান করিবে। জন্‌সনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া, বছ্‌ওয়েলের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে ; এণ্ড্রুমার্‌ভেল নিজে সুকবি হইলেও মিল্-টনের সংস্রবে না আসিলে, তাঁহার নাম জন-সমাজে এত

বেশী পরিচিত হইত কিনা সন্দেহস্থল; আগাষ্ট কোম্‌তের প্রীতি ও ভালবাসার পাত্রী বলিয়া ক্লোটিল্‌ডির নাম এখনও পণ্ডিতগণের মুখে প্রীতির সহিত উচ্চারিত হয়; পেরিক্লিসের সংশ্রবে আসিয়া, অস্‌পাসিয়ার নামও ইতিহাসে গ্রথিত রহিয়াছে। নিউটনের "ডায়মণ্ড" নামক কুকুর, এবং প্রতাপসিংহের "চৈতক" নামক অশ্বের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সেক্ষপীয়রের এভন-তীরস্থ বাটী এখনও পবিত্র দেব-মন্দিররূপে পূজা পাইয়া থাকে; দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী তথায় প্রতি বৎসর গমন করেন এবং এতদুপলক্ষে তথায় একটি রেলপথও গিয়াছে; কবির স্বহস্ত-রোপিত বিবেচনায় সেই বাটীস্থ একটি বৃক্ষের ত্বক কিম্বা শাখা পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সাদরে অনেকেই সঙ্গে লইয়া আইসেন। স্যর ওয়াল্টার স্কটের লেখনী-প্রভাবে স্কট্‌লণ্ডের পর্ব্বতমালা এবং তড়াগাদিও যেন অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, এই সকল মহাপুরুষেরা নিন্দাচ্ছলেও যাহাকে দু'একটা কথা কহিয়াছেন, তিনিও ভীষ্মের সংশ্রবে শিখণ্ডীর ন্যায় স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন!

এই সকল লোকোত্তর পুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র। উপাধির অক্ষর ভিন্নও তাঁহাদের নাম চির-অক্ষয় ও অনশ্বর। কিন্তু সমাজে এমন অনেক সুকৃতী সুজন আছেন, যাঁহাদের পক্ষে উপাধি অনাবশ্যক নহে। উপাধি তাঁহাদিগের পক্ষে শোভা,—তাঁহারাও উপাধির শোভা। তবে উপাধি কাহাদের

পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক নয়—এবং কি প্রণালীতেই বা উহা সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও হিতকর হয়, ইহাই এইক্ষণে বিবেচ্য। নিষ্কাম-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, বিশ্বপ্রেমে নিজের সুখ-শান্তি মিশাইয়া দিতে পৃথিবীর অনেকেই অসমর্থ। যাঁহারা তাহা পারিয়াছেন, তাঁহারা মানব দেহে দেবতা,—এই পৃথিবীতে তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহারা লোক-হিত-ব্রতে জন-সাধারণ হইতে একটু উচ্চে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট পরোপকারজনিত আত্মপ্রসাদ চিত্তের অপার সুখ-জনক হইলেও, লৌকিক যশঃ ও সম্মান তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে। সমাজের পক্ষে তাঁহাদের গুণরাজি ও পরার্থা প্রীতির উপযুক্ত পুরস্কার লাভ, এবং তাঁহাদিগকে সাদরে সম্মান-সূচক উপাধিতে চিহ্নিত করিয়া, সাধারণ হইতে উচ্চ আসন প্রদান ও তাঁহাদের উহা গ্রহণ,—কোনটিই অনাবশ্যক নয়। তাঁহাদিগকে এইরূপে উৎসাহ প্রদান, কৃতজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলেও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উপাধি বিতরণে ও গ্রহণে অনেক সময় আমরা উল্লিখিত সুদৃশ্যটি দেখিতে পাই না।

ভাষা ভাবেরই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। ভাব আছে বলিয়াই, সম্মানের ভাষা সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা ঐসকল আক্ষরিক আরাবের মূল্য কি ? দিবসকে 'রাত্রি' বলিয়া চীৎকার করিলেও প্রকৃত বিষয়টির পরিবর্ত্তন হয়না; সুতরাং

তাহার কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়না। উপাধি-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি উপাধির জন্য এতটা ব্যস্ত হয় কেন? না, তাহাতে সম্মান ও একটুকু প্রভুত্ব আছে বলিয়া। কিন্তু উহাতে সম্মান ও প্রভুত্ব থাকিবার মূলে যে একটা গুরুতর কথা রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না অথবা উপেক্ষা করেন। ঘেঁটুফুলকে "গোলাপ" উপাধি দাও,—শত ঢাক ঢোল বাজাইয়া, শত সমারোহে এই উপাধি গ্রহণ করিলে-ও, ঘেঁটুফুল গোলাপ হইবেনা। কাণাকে "পদ্মলোচন" বলিয়া সহস্রকণ্ঠে আহ্বান কর, কাণার অন্ধ চক্ষে কখনও আলো ফুটিবেনা ; কাফ্রিকে "কামদেব" বলিয়া শত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, কিছুতেই "কাফ্রির কামদেবত্বে" রতির মন ভিজিবেনা। তবে কেন যে, লোক গুণের দিকে না চাহিয়া নামের জন্য উন্মত্ত হয়,—নিধিকে পায় ঠেলিয়া, শুধু ব্যাধির বোঝা বহিবার লালসায় মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, 'হয়'কে 'নয়' ও 'নয়'কে 'হয়' করিবার নিমিত্ত বিকারপ্রাপ্ত রোগীর মত আস্ফালন করে, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। শুধু নামে কি করিয়া চিত্তের তৃপ্তি হইবে, তাহা বস্তুতঃই আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

আমাদের দেশে ধনী হইলেই বড় লোক হওয়া যায় ; কিন্তু ইউরোপে বড়লোক নাম তত সুলভ নহে। তাহাদের অভিধানে গ্রেটম্যান্ (Great man) বা ওয়েলদীম্যান্ (Wealthy man) দুইটী ভিন্ন শব্দ এবং তাহার প্রয়োগ স্থলও ভিন্ন।

সে দেশের লোকে আলফ্রেড দি গ্রেট (Alfred the Great) বলে, কিন্তু রথস্ চাইল্ড দি গ্রেট্ (Rotheschild the Great) বলে না। বলা বাহুল্য যে, এই নীচ ও অশোভন প্রথা, আমাদের আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ-ভাবাপন্ন অস্বাভাবিক বিকাশে দেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপে অর্থের সম্মান ও প্রভাব খুব বেশী, এবং ইউরোপে লোকে এ জিনিষটাকে এত ভালবাসে যে, অভাব না থাকিলেও আমাদের অপেক্ষা হেয় ও কষ্টকর উপায়েও অর্থার্জ্জন করিতে তাহারা ঐকান্তিক আগ্রহ দেখায় ;—সেখানে ভোগেই শুধু সুখ আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এসকল থাকা সত্ত্বেও সেখানে শিক্ষা ও প্রতিভার সম্মান আর্থিক সম্মানের গৌরব অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী, এবং সেজন্যই এখনও "গ্রেট্‌ম্যান" ওয়েল্‌দি ম্যান" শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে। আর আমরা উহাদের চরিত্রের কুৎসিত ভাগের অনুকরণ করতঃ, আমাদের সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের সোপান-স্বরূপ, সাংসারিক ধর্ম্মে বৈরাগ্যের মধুর মিশ্রণটুকু একবারে বিস্মৃত হইয়া, কুসীদজীবীর প্রাণ পাইয়াছি ; এবং পক্ষান্তরে প্রতিভা ও শিক্ষার তেমন আদর করিতে শিখি নাই। সুতরাং ধনী লোককেই আমরা বড় লোক বা ধর্ম্মাবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

যে স্থলে পরার্থা প্রীতি, প্রতিভা, দেশানুরাগ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কারণে উপাধির পুষ্পবৃষ্টি হওয়া সর্ব্বথা

বাঞ্ছনীয়, সে স্থলে আমরা অধিকাংশ সময়ই কি দেখিতে পাই ?—না, মিঃসহায় গরীবের নিষ্পেষণে উৎপন্ন বা জাল জুয়াচুরি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে অথবা "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই চার্ব্বাক সূত্রানুসারে বন্ধকী বা রেহানী তমক্-সুকে স্বাক্ষর-যোগে সংগৃহীত টাকায় নানারূপ তদ্বিরের অজস্র ধারা বর্ষণ দ্বারা উপাধির সত্ত্ব না হইলেও সুদূর সম্ভাবনা ঘটাইবার প্রাণপণ চেষ্টা ! এতদ্বিষয়ে এখনও বিশেষ কোন প্রতীকার না হইলে উহা যে পরিশেষে মাঠের চাষার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া পড়িবে এবং দেশের অনেক সমৃদ্ধ সন্তান তুরঙ্গ বেচিয়া কুরঙ্গ-করে কাঙ্গালের খাতায় নাম লেখাইয়া, অধঃপাতের পথে গড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সামাজিক প্রহসন-লেখক শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় এই উপাধি-ব্যাধির প্রশমনের নিমিত্ত একবার একটি মুষ্টি-যোগ প্রয়োগ করিয়াছিলেন ! তাহাতে যদিও সংসারের অনেক গাণিক্য, বাঁশীমোহন, কিম্বা ফিস্ সাহেব বাহ্যিক আকার প্রকারটা অনেক পরিমাণে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি জিনিষটা মূলে অনেক স্থলে সেইরূপই রহিয়া গিয়াছে ! এখন রেঙ্কিন প্রভৃতি পোষাক-নির্ম্মাতার প্রসাদে, ভাল সাহেবী পোষাক হয় ; রাজধানীতে থাকিয়া, "খাচ্ছি-দিচ্ছি" বলিতে শিখিয়া, টোন (tone) বদ্‌লান হয় ; ষ্টুপিড্ ডেম্‌ড্ (Stupid damned) বলিয়া, ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচয়

দিবার সুবিধাটুকু করিয়া লওয়া হয়; এবং ধামা-ধরা অর্থ-গৃধ্নু নীচাশয় কতগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদককে অর্থ-সাহায্যে হস্তগত করতঃ সংবাদপত্রে খোস্‌নাম বাহির করা হয়; সুতরাং দেশী গাণিক্য বিলাতী আস্তরণের ভিতরে সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় এক বিচিত্র নূতনরূপে বিরাজ করেন; এবং এখনকার বাঁশীমোহন ও চুরুট খায়, চেন ঝুলায়, একটুকু সাহেবী কায়দায় চলে; কাজেই মোসাহেব বাঙ্গালী বাঁশী-মোহন অপেক্ষা এই পোষাক পরিচ্ছদে সংস্কৃত বাঁশীমোহনকে অন্যরূপ দেখায়। কিন্তু জিনিষটা যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববৎই থাকে,—তবকমোড়া হইলেও কুষ্মাণ্ড যে কুষ্মাণ্ডই রহিয়া যায়, তাহাতে আর ভুল নাই। আমাদের বিবেচনায় এইসামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইহাদিগকে উপর-উপর দেখিলে একটু ধাঁ-ধাঁ লাগিতে পারে, কিন্তু ভিতরে,—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"। উপাধিবিকারগ্রস্ত রোগী অনেকরূপ প্রলাপ বকে; কেহ বলে—"আমি 'রাজা' হ'ব"; কেহ বলে—"আমি 'রায় বাহাদুর' হ'ব"; আবার কেহ বলে "আমায়—'মহারাজ' উপাধি দাও"; আবার কেহবা যুক্তকরে প্রার্থনা করে,—"হা! গবর্ণমেণ্ট; তুমি শুধু আমায় 'কুমার' উপাধিটুকু দাও"। আবার যাহারা একটু বেশী রকমের নিরেট, তাহারা জোর-জবরেই "কুমার" উপাধি চালাইয়া লন। হা কুইন্‌স্ বার্থ ডে!—হা ফার্ষ্ট জানুয়ারী! তোমরা কত লোককেই

অনিদ্র রাখ; কত লোকই তোমাদের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করে এবং তোমাদের সময় উপস্থিত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পোস্ট-পিয়ন বা ডাক-হরকরার প্রতীক্ষায় পথপানে তাকাইয়া থাকে।

এই উপাধি লালসার সংক্রামক ব্যাধি যে শুধু রাজা মহারাজা ধনী জমিদারদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, ভিক্ষাজীবী কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ধন, মান ও যশঅৰ্জ্জন-স্পৃহা চিরদিনই সংসারিক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। সকলেই ধন, মান ও যশ চায়; সকলেই, আপনার কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অনুরূপ, অল্পাধিক পরিমাণে, ঐ সকল পায়; এবং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই ঐ সকল পাইতে অধিকারী। ধন, মান ও যশ সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় হইলেও, ঐ গুলির জন্য মত্ততা এবং ধন, মান ও যশকেই জীবনের একমাত্র সারসম্বল উপাস্যজ্ঞানে, উহাদের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ, কোন অংশেও প্রার্থনীয় নহে। এই শ্রেণীর মত্ততা এবং আত্মোৎসর্গই নানা দোষের আকর,—মারাত্মক ব্যাধি-বিশেষ। উপাধি-ব্যাধিও যশ ও মান অৰ্জ্জনের অসঙ্গত লালসা হইতেই উদ্ভূত।

ধন চাও, সাধুপথে থাকিয়া অর্থকর কর্ম্মে পরিশ্রম কর;—শ্রমক্লিষ্ট স্বেদার্দ্র ললাটই কমলার প্রসাদ পুষ্প-চন্দনে অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। বড় হইতে চাও,—মানলাভে অভিলাষ কর,—প্রাণটাকে উন্নত ও হৃদয়টাকে বড় করিয়া লইতে যত্ন কর;—মানের পুষ্পাঞ্জলি আপনি আসিয়া পায়ে গড়াইয়া পড়িবে। যশ

পাইতে ইচ্ছা হয়, লোকহিতকর যশস্য কর্ম্মে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দাও,—যশের জয়মাল্য আপনি গ্রথিত হইয়া, তোমার কণ্ঠে বিলম্বিত হইবে। কিন্তু, ধন-লালসায় উন্মাদ কখন চুরি করিয়া ধনী হইতে পারিয়াছে কি ? মানের লোভে মাতাল হইলে, আপনি বড় হইয়া মানের উচ্চ মঞ্চে আরোহণের উপযোগী, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা বা অবসর থাকে না। ঈদৃশ মানার্থী মানী মানেও প্রাণে আহত হইয়া, অযথা নিন্দাবাদ বা অলীক কলঙ্ক রটনা দ্বারা বড়কে ছোট বানাইয়া, আপনি বড় হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু একের মান-নাশে অন্যের মান একবিন্দুও বাড়ে না ; সে বরং ক্রমে ক্রমে নিজেই 'অমানীর' পদবীতে অবতরণ করিয়া, অশেষ-বিশেষ বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। যশোলোভে ক্ষিপ্ত গলায় ঢাক লইয়া, দ্বারে দ্বারে অহোরাত্র আপনার ঢাক আপনি বাজাইয়া ফিরিলেও, যশের মুখ দেখিতে পায় না ; কেহই তাহাকে যশস্বী বলিয়া নমস্কার করিতে চাহে না ;—লাভ হয়, অকাণ্ডে পরিশ্রম ও উপহাসের টিট্‌কারী ! বস্তুতঃ, এখন ঈদৃশ যশতৃষাতুর ক্ষেপার ক্ষিপ্ততায়, দেশের সমস্ত অঙ্গই আক্রান্ত।

উপাধি,—মানের বিজয়পতাকা,—যশের জয়ঢাক। কাজে কাজেই এই পতাকা ও জয়ঢাকের 'আড়তে' আজি কালি লোকের এত ভিড় ;—খরিদদারের এইরূপ গড্ডলিকা প্রবাহ। যাহার শক্তি আছে, সে ক্রয় করিয়া লইতেছে। যাহারা সে শক্তি নাই, কিন্তু নয়নে অশ্রু ও হাঁড়ীতে কিঞ্চিৎ তৈল আছে, সেও অশ্রু-জলে তৈলতর্পণ করিয়া, দুই একটা ছিন্ন ও জীর্ণ পতাকা অথবা পরোভুক্ত বা Second-hand গোছের দুই একটা জয়ঢাক আয়ত্ত

করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে! যাহার এ সকলের কোনটিই নাই, সে জাল জুয়াচুরি, হাতের জোর বা কল-কৌশল-পূর্ণ চাতুরির আশ্রয় লইয়া, মনের সখ মিটাইতে চেষ্টা করিতেছে।

সত্য, ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এক্ষণে কলিযুগের অধিকার। কিন্তু বাঙ্গালার কলিযুগকে উপাধি-যুগ বলিলেই মানায় ভাল। তালে হউক, বেতালে হউক, উপাধির জন্য কাহার প্রাণ না নাচিয়া উঠে? কোন্ অরুচি-গ্রস্ত জরৎ-জিহ্বায় উপাধির নামে, লালা না ঝরে? বস্তুতঃ বিলাসের মণি-মন্দির হইতে ভিখারীর কুটিরে পর্য্যন্ত, আজি সমস্ত স্থানই, উপাধির জন্য আলোড়িত, বিলোড়িত ও উৎক্ষিপ্ত!

পূর্ব্বে, এদেশে, শাস্ত্রীয় ব্যায়ামের কঠোর পরিশ্রমে জীবনের একার্দ্ধ অতিবাহিত করিয়া, টোলের কৃতী ছাত্র নবদ্বীপে গমন করিতেন; এবং নবদ্বীপের টোলে প্রসিদ্ধনামা প্রবীণ অধ্যাপকের অন্তেবাসীরূপে, দীর্ঘদিনব্যাপি তপস্যার পরে, উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহাদের কাহারও নাম 'পীতাম্বর', কাহারও নাম 'কালীকান্ত' কাহারও নাম 'সারদাচরণ', কাহারও নাম 'প্রসন্নচন্দ্র', কাহারও নাম 'চন্দ্রকুমার', কাহারও নাম 'রামধন'।

এখন আর সে পাঠ নাই। এখন একদিকে গবর্ণমেণ্ট, "তীর্থের" মালা গাঁথিয়া নির্দ্দিষ্ট নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র নিবহের কণ্ঠে উহা পরাইয়া দিতেছেন,—অন্যদিকে সারস্বত-সামাজ প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিত-সভা উপাধির 'পশরা' সাজাইয়া পরস্পর প্রতি যোগিতার গলায় "চাই উপাধি চাই" হাকিতেছেন; এবং

যাহাকে পরীক্ষার বৈতরণী পার করাইয়া লইতে পারিতেছেন, তাহারই নামের পশ্চাতে তাঁহার পসন্দমত একটা উপাধির 'রাখী' বাঁধিয়া দিয়া পণ্ডিত বানাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহাতে যেমন বাড়িতেছে, উপাধিধারীর সংখ্যা,—তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে উপাধির নূতন নূতন রঙ-দার রকম। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, আর কএক বৎসর এইভাবে চলিলে, উপাধি-ব্যাধি-শূন্য নিখুঁত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়াও কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। দ্বিজনামাঙ্কিত যজ্ঞসূত্রধারী মাত্রেই উপাধিধারী হইয়া উঠিবেন!

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল উপাধিপরীক্ষার সহিত কিছুদিনব্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; সুতরাং ইহাতে অল্পাধিক মাত্রায় পরিশ্রম ও সাধনারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহা ছাড়া, বিনা পরিশ্রমে, ও বিনা অধ্যয়নে, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নির্বিবশেষে, সকল শ্রেণীস্থ লোকই, না জানি কি সন্ধানে, এখন ইচ্ছা করিলেই, উপাধি-গ্রস্ত হইতে পারিতেছেন!

এই শ্রেণীর অনায়াসলব্ধ শাস্ত্রীয় উপাধির কতকগুলি সাময়িক,—কতকগুলি চিরস্থায়ী। কতকগুলি "আটপরে"—কতক গুলি 'পোষাকী'। পোষাকীগুলি, প্রায়শঃই জাল-জুয়াচুরি-লব্ধ চোরা-মাল। চোরা-মালের বে-হিসাবী ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা আছে। চৌকীদার ও পুলিশের ভয়ে উহা লুকাইয়া ভোগ করিতে হয়; একটু ঢাকিয়া রাখিয়া সামলাইয়া ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণের চক্ষে, প্রবন্ধের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, লেখকের নামে, সহৃদয় প্রচারক, সময় সময়, [illegible]য়া

করিয়া, উপাধির পুচ্ছ যোজনা করিয়া দেন ; কখন কখন বা লেখক নিজেই উহা হাতের জোরে পরিগ্রহ করিয়া লন ! ইহাতে কখন কখন প্রবেশিকায় অপ্রবিষ্ট বিদ্যালয়ের 'নাম-কাটা' সিপাহীর ঘাড়েও উপাধির বোঝা চাপিয়া পড়ে ; কখনও বা বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের মস্তকেও 'বিদ্যালঙ্কার' বা 'বিদ্যানন্দের' নূতন মুকুট আসিয়া যুড়িয়া বসে ! এই উপায়ে লব্ধ উপাধির বোঝা লইয়া, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান নিরাপদ নহে। সুতরাং, সাময়িক ব্যবহারের জন্য উহাকে 'পোষাকী' বস্তুরূপে 'তাকে' তুলিয়া রাখাই সঙ্গত ও সমীচান। কিন্তু 'বিদ্যানন্দ' বা বিদ্যা-লঙ্কারের' উপরে গবর্ণমেণ্ট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দাবী-দাওয়া নাই ; সুতরাং, উহা অনায়াসেই চিরস্থায়িরূপে পাকা "আটপরে" আভরণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

শারদীয় পূজার পূর্ব্বে, এদেশের অধ্যাপকবর্গ যখন ধনী-লোকের দরবার হইতে বার্ষিক আদায়ের জন্য দলে দলে 'ফিরায়' বহির্গত হন, তখন কখন ২ তাঁহাদিগের সঙ্গীয় পাচক ঠাকুরও হাত-গড়া "শিরোমণি" উপাধিযোগে আত্ম-পরিচয় দিয়া, 'প্রণামী' সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকেন ! যে "শিরোমণি" উপাধি, এক দিন রঘুনাথের মত ঘন-গভীর জ্বলন্ত প্রতিভার আভরণরূপে সম্মানিত হইয়াছিল, 'হাতা-নাড়া' নিরক্ষর ব্রাহ্মণ আজি গায়ের জোরে সেই অলঙ্কার কাড়িয়া নিয়া, পাচক 'শিরোমণি' সাজিতে-ছেন ! এটিও অবশ্যই সাময়িক। ইদৃশ "পাচক শিরোমণি" বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, অথবা পরিচিত লোকের সহিত তাঁহার চারি চক্ষে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, এ উপাধি, অমনি লাজে ভয়ে

জড়সর হইয়া তাড়াতাড়ি পুছিয়া বা উড়িয়া যায়, এবং নেড়ানেংটা 'চক্রবর্ত্তী' বা 'দেবশর্ম্মার' সেই পুরাতন-কঙ্কালই পশ্চাতে পড়িয়া থাকে!

কোন দিন কোন টোলের ত্রিসীমায় পদার্পণ করা ঘটে নাই,—জীবনে নবদ্বীপ নয়ন-পথেও পতিত হয় নাই,—গবর্ণমেণ্ট বা কোন পণ্ডিত সভার উপাধি পরীক্ষায় প্রার্থী হওয়াও অদৃষ্টে যুটে নাই;—অথবা কোন সম্প্রদায়ের কোন গুণগ্রাহী নায়ক, চালক বা অধ্যক্ষও কোন গুণ শক্তি লক্ষ্য করিয়া, সাদরে কোন উপাধি প্রদান করেন নাই; তথাপি বুঝা যায় না, কি কৌশলে বা মন্ত্র-বলে, কেহ 'কাব্যবিনোদ' বা 'কাব্যবিশারদ', কেহ 'কাব্যনন্দ' বা 'প্রেমানন্দ', কেহ 'কবিরত্ন' বা 'তর্কচূড়ামণি' সাজিয়া, আসর মাতাইয়া লইতেছেন! এই সকল উপাধি, সময় সময় এতদূর পাকা ও স্থায়ী হইয়া যাইতেছে যে, লোক-সমাজে পরিচয়ের সময়, নাম, ধাম ও কুল-শীলকে পিছনে ঢাকিয়া রাখিয়া, ঐ উপাধিই আগে গলা বাড়াইয়া কথা কহিতেছে! এদেশে এখন ঘাটে পথে, যেখানে, সেখানে "তত্ত্বনিধি" বা "ভক্তনিধি" ইত্যাদি "নিধির" দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "জ্ঞানানন্দ", "প্রাণানন্দ", প্রেমানন্দ", "কাব্যানন্দ", "সদানন্দ" ও "পঞ্চানন্দের" অবিরাম-প্রবাহে আনন্দের বাজার মিলিয়াছে! সম্ভবতঃ, অচিরেই এই বাজারে 'গঞ্জিকানন্দ', 'মদিরানন্দ', 'আফিঙ্-আনন্দ' এবং 'ক্যাটলেট্' বা 'কোর্‌মানন্দের' ও আমদানী হইবে। উপাধি, বলিতে কি, এখন সার্ট, কোট বা কুর্ত্তার ন্যায়, অঙ্গে অঙ্গে রঙ্-বিরঙে লম্বমান!

বঙ্গভূমি চিরদিনই কবির দেশ। বঙ্গে 'কাব্যবিশারদ' বা 'কাব্যানন্দ' প্রভৃতি উপাধি, আত্ম-কৃত ব্যাধি হইলেও, তত বিসদৃশ বা বিপ্লবজনক নহে। এদেশে যে কলম ধরে, সে-ই কবি হয়; সে-ই চাঁদের জ্যোৎস্না ও ফুলের মধু লইয়া, কেলি করিতে কসুর করে; সে-ই ভ্রমর-গুঞ্জনে প্রেমের কূজন শুনিয়া চমকিয়া উঠে,—এবং কোকিলের কুহরবে উহু করিয়া মূর্চ্ছা যাইতে শিখিয়া লয়! কবি হইতে বেসী কষ্ট নাই,—রমণীর রূপ, চটুল নেত্রের চারু চাহিনি, বিম্বাধরের চপলা-চমক এবং উহার সহিত প্রেমের হা-হুতাশ ও বিচ্ছেদের একটুকু উচ্ছ্বাস মিশাইয়া লইয়া, কতকগুলি বাঁধা-বোলের বুকনি ভরিয়া, মিল যুটাইয়া একটা কিছু লিখিতে পারিলেই, লেখক কবি হইতে পারেন। এদেশে মাইকেলও কবি, আর ঐ যে কবির আসরের 'জাম্বুবান্' নাক, মুখ, চোখ ও বাহু নাচাইয়া, লম্ফ ঝম্ফ দিয়া, ছড়া কাটিয়া প্রতি পক্ষের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতেছে, সেও কবি! এ অবস্থায় ভদ্রলোকের সন্তান, যদি কলম-পেশায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, কাব্যের নামে আপনা-আপনি 'বিনোদ' 'বিশারদ' বা 'আনন্দ' হইতে ইচ্ছা করেন, হউন তাহাতে অতটা আশঙ্কা বা আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আত্মকৃত 'সারস্বতী', 'ভারতী', 'তত্ত্বনিধি ও 'ভক্তিনিধির' ছড়া-ছড়ি দেখিলে ভয় হয়,—বস্তুতই মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যোগ্য জনের যোগ্যতায় অনাদর, গুণবানের গুণবত্তায় অবহেলা যেমন অবনতির পূর্ব্ব সূচনা,—অযোগ্য স্থানে অভিনন্দনের সংবর্দ্ধনা 'অগুণীরা 'গুণাকর' আখ্যা, ব্রাহ্মণের অর্ঘ্যে চণ্ডালের অভ্যর্থনাও তেমনই ভাবী অধঃপাতেরই পূর্ব্বাভাস।

'ভারতী' উপাধিতে, একদিন, এদেশে 'কেশব ভারতী' প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষ সম্মানিত হইতেন। কেশবভারতী গৌরাঙ্গের গুরু,—নবদ্বীপের সেই বঙ্গ-প্লাবিনী শতমুখী গঙ্গা,—সেই উচ্ছল তরঙ্গা ভাগীরথীর ভগীরথ। আর আজি বঙ্গে, জমিদারী সেরে-স্তার জমা-নবীশ, কালেক্টারির কেরাণী' অথবা ছাপাখানার প্রুফ্‌রিডার্ ও 'ভারতী' উপাধির ধ্বজা উড়াইয়া, ভাবের কীর্ত্তনে গা ফুলাইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন! এখন শুধু 'ভারতীতে' হই-তেছে না; 'ভারতীর' মাথায় 'মহা' চড়াইয়া আরাব ও সংরাবের গল-গর্জ্জনে উহাকে আরও গুল্‌জার করিয়া লওয়া হইতেছে!

যাঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি বা অর্থসঙ্গতি আছে, বিধাতার অনুগৃহীত সেই ভাগ্যবান্, আত্ম কৃতিত্বে বা আশ্রিত বা পোষ্য-বর্গের অনুগ্রহে, 'রত্নবিধি', 'স্বর্ণ বা রৌপ্যনিধি', 'মুক্তানিধি' বা 'পান্নানিধি' হউন, আপত্তি নাই। কিন্তু'তত্ত্বনিধি' ও 'ভক্তিনিধি' বস্তুতই বড় উচ্চ শ্রেণীর কথা। ঈদৃশ উপাধি লাভের উপযোগী স্বনামধন্য পুরুষ লোক-সমাজে সচরাচর দৃষ্টি গোচর হন না। দেশের বা সমাজের সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখন কখন এই শ্রেণীর মহারথীর আবির্ভাব বা জন্ম হইয়া থাকে। যাঁহারা জগতের তত্ত্ব-সমুদ্রে ডুবরীর ন্যায় আজীবন ডুবিয়া রহিয়া, মানব-জগতে প্রকৃত তাত্ত্বিকরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞান-গুরু স্পেন্‌সার প্রভৃতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ও, বোধ হয়, "তত্ত্ব-নিধি" র মত উচ্চ উপাধি গ্রহণে সঙ্কুচিত না হইয়া পারেন না। কিন্তু, আমাদিগের উপাধি-উন্মাদ বাঙ্গালার কথা অন্যরূপ! যাঁহারা, গৃহিণীর গঞ্জনা, নথ-নাড়া, বাহু-নাড়া ও কঙ্কণ-ঝণ্‌ঝণা

ভিন্ন জগতের অন্য কোন তত্ত্বের ধার ধারেন না; স্তুতি-পুষ্পাঞ্জলির বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান ভিন্ন, যাঁহারা আর কোন বার্ত্তার ভাবনা ভাবেন না;—হয়ত, তাঁহাদিগের কেহ কেহই বুকে টুকি দিয়া, মাথায় উপর 'তত্ত্বনিধির' নিশান উড়াইয়া দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইতেছেন! ভক্তি-বিগ্রহ, গৌরাঙ্গদেবের, সঙ্গী, সহচর ও পারিষদিগের মধ্যে প্রকৃত ভক্তি-নিধিরূপে পূজা পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বহু ছিলেন। সে শুভযুগের,—সেই মাহেন্দ্র ক্ষণের পরে, অমন ভক্তি-জীবন জীব এদেশের মনুষ্য-সমাজে আব কোথাও ফুটিয়াছে কিনা, সন্দেহ। 'বাইশ বাজারে' বেত খাইয়াও যাঁহার জড়-শরীর বিন্দুমাত্র ব্যথিত হয় নাই,—যাঁহার অন্তরাত্মা, সেই দুঃসহ শারীর-যন্ত্রণার মধ্যেও, হরিনামের বিমল আনন্দে বিভোর ও বিশ্রব্ধ রহিতে পারিয়াছে, তাদৃশ মহাপুরুষও আপনাকে কাঙ্গালের প্রাণে, 'দাসানুদাস' ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ নামে পরিচিত করিতে ভাল বাসেন নাই। কিন্তু আজি বঙ্গে ভাগবতের দুটি শ্লোক মুখস্থ করিতে পারিলেই, এক একজন এক একটা অবতার সাজিয়া, 'ভক্তিনিধি' বা 'ভক্তরত্ন' নামে বাহ্বাস্ফোটন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং গর্ব্বে গলা বাড়াইয়া, লড়াইর মোরগের মত, পাখ-সাটে প্রতিপক্ষকে উড়াইয়া দেওয়ার উদ্যোগ করিতে থাকে! উপাধির ইহা অপেক্ষা অন্য আর কি বিড়ম্বনা সম্ভবে?

আর এক উপাধি,—'স্বামী'। এদেশে অন্তঃপুর-রাজ্যের রাণী স্ত্রীর অনুগ্রহে এই উপাধি সকলেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য বটে। তবে অবশ্যই, যেখানে স্বামী, নব্য যুগের নূতন

সমীকরণে, স্বামীর তালিকা হইতে নাম খারিজ করিয়া, প্রাণের আবেগে, ‘প্রিয়তম’ সাজিয়াছেন ; পূর্ব্বে প্রাণের স্বামী ছিলেন, এক্ষণ সাধ করিয়া, এক সিঁড়ী নীচে নামিয়া, শুধু ‘প্রাণ’ হইয়াই সন্তুষ্ট আছেন। অথবা যিনি বিধি-বিপাকে স্বগৃহেই স্বামিত্ব হারাইয়া “হাজ্‌ব্যাণ্ড্” (Husband) হইয়া বসিয়াছেন, এবং “হাজ্‌ব্যাণ্ড্‌ম্যান” Husbandman) হইয়া নিড়ানী-করে ক্ষেতে নামিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন ; তঁহাদিগের সম্বন্ধে পৃথক্ কথা তাঁহারা অবশ্যই সকলের ভোগ্য এই ‘স্বামী’ উপাধিতে বঞ্চিত। এতদব্যতীত অন্য সকলেই আপন আপন ঘরে অবাধে ও অপ্রতিহত ভাবে স্বামী ! কিন্তু এইরূপ লুপ্ত-প্রায় গুপ্ত উপাধিতে উপাধি-কামুকের তৃপ্তি হইবে কেন ? শুধু ‘স্বামী’ হইলে হইবে না, ‘স্বামীজি’ হওয়া আবশ্যক। শুধু স্ত্রী স্বামী বলিলে কি হইল, সর্ব্বসাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক সম্মিলিত হইয়া, ‘স্বামী’ বলিয়া নমস্কার না করিলে, মনের সাধ মিটে কৈ ?

‘তত্ত্বনিধি’ প্রভৃতির ন্যায় এই শ্রেণীর ‘স্বামী’ উপাধিও উচ্চ শ্রেণীর বস্তু। এ উপাধি নির্লিপ্ত যোগী, ও ভোগ-রাগ-বিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই প্রাপ্য ! যাঁহারা জড়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অধ্যাত্ম-জগতে অতি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন এবং আপনাদিগের ক্ষুদ্র খালের মুখ খুলিয়া দিয়া, মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন ও আত্মপর পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে জগৎস্বামীর সহিত যাঁহা-দিগের চির জাগন্ত একত্ব সম্বন্ধ স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে,

তাঁহারা* 'স্বামী' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। এরূপ দুর্লভ জন মনুষ্য-লোকে যেখানে সেখানে, 'ওমেদোয়ারের' মত, ঘুরিয়া বেড়ান কি? কিন্তু এদেশের উর্ব্বর মাটীর গুণে, এক্ষণ 'স্বামীজির' বাজার বড়ই শস্তা। যাহার গায়ে ভগবান্-বস্ত্র, ললাটে ভস্ম, ও হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, সেই এখন এক এক দিকের এক একটা প্রবীণ 'স্বামীজি'! এ 'স্বামী' উপাধি কে দেয়, কেন দেয়, মনুষ্য-বুদ্ধির তাহা অগম্য। অথচ, যখন তখন যেখানে সেখানেই দুই একটি স্বামীজির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই শ্রেণীস্থ স্বামীজির ভস্ম-ভূষা, জটা-জুট ও দণ্ডকমণ্ডলু দেখিয়া, যেমন একদিকে নির্জ্জন পঞ্চবটী-বাসিনী সীতাসতীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে,—তেমন অন্যদিকে হীরা মেলেনীর মত জীবও, ভয়ে বিস্ময়ে আপনার হাব-ভাব ও ছটা-নটাটুকু সম্বরিয়া লইয়া, চাউনি দেখিয়াই, বড়গলায় 'বাবা' বলিয়া, পার পাইবার পথ দেখে! ইহা কি?

উপাধি গুণবাচক বিশেষণ;—নামের পরিচায়ক চিহ্ন;—ব্যক্তিগত গৌরবর্দ্ধক আভরণ। কিন্তু দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ, উহা, এক্ষণ অনেক স্থলেই, গুণের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, নিরবছিন্ন ভিত্তিবিহীন অলাক অভিমানেরই সৃষ্টি, পুষ্টি ও তুষ্টি সম্পাদনে নিরত হইয়া পড়িয়াছে। উপাধির নেশায় সমগ্র দেশ উন্মত্ত! এ অবস্থায় শুধু ধন-কুবের ভূস্বামী বেচারীদিগের অপরাধ কি? যাহার তহবিলে বিদ্যার একটা 'কাণাকড়া' ও সঞ্চিত নাই, সেও এখন হাতের 'সাফাই' বা কলে কৌশলে 'বিদ্যাবাগীশ' বা 'বিদ্যানিধি' হইয়া, অবাধে পার

পাইয়া যাইতে পারে,—'খেউড়-ওয়ালা' ও যখন কবির দলে মিশিয়া, সময় সময়, 'কাব্য-বিনোদ' বা 'কবিরত্ন' নামে অনায়াসে তরিয়া যাইতে সমর্থ হয়, তখন যাঁহার ভূমি আছে,—জমি আছে, আপনার লোক জনের মধ্যে অপরিসীম প্রতাপ প্রতিপত্তি, প্রভাব ও প্রভুত্ব আছে, তিনি যদি আশ্রিত, অনুচর ও পার্শ্ব-চরদিগকে দুইটি রজতচক্র বা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিনা 'পাসে' এবং পিতা, পিতামহ প্রভৃতি কাহারও 'মহারাজা' বা 'রাজা' উপাধি না থাকা সত্ত্বেও, 'কুমার' নামে অভিহিত হইতে পারেন, কিংবা 'রায়বাহাদুর' 'রাজাবাহাদুর', 'মহারাজা' বা 'কে-সি-এস-আই' প্রভৃতি উপাধির জন্য কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় বা সাহেব-সুবার উপাসনায় একটু অতিরিক্ত মনোযোগী হন, তাহা তেমন একটা গুরুতর দোষের বিষয় কি ?

উপাধি বস্তুতঃই ব্যাধি,—দুরূহ দুশ্চিকিস্য ব্যাধি। এদেশে এখন আর উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়বিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে বা (Sporadic) অবস্থায় সীমাবদ্ধ নহে। একেবারে ভয়াবহ সংক্রামক মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত! সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে ইহার চিকিৎসা অনাবশ্যক। ইহার জন্য ব্যাপক মুষ্টিযোগ বা বসন্ত, ওলাউঠা বা প্লেগের টীকার ন্যায় বিশেষ কোন প্রতিষেধ-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। বসন্ত, ওলাউঠা, ও প্লেগের বিষ বা বীজ মৃদু মৃদু মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, মৃদু মূর্ত্তিতে ঐ রোগের বিকাশ ঘটে ও সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু এই উপায়ে টীকার 'মার্কা-মারা' দেহে ঐ রোগের

বহিস্থ বিষ আর তেমন সাংঘাতিক মূর্ত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। উপাধি-ব্যাধি সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা টীকার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয় না কি? বস্তুতঃ, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

একদা কোন মহারাজের 'সোল্‌তানত' দেখিয়া নগণ্য এক গ্রাম্য চণ্ডালে মাথা ঘুরিয়া গেল;—তাহার বড়ই সখ হইল যে, সে মহারাজের 'বাপ' হইবে। সে একবারে বিকারের রোগীর মত ক্ষেপিয়া উঠিল! সে জানিত তাহার রাজা নাই, সম্পত্তি নাই, তাহাকে কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার পুত্র কখনও মহারাজ হইবে, ইহা অসম্ভব কথা। ইহা সে বুঝিত; কিন্তু তথাপি সে তাহার এই দুরাকাঙ্ক্ষাকে কিছুতেই দমন রাখিতে পারিত না। কালক্রমে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন পথ না পাইয়া, অবশেষে একবারে পুত্রের নামই রাখিয়া দিল "মহারাজ"। লোকে তাচ্ছল্য করিয়া উহাকে "মহারাইজা" বলিত বটে,—কিন্তু ভালমুখে আদর করিয়া ডাকিতে হইলে, আর গত্যন্তর ছিল না, তখন 'মহারাজ' বলিয়াই সম্ভাষণ করিতে হইত। ঐ সম্ভাষণ শুনিলে বৃদ্ধ চণ্ডালের প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এইরূপে উহার 'মহারাজের' 'বাপ' হওয়ার সাধ এক প্রকার পূর্ণ হইয়া গেল। দুরাকাঙ্ক্ষার সেই নিদারুণ অন্তর্জ্বালাও ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিল।

আমার বিবেচনায় এদেশের সমস্ত পিতা মাতা অভিবাবক দিগেরই, এই চণ্ডালের অনুকরণে, গো-বীজে বসন্তের টীকার

ন্যায়, শৈশবেই শিশুদিগকে 'উপাধির বীজে' টীকা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, শেষে এই রোগের বহিস্থ বিষে তেমন সাংঘাতিক উপদ্রব ঘটাইতে পারিবে না। শিশুদিগের নামকরণ সময়ে, যদি 'চারু', 'চূর্ণি' ও 'মতি' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে, 'মহারাজ' 'রাজাবাহাদুর', 'রায়বাহাদুর', 'কাব্যবিশারদ', 'তত্ত্বনিধি', 'ভক্তিনিধি', 'প্রেমানন্দ', ও 'জ্ঞানানন্দ' প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সমস্ত লেঠা চুকিয়া যাইতে পারে। নামে গুণের মুখাপেক্ষা করে না। তাহা করিলে, কখনও সুশীল নামে দুর্ব্বৃত্ত, রসিক নামে মূক, গৌরাঙ্গ নামে 'পাথুরে গোপাল' সমাজে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না! উপাধিগুলি 'নামকরণের' নাম হইয়া গেল, গুণদর্শী কোন শ্রোতার কাণেও বাধিবে না; ঐ সকল উপাদেয় অক্ষরে অভিহিত ও আহূত হইবার সুখ ও সখটুকুও ক্রমে মিটিয়া আসিবে। চটি সওয়ার পোণ্টাবাহী ফেরিওয়ালা গ্রাম্য হাতুড়ের এই সামান্য মুষ্টিযোগের প্রতি মহামহোপাধ্যায় ধন্বন্তরিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

বঞ্চনা ব্যবসা।

সংসারে বিনা কাজ কর্ম্মে শুধু বসিয়া খাওয়া এখন প্রায় পনর আনা লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। অধিকাংশ লোককেই একটা কিছু কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা পাত্র—যাঁহাদিগের পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি আছে, পূর্ব্বপুরুষদিগের কষ্টোপার্জ্জিত কোম্পানীর কাগজ, লগ্নী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বাণিজ্য ও কারবার আছে—তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য বোধে, বৈষয়িক উন্নতি বা দেশেরও দশের হিতকল্পে কার্য্য করিতে গেলে অনেক করিবার আছে। কর্ত্তব্য বোধ থাকিলে এক্ষেত্রে তাঁহাদের খাটুনী কোন শ্রেণীর লোকদিগের অপেক্ষাই কম হইবার কথা নহে! আর যাঁহাদের নিজের পদেই ভর করিয়া জীবনসংগ্রামে কোনরূপে তিষ্ঠিয়া থাকিতে হয় তাহাদের তো কথাই নাই; কোন না কোন শ্রেণীর কর্ম্মে তাহাদিগকে নিয়তই নিযুক্ত থাকিতে হয়, নতুবা সংসার চলাই ভার! এই উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই ধন্য, মানব জগতে এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে ইহাঁদের কথা আলোচ্য নহে। আমাদের দেশে যে সকল বঞ্চনাব্যবসা, সাধুতা, সজ্জনতা ও বৈধতার আবরণে সাধারণের চোখে ধুলিদিয়া আপনাদের প্রসার প্রতিপত্তি বাড়াইতেছে দেশ ও সমাজের হিতকল্পে, সাধারণের

চক্ষু ফুটাইয়া দিবার নিমিত্ত এস্থলে সেগুলি সম্পর্কেই দুচারিটি কথা বলিব। বলা বাহুল্য যে, এই সকল ঘৃণ্য ব্যবসা আমাদের দেশ ও সমাজকে কীটদষ্ট ও জীর্ণশীর্ণ এবং উহার ভবিষ্য উন্নতির পথ একবারে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে ; সুতরাং এই সকল জঘন্যপঙ্কিল স্রোত হইতে দেশ ও সমাজের রক্ষা বিধানার্থে দেশস্থ জনসাধারণকে সাবধান হইবার নিমিত্ত বিশেষরূপে অনুরোধ করাই এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

গুরুগিরি। (১)

মানব জগতে ধর্ম্ম সকলের বড়। এহেন ধর্ম্ম যাহারা কৃত্রিম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিকৃত বা নষ্ট করিতেছে তাহাদের কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে নানা শ্রেণীর জয়াচুরি-ব্যবসার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্ব শূন্য, আরামজনক আহার-নিদ্রা সেবা কুশল গুরুগিরি ব্যবসাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। পদধূলী বিতরণকারী, শিষ্যও ভক্তমণ্ডলী প্রদত্ত মৎস্য মাংস ঘৃত ও দুগ্ধ-পরিপুষ্ট পীবরতনু এই শ্রেণীর গুরুদিগের নধরকান্তি দেখিলেই সাধারণ লোক হইতে এবং তপঃকৃশ ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন প্রকৃত গুরু স্থানীয় সাধকগণ হইতে ইহাদিগকে সহজেই পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বতোভাবে পরস্মৈপদে রাজারভোগে ভোজন ব্যতিরেকে তাদৃশ নধরকান্তির বিকাশ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক এ সকল কথা পশ্চাৎ যথাস্থানে প্রকটিত হইবে। গুরুগিরি ব্যবসায়ে এই স্বয়মিচ্ছু

বা ভলাণ্টিয়ার গুরুদিগের বিষয় বিবৃত করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধ স্বরূপ প্রকৃত গুরু ও তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলা আবশ্যক।

গুরু বড় গৌরবাত্মক নাম। ভক্তিমান ব্যক্তিগণ জগৎপাতা জগদীশ্বরকে ও জগদ্গুরু বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক গুরুনামের গৌরব শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। গুরু নামের মাহাত্ম্য এক কথায় ব্যক্ত করিবার উপযোগী শব্দ ভাষার অভিধানে আছে কিনা জানিন'! বস্তুতঃ গুরু অপেক্ষা অধিকতর পূজার্হ-শ্রেষ্ঠতরজন মনুষ্য জগতে আর কেহই হইতে পারেনা। গুরু শিষ্যের নিকট জগদারাধ্য জগদীশ্বরেরই প্রতিরূপ রূপে পূজিত ও সম্মানিত। কারণ গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা যোগে অজ্ঞান তিমিরান্ধ শিষ্যের নয়ন উন্মীলন করিয়া দেন! যিনি সংসার মোহমুগ্ধ পথভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রকৃতই আপন জ্ঞানালোক দ্বারা সৎপথ দেখাইয়া সৎপথে চালনা করিতে সমর্থ, সে গুরু যে সর্ব্বথাই জগদীশ্বরের প্রতিভূ রূপে পূজা পাইবার যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই শ্রেণীর গুরু আর বর্ত্তমান্ প্রবন্ধের গুরুগিরির গুরু এক কথা নহে; এ উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

এককালে এদেশে লোক প্রকৃত জ্ঞানালোক সম্পন্ন মোহান্ধকারে পথ প্রদর্শনক্ষম, মহাপুরুষকে বহু পরিশ্রম ও যত্নে খুঁজিয়া লইয়া গুরুপদে বরণ করিত। ঈদৃশ গুরু ও শিষ্য করিবার যোগ্যজন না পাইলে কখনও মন্ত্রশিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। যেখানে সেখানে মন্ত্র বিতরণ পূর্ব্বক তিনি

বেনাবনে মুক্তা ছড়াইবার অভিনয় দ্বারা মন্ত্রের অপব্যবহার বা অবমাননা করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেন না। সর্ব্বাংশে গুরুপদবাচ্য এই শ্রেণীর মহাজন দেশে এখনও আছেন; এখনও অনেক চক্ষুষ্মান ভাগ্যধর মেকিরবাজার বাচাই করিয়া ঈদৃশ কৃতী মহাপুরুষের কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

প্রথমতঃ দেশে যাঁহারা সদ্গুরু ছিলেন, গুরুগিরি করা তাঁহাদের ব্যবসায় ছিল না। কালে যেমন গুরুর সন্তানও জন্ম সম্বেই গুরুরূপে গণ্য হইতে লাগিলেন, বংশপরম্পরা-গত গুরুপদের সৃষ্টি হইতে থাকিল, গুরুর তেজো গৌরবও তেমন খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিল। ডাইলিউশনের পর ডাইলিউশন হইতে হইতে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের ন্যায় মাদার-টিংচার বা আসল জিনিষের গন্ধটুকুও শেষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল! তথাপি গুরুতা ব্যবসায়ের ভিতরে এখন পর্য্যন্তও কিঞ্চিৎ সার না আছে, এমন নহে; এখনও ব্যবসায়ের অনুরোধে গুরুবংশের অনেক সন্তান স্বীয় কৌলিক ব্যবসাটি সুন্দররূপে চালাইবার উপযোগী বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। কোন প্রকার ভেল্‌কি, বুজুরকি বা কাপট্যের আশ্রয় না লইয়া তাঁহারা সরল প্রাণে শিষ্যের মঙ্গল কামনায়ই আজীবন ব্রতী রহিয়া সদ্গুরুর সম্মানলাভে কৃতার্থ হন। গুরুবংশীয় যাঁহারা অবস্থা বিপাকে উল্লিখিতরূপ উপার্জ্জনে অসমর্থ, তাঁহারাও প্রায়শঃই বঞ্চনা বা প্রতারণার পথ না লইয়া শুধু জন্মস্বত্বের দাবিতেই জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা

করেন। বলা বাহুল্য যে এই শ্রেণীর গুরুদিগের কৌলিক ব্যবসায় সকল স্থলে বর্ত্তমান সাংঘাতিক গুরুগিরির অন্তর্ভুক্ত নহে। এই গুরুতা বা গুরু ব্যবসায় রূপান্তরিত হইয়া, কালধর্ম্মে, অবস্থা বিশেষে আরও নীচে নামিয়া বর্ত্তমান গুরু-গিরিতে পরিণত হইয়াছে। এই গুরুগিরিতে প্রকৃত গুরুর সেই উচ্চ গৌরব দূরের কথা, সাধারণ গুরুতার ডাইলিউট করা সার-বত্তারও একবিন্দু লক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। দিন দিনই এই গুরুগিরির তন্তুতে তন্তুতে বঞ্চনা, প্রতারণা, ফাকিবাজি ও ভণ্ডা-মির নূতন নূতন প্রক্রিয়া মিশ্রিত হওয়াতে উহা কিম্ভূত কিমাকার এক অদ্ভুত জিনিষ হইয়া উঠিতেছে!

কোন্ কালে, কোন্ দুর্বিত্তের পাপ প্রবৃত্তির সন্ধুক্ষণে প্রকৃত মহাজনোপম পূজনীয়, গুরুস্থানীয় সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী, সংযত জীবন ব্রহ্মচারী এবং ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানবান্ যতিসম্প্রদায়ে প্রথম বঞ্চনা, চাতুরী, বা ভণ্ডামির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এতৎ সম্পর্কে পূর্ণ্যাপূজ্য শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনার প্রতি সেই কালেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে সংক্ষেপে উক্তঘটনার উল্লেখ, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কথাটা এই।—

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা ও লক্ষ্মণ সহ সুদূর দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিলেন, তখন রামের প্রতি প্রগাঢ়অনুরাগী মহর্ষি ভরদ্বাজ আপন আশ্রমে বসিয়া স্নেহ বশতঃ সময় সময়, যোগবল বা ধ্যানযোগে রামচন্দ্রের সংবাদ লইতেন। একদিন এই উদ্দেশ্যে তিনি ধ্যানস্থ আছেন, কুতূহলাক্রান্ত শিষ্যদল উৎসুক চিত্তে চারিদিকে ঘেরিয়া

বসিয়া ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। ঋষি সহসা হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিয়া উঠিলেন, "বড়ই শুভ সংবাদ, অদ্য লঙ্কার রাবণ শূন্য আশ্রম হইতে জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল"। শিষ্যগণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল' এহেন দুঃখজনক দুঃসংবাদকে আপনি সুসংবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এমন হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন কেন? মহর্ষি বলিলেন—"এত দিনে জগতের বৈরী দুর্দ্দান্ত রাবণের সবংশে নিপাত যাইবার পথ হইল, আমি এই হেতুই এমন শোচনীয় দুর্ঘটনায়ও এইরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি" বলিতে বলিতেই ঋষির মুখমণ্ডলে বিষম একটা বিষাদের ছায়া পাত হইল। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল একি প্রভো, তবে আবার আপনাকে বিষন্ন দেখিতেছি কি জন্য? ঋষি বলিলেন—"নিতান্তই দুঃখও পরিতাপের বিষয় যে দুর্বৃত্ত রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। ব্রহ্মচারীর বিশুদ্ধ ভগবান বস্ত্রে, পুণ্যময় গৈরিকের গায়ে এই দুরাত্মা কর্ত্তৃক আজি যে বঞ্চনার দুরপনেয় কলঙ্কপাত ঘটিল, ইহার শেষ পরিণাম কোথায় গড়াইয়া, মানব সমাজে ভবিষ্যতে কি ভয়ানক এবং শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিয়াই আমার চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।" বস্তুতঃ রাবণ হইতেই জগতে প্রথম বঞ্চক ও ছদ্মবেশী ভণ্ড সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে কিনা এবং সেই রাবণেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ দ্বারা সাধুর ছদ্মবেশে পাপ প্রবৃত্তির এই কদর্য্য অনুষ্ঠান পদ্ধতি বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে কিনা কে বলিবে! কিন্তু যে

সূত্রে যে ভাবেই এই বিপরিণাম ঘটিয়া থাকুক না কেন, গুরুগিরি ব্যবসায়ের তরতর বাহী খরস্রোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সজ্জন মাত্রেরই চক্ষু স্থির হইবে ও মনঃ প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে গুরুগিরীর গুরুগণ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত! পাঠক হাল ফ্যাস-নের সন্ন্যাসী গুরুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ইহারা যে আদিম সন্ন্যাসীদিগের নূতন বাবুয়ানা সংস্করণ—অগ্রে তাহাদিগেরই কৃত্রিম সংস্করণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। এই আদিম সংস্করণের কৃত্রিম সন্ন্যাসীগণের মূর্ত্তি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ পশ্চিমদেশীয়। ইহাদের জটা, ভস্ম, কৌপীন, চিম্‌টা ইত্যাদি সন্ন্যাসীর উপকরণ সকলই আছে; তবে শিক্ষিত সমাজে ইহাদের বিশেষ কোন প্রতিপত্তি নাই। সাধারণ অশিক্ষিত ব' অল্প শিক্ষিত, বা স্ত্রীলোক অথবা বেশ্যা মহলেই ইহারা আসর জম্‌কাইয়া থাকে। কখন বা ধনবানের বাড়ীতে "জয় সীতারাম" "বম্‌বম্" বা "রামধূম" "গোপালধূম" বলিয়া প্রবেশ করে। ইহারা বড় পেটুক,—খাইবার জন্যই বিশেষ আকুল;—'ঘিউ' 'আটা' ইহাদের আরাধ্য বস্তু। তবে অনেক সময়ে ফাঁক পাইলে, লোকজন নিকটে না থাকিলে, হাতের কাছে ঘটিটা, বাটিটা ব: যাহা পায় তাহা লইয়াই চম্পট দেয়! ইহারা চাকর চাকরাণী মহলে ঔষধপত্র বিতরণ করে, হাত দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ বলে, বাজীকরণ কিম্বা বশীকরণের তাবিজ, মাদুলী বা গাছের শিকড় বিলায়, এবং এইভাবে কিছু উপার্জ্জন করিয়া, কোনরূপ বেগতিক দেখিলে কোন এক দিকে অলক্ষিতে সরিয়া পড়ে।

ইহাদের ফাকি ব্যবসায়ে ততটা অনিষ্ট করিতে পারে না ; কারণ ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সাধারণতঃ নীচশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে বিস্তৃত। তবে সময়ে যে দুই একটা বড় রকমের শিকার ইহাদের হাতে আসিয়া গড়াইয়া না পড়ে এমন নহে। তখন ইহারা বিলক্ষণরূপে তাহাদিগকে ঠকাইয়া কিছু হাত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসীদের ছোট একটু বাক্সের ভিতর ছোট একটী পুতুল বা ঘট থাকে ; "বালগোপাল" "সীতারাম" "অষ্টভূজা" বা "শনিঠাকুর" ইত্যাদি নাম দিয়া এই পুতুল বা ঘটের গায়ে সিন্দূর বা চন্দন মণ্ডিত করত তাহারা দ্বারে দ্বারে উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়! ঐ ঠাকুর বা বিগ্রহের ভোগের জন্যে সকলের নিকট হইতেই কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের কেহ কেহ আবার গভরমেণ্ট আদালত বা ফৌজদারী কাচারীর নিকট কম্বল আসনে দুই চারিটি সিকি, দুয়ানি পূর্ব্ব হইতেই নিজে ফেলিয়া রাখিয়া, অতি গম্ভীরভাবে শিবচক্ষু করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকে ; আর গড্ডলিকা লোক প্রবাহের মধ্য হইতে অনেকেই মঙ্গল আশায় বা মোকদ্দমা জিতিবার ভরসায় কেহ পয়সা, কেহ দুয়ানী কেহবা একটি সিকি প্রণামী স্বরূপ দিয়া যায়। আবার কেহবা একেবারে নির্ব্বাক না থাকিয়া অঙ্গুলীদ্বারা অতি গম্ভীরভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি ঈঙ্গিত করে এবং মাঝে মাঝে দুএকটা হুঙ্কার দেয়। আবার কেহ বা স্থানীয় গুপ্তচর সাহায্যে অনেকের খোঁজ খবর লইয়া, হাত দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ বলিবার খুব ঘটা প্রদর্শন করিয়া অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে বিলক্ষণ প্রণামী গ্রহন করেন।

এই ভস্মাবৃত, জটামণ্ডিত, পিঙ্গলনয়ন, চিমটাধারী আদিম সংস্করণের কৃত্রিমসন্ন্যাসী প্রভুদের কেহ কেহ মফঃস্বলে কোন মহকুমায়, যেখানে গবরমেণ্টের কাচারী আছে সেখানে একটু আশ্রমের মত নির্ম্মাণ করেন। কাচারী হইতে অনতিদূরেই এই আশ্রম স্থাপিত হয়। এই আশ্রমের কুটিরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবেশের দ্বার সংখ্যায় সাতটি থাকে। সন্নাসী ঠাকুর তাহার ব্যবসার জন্য বাহিরের দু চারিটা ধূর্ত্ত লোককে চেলারূপে নিযুক্ত করেন। ইহারা কাচারীতে, বা যে কোনস্থানেই লোকের জনতা হয়, সেই স্থানে যাইয়া এই সন্ন্যাসী প্রভুর অলৌকিক শক্তির কথা, ভূতভবিষ্যৎ নখদর্পনে দেখার কথা, নানারূপ রোগ আরোগ্যের অদ্ভুত ক্ষমতার কাহিনী, মোকদ্দমা জিতাইবার বিবরণ ইত্যাদি সকলের কাছে বলিয়া বেড়ায়; এবং ইহাও বলে যে, যদিও তাহারা সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, তথাপি যদি কাহারও ইচ্ছা হয়,—তবে তাহারা তাহাকে সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া যাইতে পারে। এই কথায় যে সাধারণের মন সন্ন্যাসী দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন, সন্ন্যাসীর নিকট নানা লোকে নানা উদ্দেশ্যে গমন করে, যদি তাহাদের কুটিরে প্রবেশ মাত্র, সন্ন্যাসী চক্ষু মুদিয়া তাঁহার যোগ বলে প্রস্ফুটিত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আগন্তুকের মনোগত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত না করিতে পারেন, তাহা হইলেত আর সাধারণের চোখে তাহার কোন অসাধারণ মহিমা থাকে না।—তাহার ব্যবসাই প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। সন্ন্যাসী এই হেতু এই নিম্ন-লিখিত কৌশল প্রয়োগ করেন, এবং ইহা দ্বারা তিনি দূর হইতেই

অলক্ষিতে চকিতে একটু দেখিয়া লইয়াই চক্ষু বুজিয়াও আগুন্তুকের মনের ভাব বলিতে সমর্থ হন। পাঠকের মনে আছে যে সন্ন্যাসীর কুটিরে সাতটি দ্বার থাকে, এক একটি দ্বার এক একটি উদ্দেশ্য জ্ঞাপক। পূর্ব্বেই চেলাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে যে অমুক শ্রেণীর মনের অভিপ্রায় যাহার, তাহাকে অমুক নির্দ্দিষ্ট দরোজা দিয়া প্রবেশ করাইবা। যেমন মোকদ্দমার বিষয় যাহার জানিবার অভিপ্রায় তাহাকে ৩নং দরোজা দিয়া প্রবেশ করাইবা। রোগের প্রতিকার কল্পে যে আসিবে তাহাকে ৫নং দরোজা দিয়া প্রবেশ করাইবা ইত্যাদি। আগন্তুকের মনের ভাব চেলারাত কথা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই জানিয়া লয়, এবং পক্ষান্তরে চেলারা যে দ্বার দিয়া চালাইয়া নেয়, আগন্তুকেরা স্বভাবতই সেই দ্বার দিয়াই প্রবেশ করে। সন্ন্যাসী প্রভুর অন্তর্য্যামিত্বের বা মনের কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই সকল বন্দোবস্তেরই ফল। চেলারা যখন বাহির হইতে এই সকল শিকার ধরিয়া আনিয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের লোকদিগকে কুটির মধ্যে প্রবেশ করায়, সন্ন্যাসী তখন দূর হইতেই অলক্ষিতে চকিত দৃষ্টিতে কে কোন্ দ্বার দিয়া কুটিরে প্রবেশ করিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন। আগন্তুক বা আগন্তুকগণ ঘরে ঢুকিবার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত, ধুনি সম্মুখে করিয়া সন্নাসী ধ্যানমগ্ন থাকেন, তৎপরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক অতি গম্ভীর স্বরে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া কোন সময় হিন্দিতে কোন সময়ে বা আধ হিন্দি আধ বাঙ্গালাতে বলেন, "মোকদ্দমার জন্য তুমি বড় অস্থির আছ" অথবা "রোগে

যন্ত্রণায় তুমি বড় কাতর আছ” ইত্যাদি। কথা শুনিয়া যিনি বা যাঁহারা গিয়াছেন, তাহারাত একেবারে অবাক ; সন্ন্যাসী কখনও তাহাদিগকে দেখেন নাই, কোন আলাপ করেন নাই, যে লোকেরা সঙ্গে করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া গিয়াছে, তাহারাও কোন কথা তাঁহাদের সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত বলে নাই— তথাপি কেমন করিয়া একটি কথা না বলিতেই, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাদের মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন, এই ভাবিয়াই তাঁহারা একেবারে বিস্ময়েও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে যাহা কিছু টাকা পয়সা থাকে, তাহাই প্রণামী স্বরূপ দিয়া সন্ন্যাসী প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসী অবশ্য নিজে প্রণামী কুড়াইয়া লন না, এবং মুখে বলেন “টাকা পয়সার হামার কি দরকার আছে” ইত্যাদি,—ওদিকে চেলাবৃন্দ শিক্ষামত অতি অবহেলার সহিত প্রণামী কুড়াইয়া যথাস্থানে উঠাইয়া রাখেন। সন্ন্যাসীও প্রণামী পাইয়া ছোট খাট একটি হিন্দি কথাতে খুব আশা ভরসা দিয়া দেন—মোকদ্দমা জয় হইবে বা রোগ সারিয়া উঠিবে বলিয়া দেন। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী প্রভুদের চেলারাও পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত প্রণামীর একটা অংশ পাইয়া থাকে। পাঠক এখন ভাবুন যে ইহারা কতদূর ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক। অশিক্ষিত লোকের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিত লোকেরও চক্ষে সময় সময়—ধাঁ ধাঁ লাগে, এবং ইহাদের প্রতারণায় বিপন্ন হন। এই সন্ন্যাসীরা আবার বোকা রকম গৃহস্থ লোক দেখিলে তামা কি রূপা স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করে ; এবং কোন কৌশলে বিশ্বাসযোগ্য দুই একটা বুজুরকি দেখায়।

বোকারা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার লোভে, বাড়ীর যাহা কিছু তামা রূপা আছে—তাহা ইহাদের হাতে আনিয়া সপিয়া দেয়! সন্ন্যাসী এই সকল তামা, রূপা হস্তগত হইলে কোন বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলিয়া উহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠায়, বা অন্য কোনরূপে সুবিধা না হইলে রাত্রিতে চম্পট দেয়। গৃহস্থও যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দুঃখে, লজ্জায়ও ক্ষোভে মাথা খুঁড়িতে থাকে। সময়ে ইহারা আবার কল্কীঅবতাররূপে কাহারও ঘরে আবির্ভূত হয়, এবং সেখানে ঈদৃশ কল্কীঅবতার যে সকল ভীষণ লোমহর্ষন কাণ্ডের অভিনয় করে, তাহা বোধ হয়—এদেশবাসী সকলেই বিক্রমপুর দয়াহাটার বিবরণেই অবগত আছেন। সুতরাং তাদৃশ লজ্জাজনক লোমহর্ষন ব্যাপারের পুনর্ব্বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করি। আবার এই শ্রেণীর কোন প্রভু হয়ত গাঁজায় দম দিয়া গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গভর্মেণ্ট প্রেরিত পুলিশ ফৌজের সঙ্গে দাঙ্গা করিয়া অকালে কয়েকটি শিষ্য সেবককে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করাইয়া এবং প্রভু ও স্বয়ং কয়েক মাস শ্রীঘর বাস করিয়া আসেন। এই সকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনা, অনুমান বা কল্পনার কথা নহে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে চির-পর্য্যটক এক জাতীয় লোক আছে, তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; কোন ধর্ম্ম বা নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নাই। তাহারা শীতকালে স্ত্রী-পুত্র কন্যা সহ দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুড়িয়া বেড়ায়। ঘোড়া, গাধা, ছাগলও ভেড়া প্রভৃতি পশুপালও তাহাদের

সঙ্গে থাকে; আর থাকে তাহাদের সঙ্গে গ্রাম্য পুলিশ, চৌকিদার বা কনষ্টেবল। কারণ তাহাদিগের সাধুবৃত্তির এমনই সুনাম যে তাঁহারা যখন যেখানে যায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের পিছনে পিছনে পুলিশ মোতাইয়েন রাখিতে বাধ্য হন।

বিড়াল, শৃগাল, শূকর ও গোসাপ প্রভৃতি তাহাদিগের উপাদেয় খাদ্য। ইদৃশ অখাদ্য খাদক বলিয়াই বোধ হয় বঙ্গদেশে তাহারা সচরাচর ম্লেচ্ছ বা 'ম্যাল্লেস' নামে অভিহিত হয়। এই "ম্যাল্লেসের" দল যখন যে গ্রামের নিকট আড্ডা করিয়া থাকে তখন সেই গ্রামেই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী ও বাল-সন্ন্যাসিগণ সমধিক সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই কদাচারী ম্যাল্লেসেরা ও অনেক সময় আদিম সন্ন্যাসীর সাজে, সাজিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক অর্থ শোষণ করিয়া থাকে।

পশ্চিমদেশীয় আদিম সাজের কৃত্রিম সন্ন্যাসী এবং এই ম্যাল্লেস জাতীয় সন্ন্যাসীদিগের দৌরাত্ম্যে, প্রকৃত উদাসীন, সার্থকনামা সন্ন্যাসী, যথার্থ ভগবন্নিষ্ঠ-ব্রহ্মচারী ও সংযতচিত্ত যতিগণ সর্ব্বতোভাবে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজন অরণ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। যদি তাদৃশ কোন মহাপুরুষ কখন কোন ঘটনাক্রমে লোকালয়ে পদার্পণ করেন, বুজুরকির সম্পর্কশূন্য সেই সরল প্রাণ সাধুকে লোকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হয় না; মেকির মিশ্রণে নিখুঁতও মেকি হইয়া যায়!

হাল ফ্যাশনের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীরূপে প্রথম আবির্ভাব সময়ে উল্লিখিত সংসার বিরাগী, বিজন অরণ্যবাসী, সিদ্ধ তাপসদিগের

অন্যতর অথবা তাঁহাদিগেরই কাহারও সিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রিয়তম শিষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক লোকালয়ে প্রকট হইয়া থাকেন। ইহাঁরা চতুর, লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ ও কৌশলী যাদুকর, এই হেতুই অনায়াসে অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, এবং সময় সময় সুশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ ভদ্রলোকদিগের চক্ষেও ধুলি দিয়া ইহাঁরা আপন দুরভিসন্ধি সাধনে সমর্থ হন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। সাধারণ বিলাসী বাবু ভোগ তৃষ্ণার পরিতর্পণার্থে সকামভাবে যাহা যাহা করেন, ইহাঁরাও নিষ্কাম-ভাবে ঠিক তাহাই করিয়া থাকেন! তবে গৈরিক বসন, রুদ্রাক্ষমালা দণ্ডকমণ্ডলু কিম্বা ত্রিশূল এসকল সাধারণ বাবুদের কোন ব্যবহারে আসে না। কিন্তু এই শ্রেণীর স্বামিজীদের নিকটে সন্ন্যাসের নিশান স্বরূপ উপরোক্ত বস্তুগুলি সর্ব্বদাই থাকে। ইহাঁরা আসর বুঝিয়া সাজও আশয় বুঝিয়া সুর ধরিতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত। সুতরাং অবস্থা বিবেচনায় সময়ে ঐ সকল চিহ্ন ধারণও উহার ব্যবহার করেন। যাহারা একটু নিম্নস্তরের মুটে মজুর শ্রেণীর লোক, বা বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক বা বিশুদ্ধ আচার সম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ সেকেলে ধরণের গোড়াহিন্দু, তাহাদের নিকট প্রকট হইবার পূর্ব্বেই সাধারণতঃ গৈরিক বসনের ধ্বজা উড়াইয়া রুদ্রাক্ষমালা, ও ত্রিশূলের কিছু ঘটা প্রদর্শন হইয়া থাকে, যেন তাঁহাদের ভক্তিস্রোত স্বামিজীর প্রতি তর তর বেগে প্রবাহিত হইতে পারে; কারণ লঙ্কার রাবণ গৈরিকের গায়ে কপটতার কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকিলেও সাধারণের চক্ষে এদেশে এসকল চিহ্নের মহিমা

একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যদি কোন সুচতুর লোক ইহাদিগকে কঠোর যতিব্রত উপেক্ষা করিয়া এইরূপ ভোগ বিলাসাত্মক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে অমনি ইহাঁরা গম্ভীরভাব ধারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব-কথার অবতারণা করেন, এবং বলেন যে তাঁহারা প্রেমভক্তি ও স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করিয়া অস্টপাশ বিমুক্ত হইয়াছেন! তাঁহারা নিষ্কামভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, ও করিতেছেন, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। যদি কেহ স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনি কেন লোকের স্কন্ধে বাহিত হইয়া যান, অথবা ত্যাগ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া স্বয়ং এমন ফুলবাবুর হালে থাকিয়া ঘি, দুধ ও ফজলা আমের শ্রাদ্ধ করেন কেন? কেন ই না বা নিজে কঠোর যতিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণের আদর্শ হইয়া সাধারণকে ত্যাগ ধর্ম্মের পথে চালিত করেন? অমনি স্বামিজী উত্তর করিবেন, যে লোকেরা বাধা দিলে শোনে না, কাজেই আমাকে কাঁধে করিয়া বহন করিলে বা ঘি, দুধ খাওয়াইলে তাহারা যদি সুখী হয়, আমাকে তাহাদের প্রীত্যর্থে এই সকল করিতে হয়। বিশেষতঃ আমি এই সকল নিষ্কামভাবে করি। যদি বাস্তবিকই এই সকল কাজ স্বামিজী নিষ্কামভাবে লোকের প্রীত্যর্থে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বামিজীকে দুই দিন না খাওয়াইয়া রাখিলে, বা তাঁহার কাঁধে কেউ চড়িলে, তাহাও তাহার লোক প্রীত্যর্থে নিষ্কামভাবে সহ্য করিয়া লওয়া উচিত হয়না কি? কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব। ভোগের কিছু বৈলক্ষন্য ঘটিলে, সেবার কিম্বা প্রনামীর কিছু

ইতর বিশেষ দেখিলে স্বামিজী দুর্ব্বাসার ন্যায় গর্জিয়া উঠিবেন, এবং অন্য কোন প্রকার বেগতিক দেখিলে, ত্রাহিমাং মধুসুদন বলিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা পাইবেন। এই শ্রেণীর ভোগ বিলাস ও ষড়রিপু লাঞ্ছিত হাল ফ্যাসনের স্বামিজী বা পরম হংস দেব যদি অষ্টপাশ মুক্ত নির্লিপ্ত যোগীরা ত্যাগ ও নিষ্কামতার মূর্ত্তিস্বরূপ সমাজের আদর্শ ও পূজ্য হয়, তাহা হইলে বেশ্যাকেও সমাজে সতীর আদর্শ বলিয়া দাঁড়া করাইলে অসঙ্গত হইবেনা! প্রেমভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য দেবের পরে বঙ্গদেশে যেমন অসংখ্য বৈষ্ণব বাবাজী মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তেমনই মহাত্মা রামকৃষ্ণপরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের পরে বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর বিলাসী সন্ন্যাসী গুরুগণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। পঞ্চ "ম" কারের ইহাঁরা কিছুই ভোগ করিতে ছাড়েনা, তবে বলেন তাহারা নাকি সমস্তই নিষ্কাম ভাবে শোধন পূর্ব্বক ভোগ করেন।

প্রথম কথা ইহাদিগের স্বামিজী নাম কে দিল, কোথা হইতে আসিল? ইহা অবশ্যই কৌলিক উপাধি নহে। বিবাহ করিলেই লোকে স্বামীনামের অধিকারী হয়, কিন্তু তাহাতে "জি" শব্দের সংযোগ থাকেনা। স্ত্রী যদি, প্রসিদ্ধনামা স্বর্গগত বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত নায়িকা বিশেষের মত সুরসিকা, এবং স্বামীর সহিত ইয়ারকির ভাবে কথোপকথন করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি আদর করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে স্বামীকে স্বামিজী বলিয়া প্রনাম করিতে পারেন। উল্লিখিত সন্ন্যাসী গুরুদিগের মধ্যে কাহার স্বামিজী নাম এইরূপে স্ত্রীপ্রদত্ত, কাহার বা গুরুদত্ত

অথবা স্বয়ং গৃহীত, সাধারণ লোকে অবশ্যই তাহা জানেনা। এইশ্রেণীর স্বামিজী অথবা পরমহংসদের নামের পিছে প্রায়ই আনন্দ থাকে কাহার ও নাম "গম্ভীরানন্দ" কাহারও নাম "বাগীশানন্দ" কাহারও নাম "ভবানন্দ" বা উৎকটানন্দ ইত্যাদি। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আনন্দমঠ প্রকাশের পরে বঙ্গে এতাদৃশ আনন্দের বড়ই অভ্যুদয় ঘটীয়াছে। যদি ইহারা "গম্ভীরানন্দ" বা "বাগীশানন্দ" ইত্যাদি নাম না রাখিয়া "মৎসানন্দ" "মাংসানন্দ" অথবা "অর্থানন্দ" নামে অভিহিত হইতেন, তাহা হইলে এই সকল নাম অন্বর্থক বিশেষণরূপে যেমন ইহাঁদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে পারিত; তেমন নামের পিছনে আনন্দযোজনার সখ্‌টা সম্যকরূপে মিটিয়া যাইত। সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক, যে সকল স্বামিজী ও সকল আনন্দই শূন্যগর্ভ শব্দাড়ম্বর নহে। স্বামিজী ও আনন্দ প্রবাহের মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রকৃত পরমহংসস্বামী ও যথার্থ তপনিষ্ঠ মহাযোগীর সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা বিজ্ঞাপন ছড়াইতে ছড়াইতে ভ্রমন করেননা, তাঁহাদের এত ফিকির ফন্দি বা তদ্বির নাই। তাহারা লোকালয়ে নানাস্থানে শিষ্য সেবক সংগ্রহ করেননা, বা চাবাগানের কুলী সংগ্রহকারী আড়কাঠির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াননা। ফলতঃ তাহাদের দর্শন লাভ একান্ত দুর্ল্লভ। ভগবৎ কৃপায় দৈব সাহায্যে তাহাদের কাহারও দর্শন মিলে। তাহারা লোকালয়ে প্রায় দেখা দেননা, তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, সংসারীলোকের সংস্পর্শে আসা তাঁহাদের একেবারেই মত বিরুদ্ধ। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইতে হয় তাহারা কাহাকেও খুঁজিয়া বেড়ান না। গুরু-

গিরি ব্যবসায়ের অধিকাংশ সন্ন্যাসী গুরুরই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহন যেভাবে ঘটিয়া থাকে, এক্ষণ সংক্ষেপে তাহারই আভাষ প্রদান করা যাইতেছে। ইহাঁদিগের গোড়া ঘরের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে বাড়ীতে অন্ন সংস্থান না থাকাই অনেক স্থলে ইহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের এক মাত্র কারন। ইহারা প্রায়শঃই দুরবস্থার তাড়নায় পৈতৃকভদ্রাসন বা জীর্ণকুটির পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং অনাহারে অনিদ্রায় পথ শ্রান্তিতে রজক ও ক্ষৌরকার অভাবে, বিনা যত্নে অল্পকাল মধ্যেই আপনা আপনি সর্ব্ব বাহ্য লক্ষনাক্রান্ত সন্ন্যাসী মুর্ত্তি ধাবন করে, এবং পেটের জ্বালায় ঐ শ্রেণীরই কোন senior সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া তাহারা ধুনি জ্বালাইবার কাষ্ঠসংগ্রহ করতঃ কিঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থান করিয়া লয় এবং তথায় গাঁজা টিপিবার, গাঁজায় দম দিবার ও সিদ্ধি ঘুটিবার রীতিমত তালিম লইতে থাকে। তৈলাভাবে চুল দীর্ঘ জটাকারে পরিনত হওয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া দুই চারিটা বুজুরকি ও টোট্‌কা ঔষধ শিখিয়া লয়; তৎপরে একটা বড় চিম্‌টার যোগাড় হইলে গায়ে ভস্মমাখিয়া লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পাঠশালার বিদ্যা যাহা আছে তদ্দারা দুই চারিটা শ্লোক মুখস্ত করিয়া পরমহংস বা স্বামিজী সাজিয়া বসে। ইহারা কথায় কথায়ই 'নিষ্কামধর্ম্ম' 'ত্যাগ স্বীকার' 'গীতা' 'প্রেমভক্তি' ইত্যাদি দুই চারিটা উচুদরের কথা বলিতে অভ্যাস করিয়া লয়। এবং কাহাকেও বা জটাজুট মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত বপুর মহিমায় মুগ্ধ করিয়া, কাহাকেও বা টোট্‌কা ঔষধ দ্বারা বুজুরকি দেখাইয়া, কাহাকেও বা মুখে মুখে নিষ্কামধর্ম্ম ও প্রেমভক্তির উর্দার তত্ত্ব

শুনাইয়া ভক্তবানাইয়া লইতে প্রয়াস পর হয়। ইহারা ঐরূপ "আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়" ভাবে কিছু দিন ভ্রাম্যমান থাকিয়া আশ্রম নির্ম্মানের জন্য সরল বিশ্বাসী নিরীহ প্রকৃতি বোকারকমের কোন ভাগ্যবানের স্কন্ধে আপতিত হইবার সুযোগ অন্বেষন করিয়া বেড়ায়।

ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্তের লীলাক্ষেত্র। ভক্তি ও প্রেম এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয়না। দেশস্থ কি বড় কি ছোট কি মধ্যম যে কোন শ্রেণীর লোকই হউক না কেন ভক্তি ও প্রেমের স্বাভাবিক মন্দাকিনী ধারা সকলের প্রাণেই ন্যূনাধিকরূপে স্বতঃপরিস্ফুরিত। ঈদৃশধর্ম্ম পিপাসু দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মের ব্যবসা করা যত সহজ, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তত নহে। জটাজুট মণ্ডিত, বিভূতি ভূষিত অথবা গৈরিক বসনে সজ্জিত হইয়া কিম্বা ফোঁটা তিলক ইত্যাদি দ্বারা মুখমণ্ডল চিত্র বিচিত্র করিয়া, তুলসী বনের ব্যাঘ্রের ন্যায় ধর্ম্মের নামে ভূতাবিষ্ট মেষপাল সদৃশ নরনারী মধ্যে আপতিত হইয়া ইহারা অনায়াসে ষোড়শোপচারে ভোগ বিলাসের সুবিধা করিয়া লয়। সমাজে আর সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট লোকই আছে কিন্তু সাধারণ দুষ্ট বা আততায়ী দ্বারা সমাজের বা দেশের যে অনিষ্ট না হয়, সাধুবেশ-ধারি অসাধু দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ আততায়ী দুষ্টলোকদিগের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোক স্বভাবতই প্রস্তুত থাকে; কিন্তু ইহাদের খর্পরে ভ্রমক্রমে সাধ করিয়া পতিত হয়; নিজের ঘরের নিভৃত দ্বার আপনি আগ্রহ করিয়া খুলিয়া দেয়। যদি কোন

অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইহারা কোন ক্রমে কুহকে মুগ্ধ করিয়া একবার ভক্ত বা শিষ্য বানাইয়া লইতে পারে, তখনই তাঁহার দ্বারা আশ্রম নির্ম্মানের বন্দোবস্ত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য ঘরের গৃহিনীর সাধারণতঃ গৃহস্ত পুরুষ অপেক্ষা ভক্তির দৌড় বেশী। অনেক স্থলে আবার এমনও হয় যে, এই শ্রেণীর ভক্ত নিজের বাড়ী ঘর সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে প্রভুর সহিত সস্ত্রীক আশ্রমে চলিয়া যান, এবং তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় লব্ধ অর্থ আশ্রমের সেবায় অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রভুরই সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন। আমাদের দেশীয় রমনীগণ কিরূপ প্রেম ভক্তিপরায়না তাহা সকলেই জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিচারহীন অন্ধবিশ্বাসের পরিমাণ ও অসীম। জেলখানার ভয়ঙ্কর একটা দাগিচোর অথবা লম্পটকে যদি গেরুয়া বসন পড়াইয়া চিমটা হস্তে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়া করান যায়, তাহা হইলে তাহারা ভূমিলুণ্ঠ্যমানা হইয়া প্রনাম করিতে এবং তাহাকে যথেস্ট ভুজ্য দ্রব্যে পরিতুস্ট করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিবেন না। তাঁহারা এবিষয়ে অনেকটা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত "ক" দেখিলেই কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন।

আশ্রম স্থাপনের পরেই শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে। এই শিষ্য ও ভক্তসংগ্রহ পুরুষ মহল অপেক্ষা উপরোক্ত কারণে স্ত্রীমহলে অনেক সহজে হয়। যাঁহারা অবস্থাপন্ন ভক্ত বা শিষ্য তাঁহারা অর্থদ্বারা স্বামিজীর আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করেন আর যাঁহারা তাহা নহেন তাঁহাদের দ্বারা স্বামিজী জলটানা, বাসনমাজা, ঘর ঝাট

দেওয়া, তামাক, গাঁজা ও ভাঙ্গসাজা, পাটেপা তৈল দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য, মাহিআনার চাকর অপেক্ষাও অত্যধিক পরিমানে করাইয়া লন। সন্ন্যাসী গুরুদয়া করিয়া এইরূপ সেবা-ব্রতে অধিকার প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের পরকালের কাজ করাইয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করাইয়া দিতেছেন, তাহারা এই অন্ধবিশ্বাসে বিনা পারিশ্রমিকেও পরিতৃপ্ত থাকে। পাটেপা তৈল দেওয়া বাতাস করা ইত্যাদি কার্য্য প্রায়শঃ প্রেমভক্তিময়ী স্ত্রীলোক দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্বামিজীরা চন্দন ও বিষ্ঠা সমজ্ঞান করেন বলিয়া মুখে প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চন্দনের পরিবর্ত্তে ইহাঁদিগকে কোন সময় গায়ে বিষ্ঠা মাখিতে দেখা যায়না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং কিছু শিষ্য সেবক সংগৃহীত হইবারপর ইহাঁদের নিষ্কাম ভোগবিলাসের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সন্ন্যাসী গুরু এই অবস্থায় পঁহুচিলে, যদি কেহ সন্ন্যাসী বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেণ অর্থাৎ গেরুয়া বসন পরিহিত, জটাজুট বিভূতি মণ্ডিত যতিব্রত তাপসের কঠোর আত্মত্যাগ ও কঠোর শরীর নিগ্রহ, অহোরাত্র ভগবৎ ধ্যানের অনাবিল অনুষ্ঠান এবং সাধুর ধ্যান স্তিমিত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত ইহাঁর সমীপ বর্ত্তীহন, তাহা হইলে তিনি অতি মাত্র বিস্মিত ও শেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন। তখন তিনি দেখিবেন, সুগন্ধিতৈলে স্বামিজীর রুক্ষজটা মণ্ডিত কেশদাম কাল মসৃন ও চিক্কন হইয়াছে, এবং কবিজন বাঞ্ছিত লম্বিত কোকরান কেশগুচ্ছে পরিনত হইয়া

পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান রহিয়াছে। পরিধানে গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে ঢাকাই চিকণ কাপড়, নগ্ন পদের স্থলে পায়ে "ডসনের পামসু" গায়ে গরমের দিনে সিল্কের চাদর, কখনও বা সিল্কের পাঞ্জাবী কোট, শীতের দিনে "সার্জের কোট" মোজা, এবং সাহেব বাড়ীর ভাল পশমী গেঞ্জির বাহার।

ধুনির পরিবর্ত্তে এখন গায় শাল বনাত। দেহে ভস্মমাখিবার পরিবর্ত্তে রমনীর কোমল করে শরীর ও মস্তকে দুই ঘণ্টা ব্যাপী তৈল মর্দ্দন ও পাদ সংবাহন ইত্যাদি। ইহাঁরা এতদূর নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত যে, স্নানের পর ইহাঁদিগের শরীর পুছিয়া দিতে ও কেশদাম গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত করিয়া দিতে হয় অন্যের! ইহাঁর পরে আহার! ইহাঁদের আহার্য্যের আড়ম্বরের কথা স্বয়ং না দেখিলে, বলিয়া বা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব সেক্ষপীরের ভাষায় বলিতে গেলে। "It beggers all description" ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলির অর্থদ্বারা যতদূর সম্ভব মৎস, মাংস, পলান্ন, মিষ্টান্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ফলমূল এসকলই নিয়মিত রূপে দুইবেলা স্বামিজীর ভোগে লাগিয়া থাকে। এতদ্ ব্যতিরেকে 'জলখাবার" বন্দোবস্ত ও যথা সাধ্য রূপে হইয়া থাকে। এক কথায় সকল উৎকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর সারও অগ্রভাগ স্বামিজীর সর্ব্বাগ্রে ভোজ্য। শিষ্য মণ্ডলীরা, স্বামিজীর উপদেশ ও শিক্ষা মতে সকলকে বুঝায়, যে ইহাত এইরূপেস্বামিজী খাইতেছেন না, সাক্ষাৎ ভগবান আহার করিতেছেন। কৃশ তনু ক্রমশঃ নধর কান্তি ধারণ করিতে থাকে। সাধারণ লোকেরা যে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা মানিয়া চলেন, এই স্বামিজীরা তাহাতে ও রাজি নন; চর্ব্বা, চোষ্য, লেহ্য, পেয়

দৈনিকই চাই, কারণ তাহারা অষ্টপাশ মুক্ত নিষ্কাম সাধু। ইহাদের শয্যা বরকন্যার বিবাহের ফুল শয্যা হইতে বিলাসিতার অংশে কোন ক্রমেও নিকৃষ্ট নহে। কোলবালিশ, পাশবালিশ, তাকিয়ার ঘটা যথেষ্ট আছে। সেবাদাসীরা রাত্রিতে ও দিনে নিদ্রা আসিবার পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত পদসেবা, গাত্রসেবা, ও গরমের দিনে বাতাস করা ইত্যাদি সকল কার্য্যই নিষ্কাম ভাবে ভক্তির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই স্বামিজীরা সাধারনতঃ ব্রাহ্ম মূহুর্ত্ত বা প্রত্যুষের মুখ দেখিতে পান না। বেলা ৯নয়টার পূর্ব্বে অনেকেই শয্যাত্যাগ করিতে অসমর্থ হন। শিষ্যেরা বলেন, রাত্রিতে নাকি বহুক্ষণ ব্যাপী প্রগাঢ় যোগ সাধনা হইয়া থাকে, সেই জন্যই স্বামিজী এত বেলায় শয্যাত্যাগ করেণ। নাটকে, আলিবাবা বলিয়া ছিল, "টাকাহয়ে অবধি আর ভোরের মুখ দেখ্‌তে পাইনা,, সেইরূপ শিষ্যসেবক সংগ্রহ হওয়ার পরে ইহাঁদের ও আর ভোরের মুখ দেখা হয়না।

ইহাঁদের মসল্লার তামাক ও আলবোলার ঘটা নবাবি আমলের কথা স্বরণ করাইয়া দেয় এবং গাঁজা সাজিবার ও সিদ্ধি ঘুটিবার রীতিমত বন্দো বস্তের পারিপাট্য ও তোয়াজি কায়দা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাঁদের দমে গাঁজার কল্কি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইলে অনুগত ভক্ত মণ্ডলী গুরুজীর সাধনার দৌড় দেখিয়া ভক্তিতে আত্মহারা ও অভিভূত হইয়া পড়ে। গাঁজায় দম দিয়া, পেচকের ন্যায় চক্ষু গোল করিয়া যখন এক দৃষ্টিতে ইহাঁরা গম্ভীরভাবে বসেন, তখন ভক্ত মণ্ডলী মনে করেন যে, স্বামিজীর সমাধিস্ত হইবার বুঝি আর বেশী

বিলম্ব নাই। ইহাঁরা আবার মাঝে মাঝে সমাধিস্ত হওয়ার ও অভিনয় করেণ, এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা গাঁজায় অত্যধিক পরিমানে দম দিয়া, মুখ চোখ লাল করিয়া, কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসেন! ভক্তমণ্ডলী সাক্ষাৎ ভগবান দেখিতেছেন বলিয়া আনন্দে গদ্ গদ্ হইয়া স্বামিজীর পায়ে লুটাইতে প্রবৃত্ত হয়, সকলে তখন তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকে, এবং ভোগের জন্য রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। স্বামিজী কতক্ষণ পরে সাক্ষাৎ ভগবান পদ হইতে, অসাক্ষাৎ ভগবান পদবিতে নামেন। এই অভিনয়ে স্বামিজী, এবং তাহার প্রধান শিষ্যেরা হাসিয়া কঁদিয়া যথেষ্ট নটলীলা নৈপুন্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। এখন সকলেরই মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে, একটা ভণ্ড, অশিক্ষিত, খল প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া লোক সমাজে আসিয়া এমন আরামের ও ফাঁকি সিদ্ধান্তের ব্যবসা খুলিয়া লয়। সে গুঢ় রহস্য পাঠক সম্ভবতঃ এখনও পরিষ্কার এবং সন্তোষ জনক রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন আমি কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। সকলেই জানেন, যে সন্ন্যাসী নামের ও সন্ন্যাসীর পোষাকের একটা যাদুকরী শক্তি পুর্ব্বকাল হইতেই ভারতবাসী নর নারীর মনে বিশেষরূপে ক্রিয়ান্বিত আছে ;—কালস্রোতে ইহা সংস্কার বদ্ধমানসিক বৃত্তিরূপে পরিনত হইয়াছে। এই কারনেই রাম মহিষী সীতা অতি সহজেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সজ্জিত দুরাত্মা রাবনের সম্মুখে নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা পূর্ণ প্রাণে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এই গেল এক কথা। ইহার পরে সকলেই যে ধর্ম্ম পিপাসার

বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের নিকট গমন করেন তাহা ও নহে,— সেরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প লোকই যাইয়া থাকে। অধিকাংশ লোকই প্রথমে রোগের ঔষধের নিমিত্ত, বৈষয়িক উন্নতির জন্য দৈব উৎপাত নিবারণ হেতু, মোকদ্দমা জয়লাভের উদ্দেশ্যে, মূনিব, হাকিম, বা স্ত্রীবশী করনের অভি সন্ধিতে অথবা কোষ্ঠির কোন ও ফাঁড়া কাটাইবার জন্য ইহাঁদিগের উপাসনার্থে গমন করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামী বশী করণের নিমিত্ত বা পুত্র লাভার্থে ও ছেলে মেয়ের পীড়া উপসম জন্য এবং স্কুলের ছেলেরাও পরীক্ষায় পাশ হইবার কামনায় সময় সময় ইঁহাদের শরণাপন্ন হন। স্বামিজীর কৃপায় সকলই হইতে পারে এইরূপ সুখ্যাতি শিষ্যগণকর্ত্তৃক লোকসমাজে প্রচারিত হয়। ক্রমে আশ্রমটিও কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শিষ্যও ভক্তবৃন্দ প্রসাদের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়া থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলির জন্য সাধারণতঃ নীচ শ্রেণীর অশিক্ষিত বৈষয়িক গৃহস্থলোক, বালক এবং স্ত্রীলোকদিগেরই বেশী সমাগম হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া আধ্যাত্মিকউন্নতি অভিলাষী অথচ লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ, অল্পবয়সের দরুণ এখনও অপরিপক্ক, সমাজের শিক্ষিত লোকও ছাত্রবৃন্দ কেন এ দিকে আকৃষ্ট হয় তাহারও প্রকৃষ্ট কারণ আছে। স্বামিজীরা হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বহুবৎসর এক অলোক সাধারণ যোগী পুরুষের নিকট যোগ অভ্যাস পূর্ব্বক, বহুবৎসরব্যাপী যোগ সাধনাদ্বারা অষ্টসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী জনসমাজে ইহা নানা কৌশলে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং

শিক্ষিত লোকও অবস্থা বিশেষে বা প্রচার মহিমায় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। এখন আমাদিগের সমাজের অনেক ছেলেরা থিওসফি, যোগ সাধন, বিভূতি সাধন, হিপ্‌নটিজম Clair voyance, astral body কি এমনই আরও কতকগুলি কথা আবছায়ার মত আধ আধ শুনিয়া অভিনব উৎসাহে ও আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন।

এই সময় হঠাৎ সিদ্ধপুরুষের আগমন বা আবির্ভাব হইলেই তখন যোগবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া অষ্টসিদ্ধি ও নানারূপ অদ্ভুত দৈবক্ষমতা লাভ করিবার প্রত্যাশায় ইহারা দলে দলে স্বামিজীর আশ্রম অভিমুখে ধাবিত হয়। যাদুমন্ত্রে অভিজ্ঞ-চতুর স্বামিজীও চারে মাছ আসিয়াছে, এবং টোপ গিলিবার উপক্রম করিতেছে জানিয়া মাছ গাঁথিয়া ডাঙ্গায় উঠাইবার যতরূপ কল-কৌশল অবগত আছেন, তাহা প্রয়োগ করিতে থাকেন। ইহারা সেখানে যাইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিস্ময় শুনিতে পায়, যে স্বামিজীনাকি শরীর হইতে সূক্ষ্মদেহ Astralbody বাহির করিয়া হিমালয়ের যোগীপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎকার করেন; আবার তাঁহারাও নাকি সূক্ষ্মদেহে এইখানে আসেন এবং পর-লোকগত আত্মাদের সহিত ও নাকি সময় সময় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অদ্ভুত দৈবক্ষমতা লাভ করিতে কাহার না প্রাণে চায়? এবং স্বামিজী এই সকলই জানেন, তাঁহার ভক্ত অথবা শিষ্য হইলে এই সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় শিক্ষিত যুবকেরা সহজেই স্বামিজীর কুহকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তবে

সকলেই যে মুগ্ধ হয় তাহা নহে, এবং স্বামিজীও মনে করেন যে বিনা পরিশ্রমে জালে মাছ পড়িয়াছে, যে কয়টা ডাঙ্গায় উঠাইতে পারা যায় তাহাই লাভ।

প্রবীণদের মধ্যে অনেকে আবার নিজকে একটা উচুদরের ভক্ত-প্রেমিক বলিয়া নিজকে বিজ্ঞাপিত করিতে স্বামিজীর নিকট গমন করিয়া থাকেন ও কথায় কথায় তত্ত্বকথার অবতারনা করিয়া আপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে প্রায়াস পান। তথা-কার সমবেত ভক্ত, ও শিষ্যমণ্ডলী ও জনসাধারণ তাহার তত্ত্ব কথার আলোচনায় তাঁহাকে পণ্ডিত ও ভক্তপ্রেমিক জ্ঞানে তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিলেই তিনি তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

স্বামিজীদের মধ্যে অনেকে আবার পুস্তক প্রণয়ণ করেন। তাহাতে আবার নানাপ্রকার যোগ সাধনের কথা থাকে। ইহা দেখিয়া যুবকবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই অর্দ্ধক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; ক্রমে স্বামিজীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি পোষণ করিতে আরম্ভ করে। নির্ব্বোধেরা ইহা বোঝেনা, যে তাঁহার পুস্তক আগাগোড়া আমাদের পূরাতন তন্ত্র শাস্ত্রের আক্ষরিক নকল বা প্রতি লিপি ইহার মধ্যে স্বামিজীর নিজস্ব কিছুই থাকে না। ইহা সর্ব্বতো-ভাবেই আমাদের দেশের পুরাতন লিপিবদ্ধ করা কথা। ইহারা সংস্কৃত শ্লোক বুঝিতে পারেন এমন বিদ্যা ইঁহাদের প্রায় কাহারই নাই;—অনুবাদের সংঙ্কলন দ্বারা পুস্তক প্রকাশ করিয়া, নিজের যোগ সিদ্ধির বিজ্ঞাপণ প্রচারই ইঁহাদের উদ্দেশ্য।

আবার এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে স্বামিজী ধর্ম্মকথার সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা জয়ের, মনিব বা হাকিম বশের, স্ত্রী বশীকরনের, নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ করেন। এমন কি ইহাতে বাজী করণ ঔষধের ও দুই একটা ফর্দ্দ থাকে। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর মুষ্টি-যোগ মহাত্মা রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের বা বিবেকানন্দের বা অন্য কোন প্রকৃত সাধুর গ্রন্থেই দেখা যায় না। মোটকথা পুস্তক-গুলি ভোগ বিলাসী সাংসারিক লোকের সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধি সাধন করিবার কলকৌশল ও মন্ত্রেতন্ত্রে পূর্ণ থাকে। ইহাদ্বারা স্বামিজীর বিজ্ঞাপণের কার্য্য হয়—পুস্তক পড়িয়াই নানারূপ দৈবক্ষমতা লাভ হয়, এমন সহজ লভ্য প্রলোভনে মানুষ সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া থাকে—ফলে স্বামিজীর আশ্রমে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। হায়রে, হায় এসকল বুজুরকি আমাদের দেশেই খাটে বটে! যোগ সাধন সম্বন্ধে ইহাঁরা কেন, বর্ত্তমান সময়ে হাতে হাতে বিশেষ কিছু করিয়া দেখাইতে পারেন, এইরূপ লোক আমাদের লোক সমাজে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ইহাঁরা যোগ সিদ্ধির নাম করিয়া মূর্খদের নিকট দুই একটা বুজুরকি বা ভেল্কাবাজি বা সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism) নিম্নস্তরের দুই একটি ক্রিয়া দেখায়, আর মূর্খেরা সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পাইয়াছি বলিয়া ভাবভরে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যাঁহাদের কাছে বুজুরকি খাটিবেনা, তাঁহাদের নিকট স্বামিজীরা প্রেমভক্তির অবতার হন, যোগসিদ্ধির কথা মুখে আনেন না। তখন "নিষ্কাকধর্ম্ম," "প্রেমভক্তি" ইত্যাদি দুই চারিটা বাঁধিগৎ

আওড়াইতে থাকেন, এবং ভাবের বা অভিসন্ধির অশ্রুধারা দুনয়নে দর দর ধারায় ঢালিয়া দেন, এবং এই শ্রেণীর দুই একটা বাঁধি বোল চাল চালাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পর হন। আজ কাল বেশ্যারাও যেমন বাল্যশিক্ষা, বোধদয় বা A, B, C, D পরিয়া বা দুচার দিন নাটকে যাইয়া নাটুকে ঢং শিখিয়া পেন্‌সিল্ কাগজ লইয়া উর্দ্ধদিকে নীলাকাশের প্রতি-ভাবাবিষ্ট নেত্রে তাকাইয়া কবিতা লিখিবার ভঙ্গি করিয়া স্কুলের ছেলেদের মাথা খাওয়ার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, ইংরেজিতে দু-একটা কথা বলিয়া, নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়া ছেলেদের চক্ষে Sappo বা তরু দত্তরূপে উদ্ভাসিত হইবার, প্রয়াস পাইতেছে, সাজ সজ্জার ও পুরাতন চাল না রাখিয়া হালফ্যাসনের উপযোগী পিছনের কাপড় ফুলাইয়া পড়িয়া লেডি-ডাক্তারদের পোষাকের অনুকরণ পূর্ব্বক চোখে চস্‌মা দিয়া, বাজারে প্রতিপত্তি বাড়াইতেছে, তেমন এই সকল মহা-প্রভুরাও সময়োচিত বেশভূষা ও আসর বুঝিয়া গান ধরিবার উৎকৃষ্ট কৌশল অভ্যাস করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন।

যে সকল স্ত্রীলোক ভক্তির অতিশয্যে একেবারে আশ্রমবাসিনী হন, তাঁহারা কখনও ভৈরবী কখনও যোগিনী কখনও বা বৈষ্ণবী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। তাহাদের কর্ত্তব্য হয় আশ্রমের সর্ব্বসাধারণের পাককরা, গুরুজীর গা হাত পা টেপা, তৈল দেওয়া বাতাস করা ইত্যাদি। যাঁহারা ইহার মধ্যে সমধিক ভক্তিমতি হন, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর ভৈরবী বা যোগিনী হইতে পারেন, এবং স্বামিজীর সহিত রাত্রিতে এক ঘরে অর্গল

বদ্ধ করতঃ অবস্থিত হইয়া সেবা শুশ্রুষা অন্তে অন্য বিছানায় নিদ্রা যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। স্বামিজীর ভক্তদের নিকট এই শ্রেণীর ভৈরবীদের সম্মান ও কম নহে। তাঁহারাও ক্রমে সকলের প্রণম্যা হইয়া উঠেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর ভৈরবী বা যোগিনী প্রথমে নিজের বিবাহিত স্বামীর সঙ্গেই আশ্রমে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। তমোভাবাপন্ন বৃদ্ধ স্বামী যখন তাঁহার স্ত্রীর প্রেমভক্তির আধিক্য হেতু ক্রমশঃ তাহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া উঠেন এবং সময় থাকিতে পুনর্ব্বার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী ফিরিতে চাহেন, তখন বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, নবীন স্বামিজীর প্রেম ভক্তির ডোর কাটিয়া ভৈরবী সেই পক্কশশ্রু শ্লথদন্ত বৃদ্ধ পতির সঙ্গে কিছুতেই যাইতে রাজী হয়না। বৃদ্ধ ও নিরাশায় ক্ষিপ্তের ন্যায় স্ত্রীকে ঘরে নিয়া যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। তখন স্বামিজী টাকা পয়সা দিয়া, নানারূপ ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া বৃদ্ধ অসহায় ভক্তের দুর্ব্বল হস্ত হইতে নাদাবী পত্র লিখাইয়া ভৈরবীকে চিরকালের তরে আশ্রমের সম্পত্তি স্বরূপ করিয়া রাখেন। বৃদ্ধ স্বামী রম্ভা মুখে দিয়া তাঁহার এত ভক্তি ও বিশ্বাসের ফল হাতে হাতে পাইয়া সজল নেত্রে ও হতাশ প্রাণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন—ভৈরবী ও হাঁপ ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করেন। অনেক মহিলা তাহাদের বাড়ী হইতে টাকা পয়সা আনিয়া আশ্রমের কাজে লাগাইয়া দেন তাঁহাদের গহনাপত্র অনেক সময় আশ্রমের ধনভাণ্ডারে চিরকালের জন্য স্থান প্রাপ্তহয়। অনেকে আবার মৃতস্বামীর বা পিতৃকুলের ভূসম্পত্তি পাইলে তাহা ও স্বামিজীর নামে লিখিয়া দেন। বলা

বাহুল্য এই সকল দান স্বামিজীর বাগাড়ম্বরের ফল। যাহারা আশ্রমের ভক্তিমতী ভৈরবী তাঁহাদের যে শুধু আশ্রমের লোকের দুই বেলা পাক করাও স্বামিজীর গা হাত পা টেপা ইত্যাদি করনীয় কর্ম্ম তাহা নহে, নানাশ্রেণীর লোকদের অন্দর মহলে ঢুকিয়া তথাকার যাবতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্বামিজীর প্রত্যক্ষ দেবত্বের, এবং তৎসম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা ও কথার অবতারনা করিয়া বিস্ময় বিমূঢ়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে মহিলা শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাঁহাদের অন্যতম একটা গুরুতর কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। এই সকল Canvass এর কর্ম্ম ভৈরবী দিগকেই করিতে হয়। কোন সমৃদ্ধ ঘরের স্ত্রীলোক আশ্রমে যাইয়া স্বামিজীর চরণে প্রনত হইলে, প্রথমেই তাঁহাকে আশ্রমে কোন একটা কীর্ত্তি রাখার জন্য উপদেশ করা হয়। এই সকল স্বামিজীদের মধ্যে যাঁহারা একটু অধিক ধূর্ত্ত তাঁহারা প্রথমে অর্থের প্রতি একটু বীতস্পৃহতা দেখাইয়া আসরটি ভাল করিয়া জমাইয়া তোলেন—স্বামিজীর চেলারা নানা প্রসঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত গুণাবলীর কথা বলিয়া মূর্খদের ভক্তি ও বিশ্বাস চতুর্গুণ বড়াইয়া তোলে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আগ্রহ সহকারে দ্বিগুণ প্রনামী লইয়া মূর্খের দল স্বামিজীর পায়ের নিকট অগ্রসর হইয়া, গ্রহণের জন্য যোড়হাতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে থাকে। স্বামিজী নিষ্কাম ভাবে অবস্থান করেণ, শিষ্য বা চেলার দল নেপথ্যে হাত বাড়াইয়া অলক্ষিতে প্রণামী গ্রহণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারে, আশ্রমের ভাণ্ডারে লইয়া যায়। আর এই সকল স্বামিজীদের মধ্যে যে গুলি স্থূলবুদ্ধি বা অত্যন্ত অভাব গ্রস্থ সেগুলি প্রথমবারেই

টোপ গিলিয়া বসে—তেমন দীর্ঘকাল আসর জমাইয়া পসার প্রতিপত্তি বাড়াইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেনা। অল্পেই ধরা পরিয়া সরিবার চেষ্টা করে।

শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ও যাহাতে তাঁহার প্রতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা পূর্ব্ববৎ অটল ও অটুট থাকে, তজ্জন্য স্বমিজী নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি তাঁহাকেই জগদীশ্বর রূপে সর্ব্বদা মনে ধ্যান করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন। বিচার শূন্য মেষপাল সদৃশ ভক্তমণ্ডলী তাহাই করিতে থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, যাহা সর্ব্বদা মনে চিন্তা করা যায় তাহাই ক্রমে নিজের একটা অপরিহার্য্য নিজস্ব হইয়া দাঁড়ায়। এই সূক্ষ্ম কৌশলদ্বারা তাঁহারা ভক্তিমহলে কাইমি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো করিয়া লন। আবার কতকগুলি শিষ্য (যে গুলির বাড়ীতে দুবেলা অন্ন যুটেনা) আশ্রমে স্বামিজীর প্রসাদে পেটভরিয়া খাইয়া বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়ে এবং কিছুতেই আশ্রম ছাড়িতে চাহেনা। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরই পরিশ্রমজাত উৎকৃষ্ট ভোগ্য-দ্রব্য এই স্বামিজীরা ভোগ করিয়া থাকেন। গোয়ালা উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর, কৃষকেরা তরিতরকারী, মিস্তরী পায়ের খড়ম স্বামিজীকে প্রনামী স্বরূপ সময় সময় দিয়া থাকে। এমন কি যাত্রাওয়ালারা পয্যন্ত স্বামিজীকে, বিনাপারিতোষিকে যাত্রা শুনাইয়া কৃতার্থ হয়। এমন কি বর্ত্তমানে দেশের বক্তৃতাকারী নেতারা যেমন স্কুলের ছাত্রবৃন্দের স্কন্ধে বাহিত হইয়া তাহাদের কাঁধে মিউনিসিপালিটীর গাড়ীটানা বলদের স্কন্ধের দাগ ফেলিতে উপক্রম করিয়াছেন এই স্বামিজীরা ও বর্ত্তমানে সেই অনুকরণে

ক্রমে ক্রমে ভক্তবৃন্দের স্কন্ধে বাহিত হওয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন।

আশ্রম ভালরূপ স্থাপিত হইবার পরে স্বামিজীরা মফঃস্বলের ভক্তবৃন্দের গৃহে পদার্পন করিবার আয়োজন করেণ। সাধারণতঃ বাজারে ফজলী অথবা নেংড়াআম বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগৃহে ইঁহাদের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এক স্থানে মৎস, মাংস, ঘৃত, ঘনদুধ, পুরুস:, ফজলীআম ও ছানা সন্দেশ ষোড়শোপচারে নিষ্কামভাবে দিন কয়েক আহার করিয়া আবার তথা হইতে ঐ রকমেরই সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন অন্য কোন ভক্তগৃহে আবির্ভূত হন। অন্দর মহলেই ইহাঁদের সাতিশয় প্রতিপত্তি। কারণ পুরমহিলাগণ ভক্তিতে যত না হউক স্বামিজী অসন্তুস্ট হইলে অমঙ্গল হইবে এই ভয়ে ততোধিক অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বামিজীরা এইরূপে কতিপয় মাস নানা ভক্তগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রণামী তৈজসপত্র এবং নববস্ত্রাদি সহকারে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বলাবাহুল্য যে চরণ ধুলির জন্য ভক্তবৃন্দ অমন আকুল ও অধীর তাহাদিগের ভাগ্যে সে চরণ ধুলিলাভ ঘটিয়া উঠেনা। কারণ নিরন্তর জুতা ও মোজার আবরণে রহিয়া স্বামিজীদিগের চরণ জঘন্য ধুলিবালির নীচ সংসর্গ করিতে যায়না, সুতরাং চরণে ধুলির সংযোগ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে সকলেই পদস্পর্শ করিয়া হাত মাথায় ঠেকান ইহাতেই যাহা কিছু হইবার হয়।

এই শ্রেণীর বাবুসন্ন্যাসী গুরুদের মুখের দৌড় খুব থাকে। দশায় পড়িতে এবংযখন ইচ্ছা তখনই দর দর ধারায় চোখের জল

ফেলিতে ইহাঁরা চির সিদ্ধ। তবে শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ দশায় পড়িয়া, বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া হঠাৎ অস্থির হইয়া, স্বামিজীর প্রতি চতুর্দ্দিকের উপস্থিত জনমণ্ডলীর ভক্তি উদ্রেক করিতে স্বামিজী অপেক্ষাও অধিকতর পটু! এই স্বামিজীদের সকল রকম চলিত প্রশ্নেরই জবাব প্রস্তুত থাকে। যথা—যদি কেহ বলেন যে আপনার চরণামৃত খাওয়ান সত্ত্বে ও ছেলেটা মারা গিয়াছে, তিনি অমনি একটু কাঁদ কাঁদ নাকিস্থরে বলিবেন অহহ! ছেলেটির প্রতি ভগবানের অপার কৃপা, তাহার নিতান্ত প্রিয় বলিয়াই, আমার অনুরোধ সত্ত্বে ও তিনি,—ছেলেটিকে তাহার কাছে লইয়া গেলেন,—বিশেষতঃ আমার আশীর্ব্বাদের পর হইতেই তোমার ছেলের প্রতি ভগবানের আরও যেন একটু বেশী কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। আর যদি কেহ বলেন যে না, ছেলেটি বাঁচিয়াছে, তখনই তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিবেন, যে যখন আমার চরণামৃত খাওয়াইয়াছ, তখন সাক্ষাৎ যম আসিলেও তোমার ছেলেকে নিতে পারেনা। লোকে কথায় বলে “ঝরে বক মরে ফকিরের কেরামৎ বাড়ে” এদেরও কেরামতি সেই শ্রেণীরই। সময়ে কোন কোন আশ্রমে রাসলীলা গোপীলীলা এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু ঐগুলি গুপ্তলীলা, সাধারণের সে লীলাস্থলে প্রবেশাধিকার থাকেনা। ধর্ম্মের নামে বা ধার্ম্মিকের বেশে বঞ্চনা যে, কেবল হিন্দু সমাজের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এমন নহে, এপাপ সংক্রামক ব্যাধি মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ও প্রবেশ করিয়াছে; এই কলঙ্কে যেমন গৈরিক তেমন আঁলখেল্লা

ও কলঙ্কিত হইয়াছে, এই হাল ফ্যাসনের হিন্দু সন্ন্যাসী গুরুদিগের ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যে ও হালফ্যাসনের ফাকিবাজ, পীর পেগম্বর এবং ফিকিরবাজ ফকির হাজির হইয়া পড়িয়াছে। রাসলীলার রসময় আশ্রমের ন্যায়, তাঁহাদিগের ও বঞ্চনার আস্তানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারাও পরকালের পথ করুন আর না করুন, মোহান্ধের চোখ ফুটাইতে পারুন আর না পারুন, মোকদ্দমা জিতাইবার ও রোগ আরগ্য করিবার কৌশলময় বুজরকি প্রদর্শনে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তঁহারাও ফু, ফা দিয়া ঝারা পোছা করেন, তাবিজ দেন, এবং খোদার অনুগৃহিত প্রতিনিধি রূপে আপনাদিগের কেরামত জাহির করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাগিের ও কেহ কেহ আবার, কাঁসা সোনায় পরিনত করিবার অছিলায় বোকা ঠকাইবার ফাঁদ পাতিয়া বসেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সরল বিশ্বাসী অশিক্ষিত লোক অনেক সময় তাঁহাদিগের শরণ লইয়া বিপন্ন হইতেছে। ভদ্র ও অভদ্র সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানগণ ও এক্ষণ, ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সহজে প্রকৃত গুরুস্থানীয় পীর পেগম্বর বা ফকীরের আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না, মেকির গড্ডালিকার মধ্যে বাজাইরা আসল জিনিষ বাছিয়া লওয়া কঠিন। শাজেলাল প্রভৃতির ন্যায় উচ্চপ্রাণ মহাত্মা মুসলমান ফকীর সমাজে না আছেন এমন নহে, কিন্তু তাহাঁদিগের চিনিতে পারা সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে কি? পাঠক এখন দেখুন, ইহারা সমাজের বিশ্বাসন্ধ নরনারীর স্বাভাবিক ভক্তিবিকাশ প্রবণতার সুযোগে আপন অভিষ্ট সিদ্ধির পথ করিয়া লইয়া মুখে দুই চারিটা গীতার

শ্লোক বা কোরাণের বয়েৎ আওড়াইয়া কিরূপে পরান্নে রাজার হালে পুষ্ট হয়। প্রকৃত ধর্ম্মভাব কখনও এই শ্রেণীর ভক্তসাধক দ্বারা লোকসমাজে বিকীর্ণ হইতে পারেনা। যদিও আপাততঃ খোল করতালের ধ্বনিতে এবং হরিবোল-নিনাদে কিছু একটা হইল বলিয়া বোধ হয় তথাপি তাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অসত্য ও কপটাচারিতা প্রেমের নামে কাম, ত্যাগের নামে ভোগ, নিষ্কামতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার বিষময় ফল, প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে দেশ ও সমাজে ছড়াইয়া দিতেছে। ফলে ধর্ম্মের নামে লোকে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহাতে শুধু এই লাভ হইতেছে, যে পূর্ব্বে অধর্ম্ম করিতে প্রাণে যে একটু স্বাভাবিক ভয় ছিল, তাহাও অলীক ধর্ম্মের দোহাই বশে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। অধর্ম্মকে অধর্ম্ম বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা এককথা, আর অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বুঝিয়া তদনুসরণ করা অন্য কথা।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব এবং পরিণতি দেখিলে কি আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হয়না? প্রেম-ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম—আর আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের ধর্ম্ম তুলনা করিয়া দেখুন, যে প্রেম কিরূপ নিকৃষ্ট "কাম" রূপে এবং "ত্যাগ" কিরূপ "পেশাদারীভোগ" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চৈতন্যদেব নিজে এবং শিষ্যদিগেরও অনেকে স্ত্রীলোকের মুখ দেখার বিরোধী ছিলেন, আর এখন "জয়রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া এক এক বাবাজির পিছে তিনটি মাতাজী উপস্থিত হন। এমন সোনার গৌরাঙ্গের পবিত্র প্রেমভক্তি ও বৈরাগ্য ধর্ম্মের এমন

অধোগতি হইল কিরূপে? ইহা কি তাঁহার পরবর্ত্তী বহুদুষ্ক্রিয়াসক্ত কপটাচারী বৈষ্ণব নামধারী ভোগপরায়ণ সাধুবেশধারীদিগেরই কৃতকর্ম্মের ফল নয়? তাহাদের কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত তিলে তিলে দীর্ঘ দিনের পর বৈষ্ণব সমাজকে বর্ত্তমানের এই অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। যাহারা ধর্ম্মের মুখোস-না পরিয়া স্বভাবের তাড়নায় অপকর্ম্ম করে তাহাদিগকে আমি এই ইতর শ্রেণীর কপটাচারী সাধুবেশধারী অবতারদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থানে আসন দিতে প্রস্তুত আছি। যাহারা সরল, তাহারা সাময়িক স্রোতে কুপথে গড়াইলেও তাহাদিগের জীবনে ভালদিকে পরিবর্ত্তন অনেক সময়েই সহজে আসিয়া পড়ে; কিন্তু ভণ্ড কপটাচারীর ভাগ্যে প্রায়শঃ তাহা ঘটিয়া উঠেনা। যে পথে মঙ্গলস্রোত বাহিত হইয়া প্রাণে প্রবিষ্ট হইবার কথা, তাহারা প্রয়োজন বশতঃ কপট ব্যবহারের অনুরোধে চিরকালই তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু সরলপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে সে পথ চির-উন্মুক্ত। ভণ্ডসাধুরা নিজেও কখন উন্নতি লাভ করিতে পারেনা, সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও অধোগতির পথে টানিয়া লয়। কর্ম্মের মধ্যে তাহারা কেবল ফাকি দিয়া সমাজের অর্থ শোষণ করে, ভাবমুগ্ধ কতকগুলি ভদ্র সন্তানকে ক্রীতদাসের ন্যায় আশ্রমে রাখিয়া তদ্দ্বারা বিনা বেতনে চাকরের প্রয়োজন উদ্ধার এবং ততোধিক বিশ্বাসমুগ্ধা ভদ্র মহিলাদের দ্বারা চাকরাণী ও সেবাদাসীর কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া লয়।

এই সকল সন্ন্যাসী গুরুদিগের প্রদত্ত সকল শিক্ষা ও সকল উপদেশের সারমর্ম্ম এই যে, ঈদৃশ শিষ্য ও শিষ্য-বৃন্দের

আর অন্য কোন জ্ঞানলাভ করিবার প্রয়োজনীতা নাই— অন্য কোন ধর্ম্ম বা সাধন নাই; তাহারা একমাত্র গুরুর সর্ব্ব-প্রকার সেবা করিলেই চরমে উদ্ধার পাইতে পারিবে। কথার আভাসে ইহাও গুরুজি বুঝাইয়া দেন যে এই সকল ভক্ত-বৃন্দের সহিত লীলা করিবার জন্যই তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন। স্বর্গদ্বারের চাবি তাঁহারই করায়ত্ত, এবং ভগবান তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই, স্বর্গে গমনোপযোগী লোকের "লিস্ট্" প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যদি বা আশ্রম প্রবেশের পর কেহ কিছু সন্দেহের ছিটা ফোঁটা প্রকাশ করেন, তখনি স্বামিজীর ভক্তবৃন্দ স্বামিজী সম্বন্ধে কত কি অদ্ভুত দৈবদৃশ্য কত কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আশ্রমে আর কত কি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়, আগন্তুকেরাও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই সকল কাহিনী শুনিয়া বিস্ময় বিমিশ্র ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া পড়ে। আশ্রমের বাহিরে আসিয়া তাহারাই আবার অন্য দশ জনের নিকট, মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত করে। এইরূপে স্বামিজীদের পসার লোকমুখে প্রচারিত উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রসাদে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, যে জগতে অতি অল্প সংখ্যক লোকেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে, পোনর আনা লোকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ পূর্ব্বক একের দেখাদেখি মেষপালের ন্যায় অন্ধভাবে অন্যের অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত। কাজেই এবম্বিধ সমাজে পূর্ব্বোক্ত তদ্বির সমুদায়ের ফলে ভণ্ডদের ফাকি ব্যবসা যে সহজেই জমকিয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

এই সকল আশ্রমে গারু গামছা বহনের এবং 'গা' 'হাত' 'পা' টিপিবার ড্রিল ব্যতিরেকে, প্রকৃত জ্ঞানলাভের বন্দোবস্ত অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কারণ সকলেরই ভরসা ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান চর্চ্চা কিছুই নয়, গুরুদেবই হাতে হাতে স্বর্গে তুলিয়া দিবেন। শুধু আশ্রম রক্ষার জন্য যতটুকু বাহ্যিক ধর্ম্মের ভরং রাখা আবশ্যক, ততটুকু থাকিলেই হইল। যখন লোকে দেখিতে পায়, যে কোন প্রকারে স্বামিজী হইতে পারিলে আর কথা নাই, তাহা হইলেই চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা নিত্য উদর পূর্ণ করিতে পারা যায়, বিনা-বেতনে বহুসংখ্যক চাকর দিন রাত হাজির পাওয়া যায় ; রমণী-দের কোমল করের মধুর সেবায় সর্ব্বাঙ্গে পুলক সঞ্চারের সুযোগ ঘটে, ইহার উপর আবার ভগবানের অবতার বলিয়া সকলেই পায় লুটায়, তখন অনেকেরই মনে স্বামিজী হইবার বাসনা একান্ত প্রবল হইয়া উঠে, এবং ঐ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেকেই কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়া স্থানান্তরে থাকিয়া হঠাৎ হালফ্যাসনের স্বামিজী সাজিয়া যোগানন্দ বা প্রেমানন্দ নাম প্রচার পূর্ব্বক লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও বা এই শ্রেণীর স্বামিজীদের মধ্যে কাহারও প্রাণে প্রেমভক্তির একটু ছিটা ফোঁটা থাকে, তাহাও ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিরন্তর "প্রভু "মহাপ্রভু" ইত্যাদি দ্ব্যক্ষর বা চতুরক্ষর মন্ত্র প্রয়োগে একেবারে গোড়ায়ই মাটি হইয়া যায় ! মোট কথা বিনা কার্য্যে, বিনা দায়িত্বে নিষ্পারোয়ায় এমন চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহার, ফুলবাবুর ন্যায় পোযাক পরিচ্ছদ, নরনারীর প্রাণপণ সেবা ও স্তুতি, অন্য কোন ব্যবসা দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নহে এবং

এই শ্রেণীর ব্যবসায় এদেশ ভিন্ন যে অন্য কোথাও চলিতে পারেনা তাহাও সত্য। পাঠক এই সকল কর্ম্মে ধর্ম্মের গৌরব যে কতদূর নষ্ট হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের যে গতি, তাহাতে আমাদের জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, সত্য ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত বিগ্রহ স্বরূপ যথার্থ মহাপুরুষের লোকসমাজে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরপি বলিতেছি স্বামিজী ও আনন্দ উপাধিধারী গুরু সম্প্রদায়ে প্রকৃত মহনীয় মহাপুরুষ না আছেন, এমন নহে, তবে একথা সত্য যে, বুজুরকি দেখাইতে, প্রেমভক্তির কৃত্রিম অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা সহর গুলজার করিতে, ভক্ত সংখ্যা বাড়াইতে এবং ভগবানের অবতাররূপে পূজা পাইবার নিমিত্ত উল্লিখিতরূপ ফিকির ফন্দী করিতে পুর্ব্ব বর্ণিত হালফ্যাসনের গুরুদিগের জুরি বা সমকক্ষ তাদৃশ সার্থক নামা মহাপুরুষদিগের মধ্যে একটিও মিলিবে কিনা সন্দেহ। তাহাদিগের কতক বনবাসী উদাসীন, কতক গৃহস্থযোগী। তাঁহারা সরল প্রাণ, উদার, বিনীত এবং সর্ব্বাংশেই অমায়িক অদাম্ভিক ও সাত্তিক প্রকৃতির লোক। তাহাদিগের বাহিরের কোন সাজসজ্জা বা আড়ম্বর নাই। যদিও তাহাদিগের অনেকে গৃহী তথাপি সার পদার্থ যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহারা যদিও পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে টীনের ঘরে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরল প্রকৃতি ভাগ্যবানের স্কন্ধে পতিত হন নাই, এবং নিজের বাড়ীতে থাকিয়া আহার বিহারে সাধারণ গৃহীর ন্যায় আছেন; তথাপি

উচ্চচিন্তা, উচ্চজ্ঞান, সত্যপ্রিয়তা এবং প্রকৃত প্রেমভক্তি হেতু তাঁহাদিগের আসন বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বাজারের স্বামিজীগণ তাঁহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেনা। তাঁহারা কখনও সহরে সাধুতার ধ্বজা উড়াইয়া ঢেঁটরা দিয়া বেড়ান না, সাধু আসিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দানেও তাহারা চিরপরাঙ্মুখ। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবেই পরমাত্মনিষ্ঠ নীরব সাধক। কিন্তু দেশে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত, কৃত্রিম সন্ন্যাসী ও ভণ্ড ব্রহ্মচারীর তাণ্ডব কাণ্ডে ধর্ম্মের পবিত্র নামে যেরূপে পাপ বঞ্চনার দুর্দ্দম প্রবাহে সকল স্থান প্লাবিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগের আর আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া থাকা সঙ্গত হইতেছেনা। এক্ষণ যেমন তাহাদিগের পক্ষে আত্মগোপন না করিয়া লোকের হিত এবং দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় আপনাদিগের হৃদয়িক উদার সম্পদ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার সাধারণের ভোগের নিমিত্ত বিনা প্রতিদানে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তেমন আবার দেশীয় বিশ্বাসান্ধ ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও একটু চক্ষুষ্মান্ হইয়া প্রকৃত জহুরীর ন্যায় যথার্থ মনিরত্ন খুঁজিয়া বাহির করিবার উপযোগী ক্ষমতা অর্জ্জন করা এবং জীবনের পথ প্রদর্শক গুরু নির্ব্বাচনে বিশেষরূপে সতর্ক ও সাবধান হইয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

বড়ই দুঃখের কথা ও একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিক্ষিত ব্যক্তি ও শিক্ষিত ছাত্রগণ চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায় চলিতেছেন। তাহারা যদিও নিজেদের বিবেক, যুক্তি কিংবা বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান যে এই সকল

স্বামিজী বা পরমহংস দেবগণ একমাত্র কপটাচারিতা ব্যতিরেকে আর সকল বিষয়েই ঠিক সাধারণ লোকের মত। সাধারণ লোকদের ন্যায় ইহাদের ভাল আহার বিহারে রুচি, সাধারণ লোকের ন্যায়ই ষড়রিপু দ্বারা ন্যূনাধিক রূপে জর্জ্জরিত। সাধারণ সংসারিক লোক যে ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহারাও সেই ভাবেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সর্ব্ব সাধারণের ন্যায় ইহারাও জরা জন্ম মৃত্যুর অধীন, ইহারা ও সাধারণের ন্যায় প্রণামী পাইলে খুসী হন ও হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করেন, আবার প্রণামী বন্ধ করিলেই কুৎসা করিতে কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হন—ইহারাও সাধারণের ন্যায় বিনয়ের আবরণে আত্মপ্রশংসা করেন ও অন্য স্বামিজীদের নিন্দা করেন। যদিও স্বদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহা বোঝেন যে ভগবান কাহারও হাতধরা নহেন, তাঁহার প্রেম, ও করুণা সর্ব্বত্রই প্রবাহিত; সর্ব্বভূতে সর্ব্ব অণুতে সকলের প্রাণে প্রাণে তিনি বিদ্যমান, তাঁহার চক্ষে কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, ভক্তিভরে ডাকিলে বা প্রার্থনা করিলে তাঁহার অমৃতময় সত্ত্বা সকলেই প্রাণে অনুভব করিতে পারেন, এবং ইহার মধ্যে আর কোন ফাকি বা অবোধ্য গুহ্য তত্ত্ব লুক্কায়িত নাই, তথাপি যখনই তাঁহারা ঈদৃশ স্বামিজী বা পরম হংসের সম্মুখীন হন, তখনই ইহাদের বুজুরকির পোষাক পরিচ্ছদ, কখনও গেরুয়া, কখনও ঢাকাই বসন, কখনও তিলক, কখনও রুদ্রাক্ষ মালা এবং মুখে দুই চারিটা গীতার শ্লোক, প্রেমভক্তির দুটা চারিটা বাঁধিগৎ, কথা কহিবার ও চাহিবার ঢং দেখিয়া ভ্যাবা চাকা খাইয়া

যান এবং প্রণাম করিয়া মুখে দু-চারি কথার সায়দিয়া চলিয়া আসেন বা গদগদ চিত্তে আত্মহারা হইয়া একেবারে পদে লুটাইয়া পড়েন। এই সকল স্বামিজীরা কাহারও না কাহারও উপর সওয়ার হইয়াই আছেন। সরল প্রকৃতির বিশ্বাসান্ধ নরনারীর দেশ পাইয়া খুব ফাকিবাজি ব্যবসাই চালাইতেছেন ও দিনের দিন পরস্মৈপদে দুগ্ধ ঘৃতের শ্রাদ্ধ করিয়া নধর-কান্তি হইতেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করেন এবং নিত্য পরখ করিয়া দেখেন। শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলী, শিক্ষিত ছাত্রগণ, ইহাও বুঝেন ও জানেন যে তাঁহা দিগের মধ্যেই এমন লোক অনেক আছেন যাহারা ঈদৃশ স্বামিজীকে ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইহার যে কোন ভাষা চিরজীবন শিখাইতে পারেন এবং ধর্ম্ম গ্রন্থে ও তাঁহাদের এত প্রবেশ ও উহার এত শ্লোক মুখস্থ আছে যে, স্বামিজী তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। বস্তুতঃ ধীরভাবে চিন্তা করিলে তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পারেন যে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, ভক্তিতে ও প্রেমে স্বামিজী অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি তাঁহাদিগের ভিতরেই বহু সংখ্যক বর্ত্তমান আছেন। এই অবস্থায় তাঁহারাও যে গড্ডালিকা প্রবাহে গড়াগড়ি দিয়া, আত্মবিড়ম্বনা করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নীরবে যে কপটতা ও বঞ্চনার প্রশ্রয় দান করিয়া আসিতেছেন, ইহা যেমন দুঃখজনক, তেমনি লজ্জাকর।

২। গুরুগিরি।

(নিম্নশ্রেণী)।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঐসকল ফাকিবাজ গুরু ব্যবসায়ীদের ন্যায় আরও কতকগুলি ধূর্ত্ত লম্পট শ্রেণীর লোক নমঃশূদ্র, ধোপা, কৈবর্ত্ত, যোগী ইত্যাদি নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে গুরু-গিরি করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। তাহাদের আহার বিহারও ছোটখাট নবাবের চালে চলে; সঙ্গে সঙ্গে লাম্পট্য বৃত্তির যথেষ্ট চরিতার্থতা হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণব নামের সহিত সাধারণতঃ বড়ই একটা পবিত্রভাবের সম্বন্ধ। বৈষ্ণব বলিলেই কেমন এক নিরীহ, ক্ষান্ত, দান্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন সান্নিধ্যে প্রতিভাত হয়। যথার্থ বৈষ্ণব পুরুষ সকলেই আপনাদিগকে স্ত্রীভাবাপন্ন মনে করেন। আকৃতি প্রকৃতি পোষাক পরিচ্ছদাদি, সর্ব্ববিষয়েই তাহারা স্ত্রীস্বভাবের অনুকরণ করেন। তাঁহারা দাঁড়ি গোঁপ রাখেন না; কোন রূপ বেশ ভূষার ধার ধারেন না। তাঁহারা মধুরভাবে জগদীশ্বর হরির আরাধনা করিয়া থাকেন। উপপত্নী উপপতির উপর যে অনুরাগ পোষণ করেন, তাঁহারাও সেই অনুরাগে ঈশ্বরের ভজনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু সাত্বিকভাবাপন্ন সাধক ও প্রকৃত গুরু স্থানীয় এবং সর্ব্বাংশে নমস্য মহাপুরুষ আছেন। বৈবষ্ণ ও বৈরাগী এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এক শ্রেণীর বস্তু নহে। এস্থলে তাহাদিগের কথা বলা হইতেছে না; তাহারা

বৈষ্ণব সমাজভুক্ত হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জীব। বাউল, গৈরা, বৈরাগী, ক্ষ্যাপা, পাগলা, ন্যাড়া, কর্ত্তা-ভজা ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলার অনুকরণে, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিলনের নানারূপ গুহ্য অনুষ্ঠান হয়। ইহারা মাথার চুল ফেলেনা, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম প্রভৃতি সমুদয় কেশ রাখিয়া দেয়, এবং মাথায় চুল উচু করিয়া একটি টোপের মত মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখিয়া দেয়। ইহারা গলে তুলসীর মালা দেয়, কপালে ও নাকে তিলক দেয়, গায়ে একটা আল-খেল্লা দিয়া হাতে লাঠি বা বড় নারিকেলের মালা (খুলি) অথবা বড় একটা চিমটা লইয়া ভিক্ষা করে। গুরুগিরি এবং ভিক্ষাবৃত্তি এই দুইটিই ইহাদের ব্যবসা। ধর্ম্মের নামে লাম্পট্য বৃত্তি চরিতার্থ করিবার যে কত রকমের উপায় বাহির হইতে পারে, তাহা ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিপথগামিনী স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র যখন এতদূর কলুষিত হইয়া পড়ে যে তাহাদিগের আর সমাজে থাকা পোষায়না, তখন তাহারা আসিয়া এই সকল পতিতপাবন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শরণ লইয়া তরিয়া যায়, এবং মাতাজী, ঠাকুরাণীর আসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া যথেচ্ছভাবে আপনাদের সেই পূর্ব্ব অভ্যস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে। “কিশোরী ভোজন” ব্যাপারের উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের বহু স্ত্রীলোক পুরুষের এক নিভৃত স্থানে সমাগম হয়,—স্ত্রীলোকদের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কুলললনারাও থাকেন। প্রকাণ্ড একটি থালে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া

গুরুজী উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলেন, কিছু-ক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনের পরই দশায় পড়িবার পালা আরম্ভ হয়—স্ত্রীপুরুষ অনেকেই দশায় পড়ে। প্রথম উপবেশনের সময় কয়েক খানি চিক অথবা পর্দ্দা দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদের হইতে একটু তফাৎ রাখা হয়। কিন্তু "দশায়" পড়িবার পালা আরম্ভ হইলে তখন আর চিক অথবা পর্দ্দা থাকে না। স্ত্রীপুরুষ সকলেই একত্র হয়, এবং "দশা" ভাঙ্গাইবার জন্য "দশা" প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের কানের কাছে, কীর্ত্তনকারীদের কৃষ্ণ নাম করিতে এবং নানা প্রকারে তাঁহাদের হাত পা টানিয়া, মাথায়, মুখে, চোখে ফুদিয়া "দশার" মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইতে হয়। তৎপর আহারের পালা, সকলেই একপাত্রে আহার করে, তখন যে কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক যে কোন পরিচিত অপরিচিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেয়। ইহাতে কোন বাধা নাই। যাহার যাহাকে রুচি সে তাহাকেই খাওয়াইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক সময় সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের ঘরের স্ত্রীলোকদেরও নাকি এই বিকট লীলাস্থলে আমদানী হয় বলিয়া শুনা যায়। এই সম্প্রদায়ের সকলকেই এক একটি প্রকৃতি রাখিতে হয়।

ইহাদিগের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রীপুরুষ সকলেই রাধা কৃষ্ণের প্রতিকৃতিরূপে গণ্য। ইহাদের সাধন পদ্ধতি বলিতে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। যে সকল নীচ শ্রেণীর নরনারীরা কেবল পাশব ভোগসুখে উন্মত্ত—তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ঐ শ্রেণীর পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি করিয়া,

একেবারে ধর্ম্মপথে টানিয়া আনা প্রায় অসম্ভব। কাজেই অবাধ ভোগবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্যেও ধর্ম্মের একটু বাঁধনি থাকিলে হয়ত কালে, ভগবানের কৃপায়, তাহাদের ঐ সকল বৃত্তি একটু শিথিল এবং প্রকৃত প্রেম ভক্তির দিকে চিত্তের একটু আকর্ষণ হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের ঈদৃশ কার্য্য হয়ত একেবারে নিরর্থক না হইতে পারে।

এ দেশীয় তন্ত্রের উদ্দেশ্যও অনেকটা এইরূপই। যাহারা পঞ্চ "ম" কারের কিছুই ছাড়িতে প্রস্তুত নহে, তাদৃশ লোককে প্রথমেই এই সকল ছাড়াইয়া ধর্ম্মপথে তাহার মন আনিবার পরামর্শ দেওয়া বাতুলতা মাত্র। কাজেই ঐ সকল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ভগবানের দিকে মন দেওয়ার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র কতকগুলি নিয়ম পদ্ধতির ভিতর দিয়া, কতকগুলি বাঁধা বাঁধি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অবিদ্যার প্রভাব হইতে কালে ঐ সকল লোকের মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ ঘটিলে ঘটিতে পারে।

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বাউল অথবা বৈরাগী সম্প্রদায়ের ব্যভিচার অত্যন্ত প্রবল হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কপটাচারিতা সন্ন্যাসী গুরুদের অপেক্ষা অনেক কম।

এখন ভিক্ষার কথা বলিব। ছাপা কাটা তুলসীর মালা আটা, ও নাকে রসকলি ও কপালে তিলকধারী বৈরাগী ও বৈরাগিনীগণের মূর্ত্তি এ বঙ্গদেশে কাহার অবিদিত? ইহারা "জয়রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, চিররোগক্লিষ্ট বা বৃদ্ধ বা কোন কারণে শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাহাদেরই শোভা পায়। কিন্তু এই শ্রেণীর বৈরাগিগণ অনেকেই সুস্থ সবল দেহে ভিক্ষা করে; আর প্রকারান্তরে অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ইত্যাদি প্রকৃত অক্ষম লোক-দিগের প্রাপ্য অর্থের এক বৃহৎ অংশ ইহারা অন্যায়রূপে শোষণ করিয়া লয়। ইহাদের মধ্যে আবার কোন সুচতুর বৈরাগী গৃহস্থ বাড়ী যাইয়া মাত্র তিনবার "ভিক্ষা দেও বাবা" "ভিক্ষা দেও মা" বলিয়া ডাক দেয়। ফলে গৃহস্থের চক্ষে ইনি একটু বেশী দেবভাবাপন্ন পুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হন। বাড়ীর গৃহস্থ বা অধিকাংশ সময় স্ত্রীলোকেরাই দৌড়াইয়া আসিয়া পয়সা এবং, চাউল দিয়া ইহার ভিক্ষার ঝুলির কিয়দংশ পূর্ণ করিয়া দেন। সাধারণ বৈরাগী হইতে ইহাদের প্রাপ্য একটু বেশী। ইহারা বাড়ী হইতে ভিক্ষা না পাইয়া চলিয়া গেলে গৃহস্থ অমঙ্গল আশঙ্কা করেন। পূর্ব্বোক্ত বাউল ইত্যাদি এবং এই বৈরাগী সম্প্রদায় ব্যভিচারী বলিয়া যেমন নিন্দনীয়, তেমনই সমাজের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পোষ্য অন্ধ আতুর এবং অক্ষমদের প্রাপ্য শোষণ করে বলিয়া ন্যায়ের চক্ষেও দণ্ডনীয়। তবে "বৈষ্ণবী" উপাধিটি বড়ই পতিতপাবনী আখ্যা। বাজারের গণিকারাও সময় বিশেষে নামের শেষে বৈষ্ণবীর পুচ্ছ লাগাইয়া ধন্য হয়। বস্তুতঃ যৌবনে ভাঁটা লাগিলে এ শ্রেণীর অনেক কুরঙ্গনয়নাই করঙ্গ করে লইয়া বৈষ্ণবী সাজিয়া ভিক্ষুকীর দলে মিশিয়া যায়।

ভিক্ষুকদিগের মধ্যেও অনেক সময় "এণ্ড কোং" দৃষ্ট হয়। ইহারা দলে দলে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হয়, এবং সকলের উপার্জ্জিত ভিক্ষা একত্র করে এবং অংশ মত ভাগ বাটয়া করিয়া গ্রহণ করত আপনাদের যৌথ কারবার চালায়। আবার কোন কোন ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোকেরা কোন অন্ধ বা খঞ্জকে হাতে ধরিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ষ্টেশনে অথবা জাহাজ ঘাটে অথবা লোকালয়ে নানা গৃহস্থ লোকের বাটিতে উক্ত অন্ধ বা আতুর দ্বারা যাহা উপার্জ্জন হয় তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ ঐ অন্ধ অথবা খঞ্জকে দিয়া, বাকী যাহা থাকে তাহা আপনি আত্মসাৎ করে।

গুরুগিরি—ব্যবসায়ী কৌলিক গুরু।

গুরুতা ব্যবসায়ী কৌলিক গুরুদিগের মধ্যে এখনও বহু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সদ্‌গুরু বর্ত্তমান আছেন।

গুরুরূপে আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষ এই শ্রেণীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও সাধুতা ও সদ্ভাবে আপন কৌলিক ব্যবসায় চালাইবার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি অনেকেরই আছে। যাঁহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পরিমাণ বিদ্যা উপার্জ্জনেও অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এত কাল আত্মপসার যমকাইবার নিমিত্ত, ছল, চাতুরী বা ফাকিবাজীর পথ অবলম্বন তত আবশ্যক মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে সকল হিন্দু প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মানিয়া চলেন, তাহারা কিছুতেই কুলগুরু ত্যাগ করিবেন না; গুরু বংশীয় ব্যক্তির গুরু পদের যোগ্য গুণ থাকুক আর না থাকুক, [illegible]

সম্মান এবং গুরুর লভ্য সকলই কেবল বংশ সম্বন্ধেই তাঁহার প্রাপ্য থাকিবে। এই অবস্থায় ছল চাতুরী অনাবশ্যক। সুতরাং কৌলিক গুরুগণ ফাকিবাজী কপটাচার বা বঞ্চনার প্রোফেসারিতে এত কাল তত মনোনিবেশ করেন নাই। কিন্তু কালধর্ম্মে এখন তাহাদিগের মধ্যেও স্থানে স্থানে অল্লাধিক মাত্রায় এই জঘন্য পাপবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়াছে।

অধুনা লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; অনেকে শাস্ত্রীয় পুরাতন বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনায়াসে কৌলিক গুরুত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, অথচ বাজারে হালফ্যাসনের বুজুরকির নবীন ও ফাকিবাজ সন্ন্যাসী গুরুদের অভাব নাই। সুতরাং, কখন কাহার কোন চাতুরী-জালে ভুলিয়া কোন শিষ্য গুরুত্যাগী হইয়া বসে তাহা অনি-শ্চিত। তাই এক্ষণ কোন কোন কুলগুরু বঞ্চনা ও বুজুরকির পথ লইতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, তিনি ফোটা তিলক, নামাবলীর আড়ম্বরে উহা সারিয়া লইতে চেষ্টা করেন; যাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির অভাব তিনি শিষ্য গৃহে যাইয়া অজ্ঞ-পুরুষ ও স্ত্রীলোক মহলে বিদ্যাপ্রকাশে প্রয়াসপর হন, ইহা কখন কখন কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে, তৎপ্রদর্শনার্থ নিম্নে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

এদেশের গুরুব্যবসায়ের কৌলিকগুরু প্রধানতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। [illegible] ভট্টাচার্য্য, কৌলিকগুরুর নাম বৈষ্ণবের [illegible]

কৌলিকগুরু। গোস্বামী প্রভুদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিহীন ও ভক্তি ধর্ম্মের মৌলিকভাবে দুর্ব্বল, তাঁহাদিগেরই এক-জনের কথা বলিব। এই শ্রেণীর কোন কোন গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব উপাসনার মধুরভাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা, কখন কখন শিষ্যগৃহে কুৎসিৎ লাম্পট্য বৃত্তির অনুষ্ঠান করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। তান্ত্রিক গুরুদিগের মধ্যে শত অবনতি ঘটিলেও শিষ্যগৃহে এতাদৃশ সুযোগ বা সুবিধা তাঁহাদিগের বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। গোস্বামী প্রভু-দিগের কেহ কেহ শিষ্যগৃহে যাইয়া অনেক সময়ই স্ত্রীলোক শিষ্যদিগের মধ্যে জয়দেবের আদিরসাত্মক কবিতার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া আপন বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে ভালবাসেন।

পাঠক, বিদ্যাশূন্য প্রভুপাদের সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যার নমুনা-দেখুন। কোন এক গোস্বামীপ্রভু, শিষ্যবাটীতে শিষ্যানী দিগের মধ্যে বসিয়া "রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে" এই পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কিরূপ নীচজন ভোগ্য ও যারপরনাই কুরুচিজ্ঞাপক অথচ হাস্যোদ্দীপক কাহিনীর অব-তারণা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে সজ্জন মাত্রই ঘৃণা ও লজ্জায় "রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া কানে হাত না দিয়া পারিবেন না। তিনি এই শ্লোকের চরণার্দ্ধ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন "এই শ্লোকের চরণের ব্যাখ্যা বড় সুন্দর, গুটি পাঁচ ছয় কথার মধ্যে, তোমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলে বুঝিতে পাইবে ভাবুক মহাজন কবি, আহাহা কত কথারই না সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ একদিন শ্রীকৃষ্ণ হাটে যাইতে

ছিলেন, রাত্রিকালে কুঞ্জবনে অনেক পানের প্রয়োজন হয়। রাধা পান কিনিয়া আনিবার জন্য গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন। রঙ্গপ্রিয় বনমালী শুধু পান কিনিয়া আনিলেন; সুপারি, খয়ের, চূণ ও মসল্লাদি কোন উপকরণই আনিলেন না। তিনি শুধু পান কিনিয়া আনিয়া রাধাকে বলিলেন, "রাধা ধর সুধা পানে" ; শুধু পান দেখিয়া রাধার বড় অভিমান হইল, তিনি ঐ পান স্পর্শও করিলেন না। অমনি কৃষ্ণ প্রেমের ঝগড়া বাঁধাইয়া বলিলেন, আরে "শালি-নে" রাধাও তেমন ক্রোধে চোখ রাঙ্গাইয়া "বনমালী-নে" বলিয়া পান ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এরূপ প্রণয়ের বিবাদ ঘরে ঘরেই হইয়া থাকে! পাঠক, "রাধা ধর সুধাপনে শালিনে বনমালিনের" এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়াই বুঝিতেছেন, প্রভুদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত দূর, রুচিও প্রবৃত্তি কোন্ শ্রেণীর। তান্ত্রিক কুলগুরুদিগের মধ্যেও এই শ্রেণীর বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মাঝে মাঝে ঠিক এই নমুনার না হইলেও প্রায় ঈদৃশ কুরুচি প্রণোদিত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়। আর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

রাজ সংস্করণের গুরু

এইক্ষণ সাধারণ ভাবে কৌলিক গুরুদিগের অধঃপতন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। পুরুষানুক্রমিক গুরুতাব্যবসায়ের প্রসাদে অনেক গুরু বিষয় সম্পন্ন ধনীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ঘোরতর

বৈষয়িক, সুতরাং ঈশ্বর, পরকাল ও পাপ পুণ্যের কথা লইয়া তাঁহারা কখনও কোনরূপে মাথাঘামান আবশ্যক মনে করেন কি না জানিনা। তাঁহাদিগকে পলিটিকেল বা রাজ সংস্করণের গুরু বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের এখন গুরুতা ব্যবসায়ের উপর তত নির্ভর নাই; তবে কৌলিক লাভের একটা উপকরণ ছাড়িয়া দিবেন কেন, এইরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সময় সময় তাঁহারা গুরুগিরির অভিনয় করিয়া থাকেন। পাঠক, এখন আমাদিগের দেশের রাজ সংস্করণের গুরুর মূর্ত্তি দেখুন।

ইহাদের মস্তকে টিকি অথবা শিখা আছে বটে, তবে তাহা বড় সূক্ষ্ম। চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইলে উহা চুলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। অর্থাৎ ঈদৃশ টিকি রাখিয়া সাহেবী ফ্যাশন মতে চলিতে আটকায় না। কেবল শিষ্য বাড়ী যাইবার সময় সেই সূক্ষ্ম টিকিটিকে চুল হইতে উদ্ভিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। হয় ত, দুই একটি চন্দন চর্চ্চিত ছোটফুলও তাহাতে দোদুল্যমান থাকে। ইহারা বাটীতে সচরাচর সাধারণ ভদ্রলোকের মত থাকেন। বাটীর ছেলেদিগকে সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষা দেন, নিজেরাও রেলে, জাহাজে যাতায়াত কালে এবং সময় মতে হ্যাট, কোট, বুট পরেন, পঞ্চ 'ম" কারের কোনটাতেই অরুচি নাই। মামলা, মোকদ্দমা, ফৌজদারী, জালিয়াতী সকলই প্রয়োজন পড়িলে করিতে বিশেষ পটু। কিন্তু শিষ্য বাড়ী যাইবার সময়, একটু ফোঁটা তিলক কাটিয়া বার্ষিক আদায় করিতে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা উপচারে উদর পূর্ণ করিতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বলিয়া একটা

পদার্থ আছে, ইহারা তাহা কল্পনায়ও একবার মনে আনেন না। নিজেদেরও, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিষ্য প্রসাদাৎ একটু জমি জমা বা তালুক আছে; তাহাদ্বারাই বাবুর-হালে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া যায়। ইঁহাদিগকে বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুদেব বলিয়া মনে হওয়া দূরে থাকুক, গায়ের জামা খুলিয়া অতিকষ্টে, কোমরে লগ্ন জীর্ণ-মলিন পৈতা বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া বোঝা-ই একান্ত কঠিন সমস্যা হইয়া পড়ে। ইঁহাদের হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট শোভা পায়,—এবং সাহেবী হোটেলেও অনেক সময় সান্ধ্য ভোজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিষ্যের সম্পত্তি অপলাপ করিতে ইঁহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, এবং প্রয়োজন পড়িলে বিষ প্রয়োগে ইঁহাদের কেহ কেহ শিষ্যের প্রাণ বিয়োগ ঘটাইতে ও পশ্চাৎপদ নহেন। এবম্বিধ দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকে জানেন; কারণ বরিশালে কীর্ত্তিপাশায় এই শ্রেণীর বিষ-প্রয়োগে শিষ্যের ভব-লীলা শেষ করিবার কাহিনী ভাটমুখে দেশে বিদেশে প্রচারিত। যদি কোন ভক্তিমান্ ভূসম্পত্তিশালী সমৃদ্ধব্যক্তি এই শ্রেণীর কোন গুরুকে মৃত্যু সময় তাঁহার পুত্র সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পত্তির ট্রাষ্টি করিয়া যান, তাহা হইলে হয়ত গুরুদেব তাহার মৃত্যু হইতে না হইতেই এমন একটি জাল উইল তৈয়ার করিবেন যে, তাহাতে কোন সর্ত্তে লেখা থাকিবে, উইল কর্ত্তার বর্ত্তমান পুত্রের মৃত্যু হইলে সমস্ত সম্পত্তি গুরু পাইবেন। ইহার পর এই জাল উইলই প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে, ইনি স্বভাবতঃই যত সত্বরে সম্ভব বালকটির প্রাণ-বিয়োগ-ব্যবস্থার চেষ্টা পান।

এবং তাহার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিই যথা সাধ্য লুণ্ঠন করেন। যদিও বা ঐ পিতৃমাতৃহীন বালক, এমন প্রাণনাশের চেষ্টাসত্ত্বেও একমাত্র ভগবানের কৃপায় প্রাণে বাঁচিয়া যায়, তথাপি সাবালক হইলে তাহার বৈষয়িক অবস্থা এমন হয় যে, তাহাকে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এইশ্রেণীর গুরুদের আরও বহু কীর্ত্তি আছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিষ্যবর্গ এই সকল জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাদের প্রাপ্য, ধর্ম্মভয়ে, প্রতিবৎসরই যোগাইতেছেন। রাজসংস্করণের গুরুদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সৎলোক একটিও নাই, আমি এমন কথা বলিতেছিনা। কিন্তু তাদৃশ দুর্লভজনের দর্শনলাভ নিতান্তই সৌভাগ্যসাপেক্ষ। পাঠক রাজসংস্করণের কুল-গুরুর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন ; এইবার বিকৃতদশাগ্রস্ত সুলভ সংস্করণের কুল-গুরুর মূর্ত্তি দেখুন। ইঁহারা প্রায়ই অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন না, বাহ্যিক বিশেষ বিলাসিতাও ইঁহাদের নাই। ইঁহারা ব্রাহ্মণের আচার Formula মাফিক বুঝিয়া একরূপ নির্ব্বাহ করেন। মন্ত্রজপের বা গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা আহ্নিকের সময়, হয়ত বৈষয়িক চিন্তা করেন, কিম্বা "অলক্ষিতে কোন আকণ্ঠ নিমজ্জিতা সুন্দরীর দিকে একটু কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া লন।"

ইঁহাদের, মধ্যবিৎ অবস্থার ভদ্রলোক ও সহরের ব্যবসায়ী সাহা মহাজনদের বাটিতে, বড় আদায় উশুল হইয়া থাকে। আবার এই শ্রেণীর অনেকে বেশ্যামহলে মন্ত্র দান করেন এবং ইঁহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হয়। তৈজসপত্র,

নূতন তসরের কাপড়, সোণার আংটি, গুরু পত্নীর স্বর্ণ অলঙ্কার, অনেক সময় বাড়ীতে দালান, এবং বাড়ীর পুষ্করিণীতে বাঁধান ঘাট পর্য্যন্ত হইয়া যায়। ইঁহারা, ভিজা বিড়ালের ন্যায়, ধীরে ধীরে বেশ করিয়া আপনার পশার প্রতিপ্রত্তি করিয়া লন। পূর্ব্বোল্লিখিত গুরুদিগের ন্যায় ইঁহারাও আম ও ইলিশ মৎস্যের সময়ই সাধারণতঃ শিষ্য গৃহে উপস্থিত হন। ইঁহাদের শাস্ত্রে বিশেষ কিছু দখল নাই। সাধারণ পূজার মন্ত্র ইত্যাদি কণ্ঠস্থ রাখেন।

ভারতে যে এইরূপ কত গুরুজী, পরমহংস, স্বামিজী, ব্রহ্মচারী, মোহন্ত ও কর্ত্তাভজার দল আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফাকিবাজীই ইহাদের ব্যবসায়। নিকৃষ্ট রকমের ভোগ-সুখ বা কাহারও পাশব-সুখই জীবনের লক্ষ্য। দেব-মন্দিরে বা আশ্রমে, মোহন্তদের, স্বামিজীদের, এবং কর্ত্তা-ভজাদের, সেবাদাসা, দেবদাসী ও ভৈরবীদের কথা সকলেই জানেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা নাকি বিবাহ করিয়া, স্ত্রী রজস্বলা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুরুগৃহে রাখিয়া দেয়, এবং রজস্বলা হইলে, গুরুকে প্রথমে ভক্তিভাবে ভোগের নিমিত্ত দিয়া, তৎপরে শিষ্য, গুরুর প্রসাদ স্বরূপ, স্ত্রীকে বাড়ীতে লইয়া যান। ধর্ম্মের নামে অধিকাংশ স্থলে কিরূপ নরকের স্রোত প্রবাহিত হয়, কিরূপে ধর্ম্মের অনুরোধে কখন কখন ধন, মান ও সর্ব্বস্ব এমন কি, সকলের উপর লোকের সুচরিত্রেরও বলিদান হইয়া যায়, পাঠক, বোধ হয়, এখন সম্যক্‌রূপেই, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। ধর্ম্মই আমাদের

একমাত্র আশা ভরসা, ধর্ম্মেই আমাদের মনুষ্যত্বের ভিত্তি ও ভবিষ্যতের উন্নতি-সোপান প্রতিষ্ঠিত। যদি আমরা কখন উন্নত-হই, তবে সে প্রকৃত ত্যাগে হইবে; ভোগে হইবে না,—সত্য দ্বারা হইবে, কপটাচারিতা বা ভণ্ডামি দ্বারা হইবেনা। যদি আমাদের সেই ধর্ম্মের গোড়াঘরেই গলদ থাকে, তাহা হইলে ত আমাদের আর কোন আশা ভরসাই নাই। ধর্ম্মের নামে এইরূপ ফাকিবাজি যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে পরিণাম যে কি শোচনীয় হইয়া পড়িবে, তাহা চিন্তা করিলেও মন প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এক দল ভণ্ড হাল ফ্যাশনের সাধু সাজিয়া, একদল নিষ্কর্ম্মা গাঁজাখোরের দল গঠন করিয়া, কতকগুলি স্ত্রীলোককে অধোগতির পথে টানিয়া লইয়া সমাজের অর্থ শোষণপূর্ব্বক ফাকিব্যবসায় চালাইবে, আর দেশের লোক উদাসীন ভাবে একপার্শ্বে সরিয়া রহিয়া অলস ভাবে নিদ্রা যাইবে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় ও লজ্জার কথা। বস্তুতঃই, ইহারা সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশা—আততায়ী রূপে দণ্ডার্হ।

৩। ভাক্ত বা ভক্তবিটল সম্প্রদায়।

যাহারা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া ধর্ম্মের নামে বঞ্চনার ব্যবসায় করিয়া বেড়ায়, সেই পেশাদার গুরুদিগের ধর্ম্মাভিনয়ের প্রকার ও প্রক্রিয়া যথাসম্ভব প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহার পরে আর একটা বকধর্ম্মী সম্প্রদায়ের কথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভাক্ত বা ভক্তবিটল

নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহারা যথার্থ ধার্ম্মিকের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃত সাধুতার প্রত্যাশী নহে। ইহারা ধর্ম্ম চাহে না, লোকে ইহাদিগকে সাধু ধার্ম্মিক বলিয়া বুঝিলেই, ইহাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতৃপ্তি হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও কাহারও ধার্ম্মিক সাধু বা সজ্জনরূপে লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধিও থাকে, কেহ কেহ শুধু ধার্ম্মিকরূপে প্রতিপন্ন হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। ইহারা অনেক স্থলেই প্রণামী বা চর্ব্ব্য, চূষ্য লেহ্য পেয় আহারের কাঙ্গালী নহে। ইহারা শুধু এই চায় যে, লোকে ইহাদিগকে ভক্ত বলিয়া সম্মানও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক চরণে লুটাইয়া পড়ুক। ইহাদের তিলক, ফোঁটা, তসরের কাপড় বা রক্তচন্দনের ফোঁটা ও রুদ্রাক্ষের মালা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক ইত্যাদি বাহ্য সাজসজ্জার যথেষ্ট ঘটা থাকে, এবং ইহারা জপতপাদি ধর্ম্মের প্রদর্শন যোগ্য সমস্ত ব্যাপারই দশজনের সমক্ষে বেশ ভক্তের অভিনয়পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে ভালবাসে। এই শ্রেণীর ভক্তবিটল প্রায় সমাজের সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যেই আছে; কিন্তু অবস্থাপন্ন জমিদার, তালুকদার বা ব্যবসায়ী ধনী মহাজন শ্রেণীতেই ইহাদিগের সংখ্যা কিছু বেশী। ইঁহারা একদিকে থলিয়াতে হাত দিয়া দশ জনকে দেখাইয়া বিড় বিড় করিয়া জপ করিতে থাকেন; অন্যদিকে, বিষয় কার্য্য, মামলা মোকদ্দমার এবং কোন্ বিধবা বা কোন্ পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের সম্পত্তিটুকু কি ভাবে অনায়াসে কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার আট ঘাট বন্ধন ও যুক্তি পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইঁহাদিগের কেহ মুখে কালী কালী তারা তারা অথবা কালী-কুলকুণ্ডলিনী মা বলিয়া মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন, ও ছিপকোষ (কোষাকোষী) ফুল বেলপাতা ইত্যাদি লইয়া প্রাত্যহিক পূজার লোক দেখান জমকাল অভিনয় করেন, আর সেই সঙ্গে কোথায় লাঠিয়াল পাঠাইয়া নূতন চর বা বেদখলি জমী দখল করিবেন তাহারও পরামর্শ দিতে থাকেন—কিংবা চরমুখে কোথায় কোন্ বিধবা কোন্ কুলে কালি দিয়া কলঙ্কিনী হইয়াছে, তাহাও মিটি মিটি নেত্রে ঈষৎ হাসিয়া শ্রবণ করিয়া লন। অথবা অমুকের সর্ব্বনাশ হউক, অমুক নির্ব্বংশ হউক, এই মন্ত্রে ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। এই ভক্তবিটল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুই একটা খুব পাকা রকম দাগী চোর বা বদ্‌মায়েশ না থাকে, তা নয়, তবে তাহাদের সংখ্যা অতি কম। বিশেষতঃ আমি যে শ্রেণীর কথা বলিতেছি, উহারা এ শ্রেণী ভুক্ত নহে। যাহারা এই শ্রেণীর চিত্র পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের "নেড়া হরিদাস" পাঠ করিবেন। ধনী সম্প্রদায় ছাড়া মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে যাহারা ভক্তবিটল, তাহারা হরিসঙ্কীর্ত্তনের আসরেই দশায় পড়িয়া, কিংবা চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কিংবা সময়ে রাধাভাবে রাধার ন্যায় স্ত্রী-লোকের সাজে সাজিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়ন জলে খুব আসর মাতাইয়া তোলে; এবং এইরূপে কিছু দিনের পর, তাহারা ভক্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করে,—তখন যেখানে সেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তনে যাইয়া ভক্তের অভিনয় পূর্ব্বক সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া

প্রত্যাবর্ত্তন করে। লোকে ভক্ত বলিয়া সম্মান করুক, চরণে লুটাইয়া পড়ুক অথবা সাষ্টাঙ্গে ধূলায় গড়াগড়ি দেউক, ইহাই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা।

ভক্ত বলিয়া খ্যাতি রটিবার পরেই এই সকল দুর্ব্বল চেতাদের, কপটতার আশ্রয় লওয়া এক অপরিহার্য্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে স্বভাবতঃ যখন ভক্তির সঞ্চার হইত, তখন তাহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি ও লক্ষণও তদ্রূপ হইত ;—বিনা তদ্বিরে, বিনা চেষ্টায় আপনি হৃদয়ের ফল্গুনদী প্রেমাশ্রু-রূপে দর দর ধারায় দু নয়নে বহিত ; তৎপরে আবার যেই সেই,—পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ লোক ও সাধারণ ব্যবহার। কিন্তু ভক্ত নাম রটিবার পরে, ভক্ত বলিয়া সমাজে ভক্তি সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাওয়ার আস্বাদ পাইবার পরে ত আর এ ভাব পোষণ করা চলেনা,—তাহাকে তখন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ভক্তি বা ভক্তের অভিনয় দেখাইতে বাধ্য হইতে হয়। বর্ত্তমান সম্মান অব্যাহত রাখিতে বা উহার ক্রমপুষ্টি সাধন করিতে, সে যাহা নয়—তাহাও সে সাজিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ভক্ত হইতে দু চারিটা মুখস্থ সংস্কৃত শ্লোক ও দু চারিটা বাঁধি বোল চাল শিখিয়া সে শাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ এমন কি বেদান্তবাগীশ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। পাঠক, এখন দেখুন, সুখ্যাতির মধুমদিরা পানে লোকের মাথা কেমন বিগড়াইয়া যায়, এবং সময়ে চরিত্রের কেমন একটা অধোগতি আনিয়া ফেলে। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা ভক্ত কিংবা প্রেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করা

বিষয়ে ভূয়ো-ভূয়ো সাবধান করিয়া গিয়াছেন। শুধু হিন্দু সমাজে নয়, ব্রাহ্মসমাজেও ভক্তবিটলের সংখ্যা কম নহে। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মেরই একটী উচ্চস্তর জ্ঞানে সম্মান করি। যাঁহারা এই সমাজের আদি প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকেও আমি তাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা, বিশুদ্ধ ও নিস্বার্থ প্রেম, এবং ভক্তিপরায়ণতার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি ও শ্রদ্ধার মানস পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি; এবং এখনও যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম, তাঁহারা সকল সময়েই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এখন যথার্থ ধর্ম্মপিপাসুর সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে অনেকটা কমিয়া আসিতেছে বলিয়াই যেন আশঙ্কা হইতেছে; বোধ হয়, তৎপরির্ত্তে ফ্যাশনবীরদিগেরই আবির্ভাব বেশী মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। সঙ্গীত শ্রবণ, পোষাক পরিচ্ছদের ঘটা প্রদর্শন, হালফ্যাশনের কায়দায় চালচলন, আর চ্যায়ার টেবিল টানিয়া ভগিনীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য বিশেষ কিছু করণীয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মে যদি প্রকৃত আন্তরিকতাই না রহিল, তবে এই শ্রেণীর যুবকবৃন্দের অনুতাপের ভিতর দিয়া স্বর্গীয়জ্যোতি দর্শনের ভাণ না করাই ভাল। ধর্ম্মের ভাণ দূষণীয় হইলেও, এই সকল ভক্তবিটল অনেক স্থানে নিরীহ ও নির্দ্দোষ এবং সামান্যরূপ দোষী হইলেও, সমাজের পক্ষে তেমন মারাত্মক উপসর্গ নহে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভক্তবিটল বস্তুতঃই বড় ভয়াবহ পদার্থ। কেহ কেহ কখন কখন ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়া লোকের অন্তঃপুরে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করে এবং কালে মুগ্ধ-স্বভাবা-কুলললনাদের সঙ্গে

অবৈধ ভাবে মেলামেশা করিবার সুবিধা পায়। কেহ কেহ ভক্তের বেশে চোর বা দস্যুর গুপ্তচর রূপে সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীর খোজখবর আনিয়া লইয়া চোর দস্যুর দুরভিসন্ধি সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই হেতুই বলি, ধর্ম্মের ভাণও ভক্তি সম্পর্কে বিটলামি তিরোধান সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

ভগবৎ আদিষ্ট বা ভগবৎ অনুগৃহীত সম্প্রদায় ও তীর্থ বা দেবস্থানে কসাই বৃত্তি।

এইক্ষণ যাহাদিগের কথা বলা যাইতেছে, তাহাদিগকে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত না বলিলেও চলে। কারণ, এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশী নহে। ইহারা পেশাদার গুরুও নহে অথবা সন্মান বা শ্রদ্ধার কাঙ্গালী ভক্তবিটল শ্রেণী ভুক্তও নহে। ইহাদের ঘুষখোর বা উৎকোচভোজী ঠাকুর দেবতা লইয়া দোকানদারী বা ফাকিবাজী ব্যবসা। ইহাদ্বারা কিছু উপায় করিয়া সংসার চালাইবার বন্দোবস্ত করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। ইহারা পূর্ব্বাহ্নে কোন নিভৃত স্থানে, কোন দেবদেবী যথা—কালী, অষ্টভুজা, গোপাল, কালাচাঁদ ইত্যাদি বিগ্রহের মূর্ত্তি, মাটিরতলে, বা পুষ্করিণীর তলে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া আসে, তৎপরে অকস্মাৎ একদিন লোক সমাজে সকলের নিকট বলে যে, কালী অথবা অষ্টভুজা (অর্থাৎ যেমুর্ত্তি সে পূর্ব্বে মাটির তলে বা

পুষ্করিণীতে রাখিয়া আসিয়াছে) আমাকে গত রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন "আমি (অর্থাৎ অমুক দেব অথবা দেবা) অমুক স্থানে আছি, তুই আমাকে উঠাইয়া নিয়া রীতিমত স্থাপন পূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনার বন্দোবস্ত কর্ ; তোর্ অশেষ মঙ্গল হইবে, না করিলে তোর্ অকল্যাণ হইবে ইত্যাদি। সাধারণ লোকে যখন এই সকল কথা শোনে, তখন তাহারা উৎসাহে ও কৌতূহলে কিরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তখনই তাহারা দল বাঁধিয়া ঐ স্বপ্নপ্রাপ্ত লোককে সঙ্গে লইয়া স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যায় এবং অনুসন্ধান আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য যে, তাহারা সত্বরেই ঐ দেব বা দেবীমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া যথারীতি স্থাপনের আয়োজন উদ্যোগ করে। সাধারণের চক্ষে এইরূপ দেব দেবীর মাহাত্ম্য অনেক বেশী।

তাহারা সকলেই বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজার হুলুস্থুলু বাধাইয়া দেয়। এখন যে ধূর্ত্ত এই দেবতা পাইল, সেও তাহার দলের লোক দ্বারা সর্ব্বত্রই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাইতে প্রবৃত্ত হয়। কিরূপে অমুক বাড়ীর বড়কর্ত্তা সোণার তুলসী বা বেলপাতা দিয়া তাঁহার পুত্রের আসন্ন মৃত্যুরূপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিরূপে, অমুক স্ত্রীলোক ঠাকুরের গায় এক-গাছি সোণার অলঙ্কার দিয়া, হারাণ ছেলে ফিরে পাইয়াছেন, কিরূপে দশটাকার ভোগ দিয়া কৈবর্ত্তদের বাড়ীর বড়কর্ত্তা একটি বড় মোকদ্দমা জিতিয়াছেন, এই সকল কাহিনী জন সাধারণে কৌশলক্রমে প্রচারিত হইতে থাকে। ইহার পরে, নানা স্থান

হইতে ঠাকুরের সেবার জন্য অজস্র অর্থ ও ভোজ্য ইত্যাদি সং-গৃহীত হইতে আরম্ভ করে। আর, ঐ ধূর্ত্তেরও উদ্দিষ্ট ব্যবসা রীতিমত চলিতে থাকে। ইহাদিগের প্রতি ভগবানের এই আকস্মিক স্বপ্নে কৃপা অনেকটা আলিবাবার খোদার দুস্তির মত। ক্ষীরোদ বাবুর আলিবাবা নাটকের আলিবাবা অনেক গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়া ছিল। এই ধনপ্রাপ্তির পরে যখন কাশিম একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হ্যারে আলি, তুই এত টাকা পেলি কোথা ? তখন আলিবাবা বলিল যে, "দাদা! খোদা দিয়াছেন" তখন কাশিম অতি সন্দেহের সহিত ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিল, হাঁ খোদা দিয়াছেন! এত আমীর ওমরা প'ড়ে রইল, এই আমি প'ড়ে রইলুম, খোদা আর কেউকে পেলে না, খোদা কিনা শেষে খুঁজে খুঁজে তোর সঙ্গে দুস্তিগিরি কর্ত্তে গেল। ইহাদিগেরত খোদার সঙ্গে দুস্তি হইবার কথা কোনদিনই নাই, তবে চিরদিনই ইহাদের সয়তানের সঙ্গে দুস্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যাহাদের পেটে বড় বেশী ক্ষুধা, অত্যন্ত অভাব ও অনাটন, তাহারা লোভ সামলাইতে না পারিয়া সহজেই ধরা পড়িয়া যায়, সুতরাং ব্যবসায় ও প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। আর যাহাদের অবস্থা ভাল, হঠাৎ লোভে পড়িয়া বেশী খাইবার চেষ্টা করে না, তদ্বির তালাফীর জন্য বা বিজ্ঞাপনের জন্য রীতিমত একটা স্থায়ী Establishment রাখে, তাহাদের এই ব্যবসা বেশ চলিতে থাকে।

আজকাল যদি কোন সেবাইতের দেব দেবী সহরে বা বন্দরে স্থাপিত থাকেন, আর যদি কোন রূপে তদ্বির পূর্ব্বক উক্ত দেব

দেবীর মাহাত্ম্য কথা সুকৌশলে প্রচারদ্বারা জন-সাধারণের মনে ভক্তি বিশ্বাস একবারে সুদৃঢ় করিয়া দেওয়া যায়, তবেত আর কথাই নাই, তাহাহইলে প্রকাণ্ড মুনাফা বা আয়ের সম্পত্তি তাহার করায়ত্ত হইল বলা যাইতে পারে। একবার এই স্রোত বহিলে, আর বেগ পাইতে হয়না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার উপযোগী বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি রাখে এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম—পোনর আনা লোকেই স্রোত মুখে তৃণের ন্যায় "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" স্রোতে ভাসিয়া চলে,—মেষপালের ন্যায় যেমন দেখে, চক্ষু বুঝিয়া তেমনই করে। এই সকল দেব দেবীর মন্দিরে ঢুকিলে সাত্বিক ভাব অপেক্ষা তথাকার নানা শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সাধনের জঘন্য প্রয়াসই সর্ব্বাগ্রে দর্শকের চিত্ত ক্লিষ্ট করিয়া তোলে। যেখানে কালিকা দেবীর অর্চ্চনা হয়, সেখানকার বলিদানের নিরন্তর রুধিরসিক্ত মৃত্তিকাস্তুপীকৃত বলির মৃত পশুরক্তের দুঃসহ পূতিগন্ধ, মাছির ভন্ ভন্ শব্দ ইত্যাদি একত্র মিলিয়া শিক্ষিত দর্শকের মনে দেবস্থানে সুষমার পরিবর্ত্তে, কসাইখানার ভীষণত্বই অধিকতর রূপে আনয়ন করে। অনেক স্থলেই মানসী বলির পাঁঠার মস্তক কালীবাড়ীর ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য এবং পশুর শরীরটা, যিনি মানসী দিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্য। ইহার ফলে, কালীবাটীতে যিনি পাঁঠা কাটেন, তিনি পাঁঠার মস্তকের সঙ্গে যতদূর পরিমাণ বেশী মাংস রাখা যায় তদুদ্দেশ্যে গলার উপর কোপ মারিবার পরিবর্ত্তে পাঁঠার বক্ষ দৃষ্টে কোপ মারেন। পাঠক, ইঁহাদের এই কসাই বৃত্তির কথা চিন্তা করুন;—তীর্থস্থানের বা

দেব দেবীর, কি পীঠস্থানের মহিমা, প্রতিনিয়ত অম্লান চিত্তে এইরূপ কসাই বৃত্তি অনুষ্ঠান করিয়া, কিরূপে ইঁহারা নষ্ট করিতেছেন, তাহাও ভাবিয়া দেখুন। এই সকল স্থান কসাই খানার মত মাংস বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। যাহারা প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ ইত্যাদি ভোগ দেন, তাঁহারাও নাম মাত্র প্রসাদ পাইয়া চলিয়া আসেন। তীর্থ স্থানেই আজ কাল বদমায়েশের আড্ডা জুয়াচোরের খেলা ও বঞ্চনা ব্যবসায়ের সহস্র রকম প্রণালী।

তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের সুফল দেওয়ার অত্যাচারের কথা, মোহন্তদিগের কাম ভোগ-বিলাসিতার বিবরণ, এবং পীঠস্থানের নিকট সেবাইত বর্গের মদ্য-পানে-বিঘূর্ণিত-লোচনে তীর্থ যাত্রী-দিগের হইতে আদায় উশুলের ফিকির ফন্দি, কাহার অবিদিত? দেশের অজ্ঞানান্ধ স্ত্রী লোকেরাই এবং তত্তুল্য পুরুষেরাই এই সকল স্থানে বেশী মাতিয়া থাকেন, এবং জুয়াচোরদের ব্যবসা-যেরও দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহারা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, জমিদারী আমলাবর্গকে উৎকোচ বা ঘুষ দিয়া কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে অভ্যস্ত বা উৎসুক, তাহারাই প্রায়শঃ ঘুষ দিয়া দেবতা বশ করিবার দুরাশায় মুগ্ধ। যাহারা, কবুতর পাঁটা বা ভোগ মানস করিয়া বা ঘুষ দিয়া ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আকর্ষণ করা সম্ভবপর মনে করিয়া তদর্থ চেষ্টা করে, তাহারা কিরূপ মূর্খ ও অর্ব্বাচীন, শিক্ষিত লোকদিগকে তাহা বলিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত অধর্ম্মের লোম হর্ষণ ব্যাপারের

অনুষ্ঠান হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। সাধারণতঃ তীর্থস্থানে যেরূপ দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকদের পাকাপাকি আড্ডাই দেখা যায়, এমন আর অন্য জায়গায় দেখা যায়না। হা ধর্ম্ম! তোমার নাম করিয়া অধর্ম্মও কত প্রকারে কত নামে কত সাজে পৃথিবীর পৃষ্ঠ কলঙ্কিত করিতেছে।

হালফ্যাশনের ভিক্ষা।

অর্থাৎ

মার্জ্জিত রুচির ভিক্ষাবৃত্তি।

এ দেশে কতকগুলি লোক ধর্ম্মের নামে ভিক্ষা করিত; এখনও করে। হিন্দু বৈরাগী বৈষ্ণব, বাউল এবং মুসলমান ফকির ও মস্কিলআসান ইত্যাদি; ইহারা ভিক্ষাব্যবসায়ী। ইহাদের প্রকার, প্রক্রিয়া ও ভিক্ষাবৃত্তির অপব্যবহারের বিষয় যথাস্থানে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, আতুরও অন্নক্লিষ্ট দুঃস্থ জনেরাও প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মের নামে না হইলেও দয়ার ভিখারী রূপে লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের কথা এবং কিরূপে মাঝে মাঝে দুষ্টদুর্ব্বৃত্ত লোকেরা পঙ্গু, আতুর ও অন্ধের ভাণ করিয়া ঐ সকল কৃপার পাত্র দুঃখীদিগের প্রাপ্য অংশের উপর বাটপারি করিয়া বঞ্চনার ব্যবসায় চালাইতে অগ্রসর হয়, সে কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। আর এক রকমের ভিক্ষা—কাজীর মাগন,

মাদারের বাঁশ ও গাজনের ভিক্ষা ইত্যাদি। এই সকল ভিক্ষা ব্যবসা পুরাতন। এই সকল ভিক্ষাব্যবসায়ীর জন্য এখন আর দেশে সকলের দ্বার উন্মুক্ত নহে। অনেকেই এখন এই শ্রেণীর ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে খাটিয়া খাইবার জন্য ভাবশূন্য শুষ্ক উপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করেন এবং অন্ধ, আতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদিগকে অনাথ আশ্রম ও কুষ্ঠাগারের পথ দেখাইয়া দিয়া রিক্তহস্তে বিদায় দেন। কিন্তু হালফ্যাশনের ভিক্ষাবৃত্তি এই শ্রেণীর নহে, উহাতে দেশীয়ভাবের বিন্দুবিসর্গও পরিলক্ষিত হয় না। হালফ্যাশনের সমস্তই বিলাতী ও সাহেবী কায়দায় মার্জ্জিত রুচিতে অনুষ্ঠিত হয়; ভিক্ষাটি বাদ যাইবে কেন? ভিক্ষাও এখন বিলাতী কায়দায় হইতেছে। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকের দলে অনেক শ্রেণীর অনেক সাজের লোক দেখা যায়। কেহ বা নগ্নপদ, কেহ বা "চটী সওয়ার" কেহ বা হ্যাট-কোট বুটে সজ্জিত! কিন্তু সকলের হাতেই ভিক্ষার খাতা থাকে। ইহারা কেহ বাঙ্গালায়, কেহ ইংরাজীতে লেখা, কেহবা Typewriter দ্বারা টাইপ করা খাতা বা ভিক্ষার প্রার্থনা পত্র লইয়া বহির্গত হয়। অনেক স্থলে ইহাদের ব্যবসায়ই এই। ভিক্ষাযাচ্ঞনাপত্রে, সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, ভিক্ষুকের শোচনীয় অবস্থার কথা এবং তাহার দান পাইবার উপযুক্ততার কথা লিখিত থাকে এবং তাহার নিম্নে অনেক গুলি নাম, সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, স্বাক্ষর করা থাকে এবং নামের বিপরীত দিকে কাহারও নামে দুই টাকা, কাহারও নামে এক টাকা, কাহারও নামে আট আনা, কাহার ও নামে দুই আনা, উশুল দেওয়া

দৃষ্ট হয়। যিনি যখন যাহা দেন, তাহা প্রায় নাম স্বাক্ষর করিয়া এবং সেই দানের অঙ্ক খাতায় উল্লেখ করিয়া দেন।

এক পয়সা দান করিলেও এ কালের যুগধর্ম্মে দাতার নাম ও দানের অঙ্ক প্রকাশের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। যাঁহারা হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরিয়া আসেন, তাঁহাদিগকে আর সাধারণ ভিক্ষুক বলা চলে না। তাঁহারা ভিক্ষুক সাজে সভ্যভাবে ডাকাতি করেন। কারণ, তাঁহাদিগকে আর ২।৪।৫ টাকা দিলে চলে না। তাঁহাদের সই সুপারিসের জোর বেশী, বিদেশী বুলির কায়দা বেশী, তাঁহাদিগের বড় অঙ্ক না হইলে পেট ভরিবে কেন? স্কুলে নাম কাটা গিয়াছে বা যাহার নাম মাত্র আছে, কিন্তু রাস্তায় ঘুরিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করিয়া বেড়ানই যাহাদের প্রকৃত কাজ, এমন ছেলেরাও অনেক সময় ঐরূপ ছাপান কাগজ সাহায্যে ফুটবল বা ক্রিকেট ক্লাবের দোহাই দিয়া চাঁদা আদায় করিয়া বেড়ায়। সংবাদ লইলে বা অনুসন্ধান করিলে তাহাদের ক্লাবের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। বালকদের কথা দূরে থাকুক, সভ্যতার আবরণে গা ঢাকা দিয়া দেশ-সেবা বা দীন দুঃখী সেবার নাম দিয়া সমাজে যে সকল অর্থ চাঁদার খাতা দ্বারা সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যয় বিষয়ে সন্তোষজনক হিসাব চাহিলে অনেকস্থলেই পাওয়া যায় না। ফল কথা, অর্থের অনেক সময় অপব্যয় হইয়া যায়। যাঁহাদিগের কৃতিত্বে অথবা যাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঈদৃশ অর্থের কিয়দংশ অপব্যয়িত হয়, তাঁহারা প্রায়ই দেশের মান্য গণ্য লোক কিংবা দেশের নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং কেহ কোন কথা তোলে না—মনের ক্ষোভ নীরবে হজম করিয়া ফেলে।

দেশের কল্যাণার্থ সংগৃহীত অর্থ হইতে যে কত টাকা সোডা, লিমনেড্, বরফ, পান, চুরট, মিঠাই মণ্ডা এবং সিগারেটের ধূমের সহিত উড়িয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহাদের ভোগে এই সকল ব্যয়িত হয়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সক্ষমব্যক্তি—তাঁহারা যে কেন সাধরণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ যাহা অন্য দশ প্রকারে দেশের কাজে লাগিতে পারিত, নিজদের বিলাসভোগে ব্যয়িত করিয়া তৈলাক্ত মস্তকে তৈল মাখিয়া থাকেন, তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অবশ্যই সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, দেশের সমস্ত জন-প্রিয়-লোক-নায়কই, সাধারণের অর্থ অপব্যয়িত হইতে দেখিয়াও, উদাসীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং তৎপ্রতিকারে যথোপযুক্ত যত্ন চেষ্টা করেন না; অথবা তাঁহারা নিজেরাই অসদভিপ্রায়ে ইহা করেন, আমি এমন কথা বলিতেছিনা। হয়ত অনেকস্থলেই তাঁহাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া নিম্নস্থ বিশ্বাসভাজনজনেরা বিশ্বাসভঙ্গরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের সুনাম ও নির্ম্মলযশে দুরপনেয় কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিয়া সারিয়া যায়, কেহই তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক মনে করেন না। এই লজ্জাজনক বিপরিণামের প্রতি সুযোগ্য নেতৃ-পুরুষ ও দেশের সজ্জনদিগের দৃষ্টি আকর্ষণার্থই সংক্ষেপে এ স্থলে ইহার উল্লেখ করা হইল।

চাঁদার খাতা।

স্কুলের বালক বলিয়া কেন, আজ কাল চাঁদার খাতা সর্ব্বত্রই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বগ্রাসী ভিক্ষারঝুলি হইল চাঁদার খাতা।

চাঁদার খাতার মত পদার্থ অন্য কোন যুগে কখনও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কল্পিত হয় নাই। দশলক্ষ কেন দান না কর, ঝুলির মুখ বন্ধ হইবার নহে ;—এই ঝুলির অন্য নাম "আরও চাই"। যেখানে মধু-চক্র, সেই খানেই এই চাঁদার খাতার মৌমাছি ; ইহাদের নানা মূর্ত্তি, নানারূপ কৌশল, নানারূপ গুন্ গুন্ ধ্বনি। কখনও বা কাণের নিকট ঝুকিয়া পড়িয়া, প্রিয়তমার মৃদু মধুর বাণীর ন্যায়, প্রিয়ভাষী সুচতুর মৌমাছি, চাঁদার খাতার মধু আহরণ করিতে চেষ্টা পায়,—কখন বা বক্তৃতার ওজস্বিনী ভাষায় শ্রোতার মন বিগলিত করিয়া, চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্ক লিখিয়া, সহি করাইয়া মধুলুণ্ঠন করিয়া থাকে। যাহারা ধনী অথচ বিদ্যাবুদ্ধি অভাবে "গোবর গণেশ", অন্য সময়ে ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখিলেও, চাঁদার খাতায় সই করাইবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতামণ্ডপে তাহাদিগকে সকলের সম্মুখের লাইনে যত্নপূর্ব্বক বসান হয়। বক্তৃতা অন্তেই চাঁদার খাতা লইয়া নেতৃবর্গ তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চাঁদার খাতা সই করাইয়া একটা মোটা দাগের অঙ্ক আদায় করিয়া লয়। ইহা ছাড়া যে কত ভাবের কত নামের চাঁদার খাতা অর্থসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বশ্রেণীর দুঃখ ও অভাব মোচন কল্পে যাহা চাঁদার খাতায় দেওয়া হয়, তাহার নিশ্চয়ই একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু বিলাসপ্রবৃত্তির সন্তর্পণে যখন আবাহন ও বিসর্জ্জনী-অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনা, ঘোরদৌড়, বল-পার্টি এমন কি পুলিস থানার বারোয়ারী কালীপূজা বা আদালতের আমলা বা প্যাদাগণের সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাই খেমটা নাচের আড়ম্বরে আহুতিদানের

নিমিত্তও চাঁদা যোগাইতে হয়, তখন অত্যন্ত পুরুচর্ম্মেও একটু গাত্রদাহ হইবার কথা। যেখানেই কোন না কোন রূপ বাধ্যবাধকতার ভাব,—যেখানেই একের মন রক্ষা করা অন্যের বৈষয়িক হিসাবে অথবা লাঞ্ছনার ভয়ে প্রয়োজন, সেখানেই হাসিয়া হউক, অথবা চোখ রাঙ্গাইয়া হউক, চাঁদার খাতা চাঁদা আদায় করিয়া লয়। সকলেই জানেন, উপরিস্থ ব্যক্তির অনুরোধই নিম্নস্থ ব্যক্তির পক্ষে হুকুম বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং উপরিস্থ কর্ম্মচারী হাকিম বা মনিবের প্রীত্যর্থে অধীন লোকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চাঁদার খাতায় অনেক সময় সই করিতে হয়। অনেক জমিদার, তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ, পিতৃশ্রাদ্ধ, বাড়ীতে চকমিলান দালান নির্ম্মাণ, সখের থিয়েটর, বাইখেমটা নাচ কিম্বা উপাধি লাভ সম্পর্কে তদ্বিরী ব্যয়ার্থে নিরীহ প্রজার উপর চাঁদা মাথট ধরিয়া রক্ত শোষণ করেন। আবার কেহ বা তাঁহাদের ভোগ-বিলাসিতার অপব্যয় জনিত দেনা শোধ দিবার নিমিত্ত নিরীহ প্রজার উপর সেই ভার চাপাইয়া দেন। এই চাঁদা যখন সাধারণ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের উপর ধার্য্য হয় তখন ইহা নামান্তর ধারণ করে। তখন ইহার নাম হয়, "পরবী" "তহরী" বা দস্তুরী বা বক্‌সিস্ ইত্যাদি। দোল দুর্গোৎসব কিংবা বড়দিন উপলক্ষে কাছারীর আমলা, প্যাদা, হাকিম বাবুদের চাপরাসী, স্থানীয় পুলিশ থানার কনেষ্টবল, এমন কি, পোষ্টাফিসের পিয়নের পর্য্যন্ত পর্‌বির ধাক্কা আজকাল সামলাইয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়। তাহার পর মামলা

জিতিলে বা টেলিগ্রাফে সুখবর আসিলে চাপরাসী এবং পিয়ন উভয়কেই বক্‌সিস্ না দিলে চলে না। এতদ্ভিন্ন রেলপথে ভ্রমণকালে গাড়ী রিজার্ভ্ করিলে ষ্টেশনের কর্ম্মচারিদের দক্ষিণা দিতে হয়। অবশ্য, এই সকলে যদিও বাধ্যবাধকতা নাই, তথাপি ভদ্রলোকের ছেলে হাত পাতিলে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও কিছু না দিয়া পারা যায় না। শুনিয়াছি, একবার আমারই একটি আত্মীয় ভদ্রলোক ষ্টেশনে যাইয়া কোন স্থানে টেলিগ্রাফ করিবার পর, তথাকার একটি ভদ্রলোক কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন,—কিন্তু আমার আত্মীয়টি এই আট আনার টেলিগ্রাফ করিয়া কেন বখসিস্ দিতে হইবে তাহার সুসঙ্গত কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ভদ্রলোক চাহিতেছেন—না দিলেও নয়, একটি দু-আনী তাঁহার হাতে দিয়া লজ্জায় তাঁহার দিকে মুখ আর না তুলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকটিও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। দু-আনা ভদ্রলোকের হাতে তুলিয়া দিতে কিরূপ লজ্জা বোধ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এখন বুঝুন, তহরী দস্তুরী পাইবার রোখ্ সকল সমাজেই কেমন মারাত্মক ব্যাধিরূপে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সহরে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া, মাছ তরকারী কিংবা অন্য জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে বাজারসরকার অথবা ভৃত্যমহাশয়েরা তহরী দস্তুরী আদায় করিয়া থাকেন। মোট কথা, এ যুগে তহরী, দস্তুরী, চাঁদা, মাথট, পরবী ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই, এমন কোন কর্ম্ম বা ভাল মন্দ এমন কোন অনুষ্ঠানই নাই। এই অবস্থার কোন উপযুক্ত প্রতিকার আছে কি? ঘুষের

এই বিশ্বব্যাপী প্রচলনের সংবাদ না রাখেন কে? সকলেই কোন না কোন সময়ে, কাহারও না কহারও নিকটে এ বিষয়ে একেবারে হাতে কলমে ভুক্তভোগী হইয়াছেন। ঘুষ দেন নাই এমন লোক অতি বিরল। "ঘুষ" নামটা বড় ভাল নয়,—কাহাকেও ঘুষ দিবার কথা বলিলে তিনি হয়ত অপমান বোধ করিবেন; কাজেই তাঁহাকে সভ্যভাবে মোলায়েম করিয়া বলিতে হয় যে, আপনাকে "পান খাইবার নিমিত্ত আমরা ইহা দিলাম"। ঘুষে কার্য্য না হয়, এমন স্থান বা বিষয় প্রায় নাই বলিলেও চলে। অনেক সময় মোকদ্দমার তদ্বির করিতে "ঘুষ" ওরফে "ভাল-মানুষি" অপরিহার্য্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা সরকারী বা ব্যক্তি বিশেষের দালান এমারতের কাজ খারাপ করিয়া, রাজমিস্ত্রী বা Contractorদের নিকটে ঘুষ খাইয়া থাকেন। ফলে তাদৃশ নির্ম্মিত দালান কোঠা অতি সত্বরে ভাঙ্গিয়া চূরমার হয়।

আবার কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার জলের কলের কাজে, মিউনিসিপালিটির কাজে, পূর্ত্তবিভাগের কাজে ঘুষ খাইয়া একেবারে লাল হইয়া যান—আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া উঠেন। নতুবা আজ কালের এই কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে পাঁচ সাতশ টাকার চাকুরী করিয়া যাঁহারা নবাবী চালে চলিয়া দুলাখ পাঁচলাখ টাকা ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই সঞ্চয় করেন, তাঁহাদের আয়ের সন্তোষ জনক অন্য কোন পথ সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত, নিঃসন্দেহরূপে তাঁহাদিগকে চোর বা

প্রবঞ্চক বলিয়া সাব্যস্ত করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আজ কালের দিনে ঐ আয়ে, এবং এই বাবুগিরির চালে চলিয়া, এত অর্থ সঞ্চয় চুরি ব্যতিরেকে আর কিছুতে হওয়া সম্ভবপর কি না, পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গবর্ণমেণ্টের কমিসরিয়েট্‌বিভাগও চুরির এক প্রধান আড্ডা। অনেক লোক এই বিভাগে প্রবেশ করিয়া চুরির প্রসাদাৎ সামান্য বেতন ভোগী চাকর হইতে একেবারে মহাধনী হইয়া রাজা রায়বাহাদুর হইয়া পড়েন। পুলিশ বিভাগেও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা, উৎকোচ গ্রহণের অবিচলিত অধ্যবসায়ে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিচারে দণ্ডিত হইয়া, শ্রীঘরে প্রেরিত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে “পুলিশ” ও “ঘুষ গ্রহণ” এই দুটি শব্দ প্রায় অন্বর্থতাবাচক, অভেদাত্মক, এই অতিরঞ্জিত বিশ্বব্যাপক কুখ্যাতি রটাইবার ও তাহা লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার সহায়তা করিতেছেন! ফলে, কতিপয় দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকদের জন্য সমগ্র পুলিশ বিভাগের দুর্নাম হয়। পুলিশ বিভাগের কলঙ্ক স্বরূপ এই শ্রেণীর লোকদের ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত, এত বোধ হয় আর কোন বিভাগে নয়। কারণ, সংসারে যত শ্রেণীর অপকর্ম্ম হয়, তাহার প্রথম তদন্ত ভার ইহাদের উপরেই থাকে। ইহারা আবার ঘুষ না পাইলে অনেক সময়ে সত্য রিপোর্ট দিতেও প্রস্তুত হয় না; ফলে ইহারা দোষী কি নির্দ্দোষ, দুই পক্ষ হইতেই ঘুষ খাইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, যে বেশী ঘুষ দিতে পারে, তাহারই অনুকূলে রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাজা মহারাজা ও জমিদারের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকে এইরূপ ঘুষ, ওরফে "ভালমানুষি" ওরফে "পান খাইবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ" কিংবা বারবরদারি গ্রহণ করিয়া প্রার্থীর মতলব হাসিল করিয়া দেন। অনেক স্থান এমন আছে যে, তাঁহাদের মনস্তুষ্টি না করিতে পারিলে, খোদ কর্ত্তার নিকট কাহারও ঘেষাই অসম্ভব। গজারিগর পত্তন, জমিপত্তন, আগতখারিজ, জবর দখল সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া, মূল্যহীন সম্পত্তি রেহাণ রাখিয়া জমিদার সরকার হইতে ঋণদান বা খরিদ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মেই তাহাদের "ভাল মানুষি" গ্রহণ করিবার সুযোগ হয়। অর্থাৎ "স্বার্থসাধন" বা নিষ্পেষণ হইতে পরিত্রাণ, এই উভয়বিধ অবস্থাতেই তাঁহারা সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট হইতে প্রণামী আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। প্রজাবর্গ অনেক সময়ে মূল মালিককে না দিয়া, জমিদারের বা মহাজনের পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত, যথেচ্ছাচারী ম্যানেজার, নায়েব বা দেওয়ান অথবা অন্য কর্ম্মচারীকেই নজর, ফল মূল, দধি, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি সময় সময় স্বার্থসাধন উদেশ্যে ভেট দিয়া তাহার বা তাহাদের প্রীতি-বর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পায়, তাহারাও এবংবিধ পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া জমিদার বা মহাজনের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া তাহাদেরই স্বার্থ উদ্ধার করিয়া দেন। এইরূপে অনেক স্থলেই সংসারে "পরের ধনে পোদ্দারি" হইয়া থাকে। তাঁহারা তহরী দস্তুরী সকল সময় না হইলেও কোন কোন সময়ে উহা ঘুষেরই নামান্তর রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন কি, আজ কাল কোন কোন স্থলে শিক্ষাবিভাগেও ঘুষ দিয়া পুস্তক পাঠ্য করাইতে হয়।

অনেক ডাক্তার ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য দিয়া কিংবা খুনী আসামীকে বাচাইবাব জন্য ফিকির ফন্দী করিয়া বিলক্ষণ ঘুষ খান।

ঘুষের প্রভাবে ইঁহারা কাছারীতে ভাল মানুষকে পাগল, এবং প্রকৃত পাগলকে ভালমানুষ রূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। ঘুষের ঝনৎকারে ইঁহাদের নিকট হইতে মৃতকল্প-রোগীও, সুস্থকায় সবল এবং তরুণবয়স্ক বলিয়া জীবন বীমা করার জন্য সার্টিফিকেট্ পায়। আজ কাল অনেকস্থলে এমন হইয়াছে যে, ঘুষ ব্যতিরেকে চাকুরীর পর্য্যন্ত যোগাড় হয় না। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, ঘুষ সকল সময়েই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্নরূপ ধারণ করে। বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে বিশেষ কোন কর্ম্মে উৎসর্গ, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী, বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার, খাসী, পাঁঠা, মুরগী, ডিম্ব, ফল মূল ভেট, এমন কি ব্যক্তিবিশেষে এক হাড়ি ঘী বা মধু বা এক পাতিল দধিও ঘুষ রূপে প্রদত্ত হয়। মোট কথা, চাঁদির জুতা যে ভাবেই আর যে রূপেই মার না কেন, মস্তক অবনত না করে এরূপ লোক অতি বিরল। ছোটকে পাঁচ, আর বড়কে পাঁচ লাখ বা কোটি এই প্রভেদ। এইরূপে একটি দুইটি করিয়া, আর কত উল্লেখ করিব? কোন কোন হাকিম প্রভুর নিকটে অনেক তদ্বিরবীর চালাক বাঙ্গালী বাবু রামপাল বা মুন্সীগঞ্জ হইতে রীতিমত কদলী সরবরাহ পূর্ব্বক অনেক মতলব হাসিল করিয়া থাকেন। ফলে, এই কদলীর প্রতিযোগিতায় অনেক কদলীবিহীন উপযুক্ত লোক

বিষয়ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হটিয়া যান। কোন কোন ঘটিরাম ডিপুটি হোটেলে, মদ্য মাংস কারি কাট্‌লেট্‌ প্রভাবে বিচার বিভ্রাট করিয়া বসেন। পত্রিকাওয়ালা বড়লোকদের নিকট হইতে সুখ্যাতি বা বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার কল্পে সময় সময় বিলক্ষণ ঘুষ পাইয়া থাকেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াও অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কোন কোন উকিল নাকি দুই পক্ষেই ওকালতি করিয়া দেড়া রোজগার করেন। এক পক্ষে প্রকাশ্যে অন্য পক্ষে অপ্রকাশ্যে কার্য্য করেন! ঘুষে ধনী লোকের সুবিধা, গরীবের প্রাণান্ত। আমি যে সকল বিভাগের কথা উল্লেখ করিলাম, সে সকল বিভাগে প্রকৃত সৎলোক না আছেন এমন নয়। তাঁহারা নৈতিক চরিত্রে আদর্শস্থানীয় ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদৃশ উন্নতমনা লোকদিগের সংখ্যা অতি বিরল।

ফাকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়ের এলাকা বা কার্য্যক্ষেত্র।

যেখানে মধু, সেইখানেই মৌমাছি ; সেইখানেই মধু-মুগ্ধ মধু-লিহের গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি ও লেলিহান রসনা। মধু নাই কোথায় ? পদ্ম, গন্ধরাজ গোলাপ প্রভৃতি বড় বড় ফুলেও যেমন মধুর প্রবাহ খেলে, তেমন বেলী, বকুল, যূঁই, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ফুলের বুকেও উহার ছিটা ফোঁটা থাকে।

বড় বড় মধুকর গুণগানে দিগ্‌বলয় মুখরিত করিয়া পদ্মপুকুর বা গোলাপ বাগান আলোড়িত করিয়া তোলে; আবার ক্ষুদ্র মৌমাছি ক্ষীণস্বরে গুণ গান করিয়া যূঁই বা চামেলী ফুলে চুমুকদিয়াই উহাদিগের ক্ষুদ্র মধুচক্রের জন্য মধু সঞ্চয় করিয়া লয়।

সাংসারিক ব্যবসায়ী মানুষ-মধুকরের মধু পুষ্পমধু নহে, তাহাদের মধু—অর্থ। যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে অর্থের ঝনৎকার,—যেখানে ভোগবিলাসের নানারূপ উপাদান,—অপব্যয়ের শত সহস্র পথ উন্মুক্ত,—সেইখানেই বঞ্চনা বা প্রতারণা ব্যবসায়ী ভৃঙ্গবৃন্দের দলে দলে আবির্ভাব। ইহাদের এলাকা বা কার্য্যক্ষেত্র অর্থাৎ অর্থ শোষণের কেন্দ্র সীমাবদ্ধ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নহে; যেখানে ইহাদের জন্য প্রবেশ-দ্বার খোলা থাকে, সেইখানেই ইহারা আপনাদিগের ব্যবসায়ের পসরা খুলিয়া বসে। ইহাদের বিস্তৃত কারবারের একস্থান রাজা, মহারাজা, জমিদার, ধনশালী ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতির নিকটে;—অন্যস্থান—নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের মহলে। ধনী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে, এক এক থাবায় দশ বিশ পঞ্চাশ, শত বা সহস্র করিয়া উঠে, আর নির্ব্বোধ জনসাধারণের নিকট হইতে তিলে তিলে তাল করিয়া লইতে হয়। ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ব্যক্তিগত বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত কতিপয় শ্রেণী আছে। আমি ক্রমে তাহাদের কথা, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর প্রতারকের পক্ষে কোন্ কোন্ লক্ষণযুক্ত অর্থ বিত্তশালী ব্যক্তি সহজসাধ্য শিকাররূপে অনায়াসে

চাপিয়া ধরিবার উপযুক্ত, সংক্ষেপে তাহাও বলিতেছি। ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল আছেন—যাঁহারা একেবারে "নিরেট" বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন,—কিন্তু তোষামোদ প্রিয় কেহ যদি ঠাট্টা করিয়াও তাঁহাদের উপর নানাপ্রকার অসম্ভবরূপ গুণ বা "বড়মানষির" আরোপ করে, এই সম্প্রদায়ের ধনীগণ তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সত্য বলিয়া মনে করিয়া ভাবাবেশে গলিয়া পড়েন। ইঁহাদের শরীর সাধারণতঃ স্থূল মাংস পিণ্ডের ন্যায় "আলুচেরা," নিষ্প্রভ চক্ষু, তৈলাক্তচর্ম্ম পুরু মুখশ্রী, মস্তক অনেকটা কাবুলি বেদানা ফলের ন্যায়। উপাধির আশা দেখাইয়া বা খুব মোটা রকমের খোস্‌নামি করিয়া, একটু সুরসুরি দিলেই ইঁহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে ভস্মমাখা সাধু সন্ন্যাসীদের পসার কম নহে। ঘিউ ময়দার বেশ সুব্যবস্থা হয়। বাড়ীর ইষ্টদেব গুরুমহাশয়েরাও সময়ে ইঁহাদের নিকট হইতে সোণার যজ্ঞোপবীত আদায় করিয়া থাকেন। গুরু বা পুরোহিত বংশের দুই একটি বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য দ্বার পণ্ডিতরূপে ইঁহাদিগের গৃহে বেশ আধিপত্য করিয়া লন। অনেকের বৈষয়িক প্রয়োজন তাঁহাদিগকে হাত করিতে পারিলে অনায়াসে সিদ্ধ হয়। অন্য সময়ে সম্মানের চক্ষে না দেখিলেও যখন বিশেষ কোন চাঁদা বা মাথট সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে, তখন দেশের নেতৃবর্গ সভা সমিতি করিয়া ইঁহাদিগকে সকলের সম্মুখের লাইনে বসাইয়া বক্তৃতা অন্তে, চাঁদার বহি সহি করাইয়া লন। ভগবান্ ইঁহাদিগকে মানসিক

সম্পদ্, বুদ্ধি প্রভৃতি না দিয়া থাকিলেও ভাগ্যটা যথেষ্টই দিয়াছেন। ইঁহারা বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, সময়ে সময়ে যশোলাভ কামনায় যথেষ্টই দান করেন। কিন্তু প্রায়ই বুদ্ধির দোষে পরিণামে যশের পরিবর্ত্তে অপযশই লাভ হইয়া থাকে। স্থূল বুদ্ধির চরমে উঠিয়া আপনাদের খোসনামি বাহির করিবার জন্য ইঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহা শুনিলে কাহারও লজ্জা বোধ বা অধরে বিদ্রূপের হাসি বিকাশ না হইয়া পারে না।

ইহাদের মধ্যে যাহারা শাক্ত, তাহাদের বিশ্বাস বলি, দিবার পশু মহিষ অথবা পাঠার "ছ্রেঙ্গ" ("শৃঙ্গ") যত বড় হইবে দেবীর প্রীতিও ততদূর হইবে। কাজেই দেবীপূজার পূর্ব্বেই আগ্রহের সহিত সংবাদ লইতে থাকেন "মহিষের শৃঙ্গটা কত বড়"। আর যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের ওখানে একটি জপের থলি ও জপের মালা লইয়া বসিলেই দু'বেলা আহারের সংস্থান হইল। অনেক ধূর্ত্ত এইরূপে তথায় যুটিয়া থাকে। এবং তুলসীর মালা ও তিলকের বলে অনেক ভণ্ড তপস্বী মণ্ডলাকারে আপন আস্তানার যোগাড় করিয়া লয়। আকারে প্রকারে এই শ্রেণীর ধনিগণ স্থূল মংসপিণ্ড বা জড় ভরতের মত,—বোধ হয়, ইহারা কলির কচ্ছপ অবতার। ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা একটু হালফ্যাশনের বাতাস পাইয়াছেন। কিন্তু, বাল্যকালে অভিভাবক না থাকার দরুণেই হউক, আর নিজের দোষেই হউক, লেখাপড়া অতি সামান্যই হইয়াছে। কষ্টে ইংরেজীতে নাম

স্বাক্ষর করিতে পারেন। কিন্তু যে কলম দ্বারা তাঁহারা একবার নাম সই করেন, সেই কলমের নিব না বদ্‌লাইলে আর কাহারও পক্ষে তদ্দ্বারা লিপিকার্য্য সম্পন্ন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ তাঁহাদের বিদ্যার তেজে এক আঁখরেই কলম ভোতা হইয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহাদের কলমের সেই সামান্য সংস্পর্শেই কাগজের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। এসকল হইলেও তাঁহারা কোচান ঢাকাই কাপড়ের উপর "কলার" "নেক্‌টাই" দিয়া ইঙ্গ-বঙ্গ ফ্যাশনের বা ফুলদার বা চুমকির কাজকরা ঢাকাই ফ্যাশনের জামা গায় দিয়া সৌখীন নাগরিকের মদনমোহন বা রমণীরঞ্জন মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহাদের বাহিরের "বিরাজমোহন" সাজের খোলস ব্যতীত মধ্যে প্রায়শঃ বিশেষ কোন সার পদার্থ থাকে না। তাঁহারা আধুনিক ফ্যাশনের চুল ছাটাইয়া, টেরীর বাহার দিয়া, পাম-সু পায়ে দিয়া, পান চিবাইয়া, সিগারেট ফুকিয়া, কি সময়ে অকারণে সোণার চস্‌মা চোখে লাগাইয়া, মুখে দুই চারিটা "Fool" "Nonsense" শব্দ বলিয়া, বিনা কারণে ক্ষিপ্রগতিতে কায়দা করিয়া চলিয়া, ইংরাজী ভাষার অভিজ্ঞতার অভাব, বুদ্ধির অভাব এবং কর্ম্মশক্তির অভাব লোকচক্ষুর নিকট সারিয়া লইতে সততই প্রয়াসী। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস যে,—এই ভাবে চলিলে, সকলেই বুঝিবে, তাঁহারা বেকুব নহেন,—বড় চালাক; মূর্খ নহেন,—ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুপ্রবিষ্ট, এবং এক চড়ে সাতবার মৃত্যু হওয়ার উপযোগী দৈহিক স্বাস্থ্য থাকিলেও বলবান্ বলিয়া পরিচিত হইতে

পারিবেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই নাচ গান, ইয়ারদোস্ত থিয়েটার, মদ্য, মাংস ও এতৎসঙ্গে আরও দুই একটা উপসর্গে বেশ রুচি থাকে। মাথার উপর অভিভাবক না থাকাতে কাঁচা বাঁশে অতি শীঘ্রই ঘুণে ধরে। ফলে, প্রায় সকল শ্রেণীর প্রবঞ্চনা ব্যবসায়ীরাই তাঁহাদের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খায়। কোন একটা হুজুগের বুদ্ধি মাথায় উঠিলেই লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী তাহাতে নানারূপ সায় দিয়া মাত্রা চড়াইয়া দেয়। যত ফাজিল, বখাটে, অকর্ম্মা, বদমাশ্ ও মতলববাজদিগের দ্বারাই এই ইয়ারমণ্ডলী সংগঠিত হয়। কিন্তু অতি গুপ্তভাবে, সাধারণের অলক্ষিতে, শিক্ষিত সমাজেরও কতকগুলি লোক "শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে" মিশিতে আসেন।

এই মধুলুব্ধ গুপ্ত ভলণ্টিয়ার বা স্বয়মিচ্ছু ইয়ার দলে না থাকেন কে? খুঁজিলে বা সন্ধান লইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের কেহ কেহ বেলা এগারটার পরে শামলা মাথায় দিয়া, সরুভাবে-ভাজান ইস্তিরী করা চাদর দ্বারা বুকের উপর ক্রস্ (Cross) বা পূরণ চিহ্ন রচনা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বা চুরুট টানিতে টানিতে কাছারীর এজলাসে২ ছুটা ছুটি করিতেছেন, কেহ কেহ বা স্বয়ং নড়িলেও যার হুকুম নড়ে না সেই হাকিমের উচ্চ মস্‌নদে আসীন হইয়া—নৈশ-আমোদ জনিত জাগরণের পরে নিদ্রার স্বাভাবিক দাবিতে ডিক্রিদিয়া, জবানবন্দি বা সওয়াল জবাব শুনিতে শুনিতে একটু ঝিমুটি কাটিয়া লইতেছেন, কেহ কেহ বা স্কুলের কেদারায় হেলান দিয়া,

ছাত্রদিগকে হস্তলিপি অভ্যাসে নিয়োগপূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন এবং কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি ভোরে প্রাতরাশের ব্যাপার সারিয়া লইয়া এক পকেটে থার্ম্মোমিটার ও ষ্টেথিস্কোপ এবং অন্য পকেটে নিজের বাক্স হইতে কয়েকটি টাকা ফেলিয়া, টাকার ঝনৎকার রব সহ বাসা হইতে বহির্গত হইয়া, স্থানে স্থানে রোগীর নীরবকক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর পদে আসীন আছেন। তাই বলি এ দলে না থাকেন কে? কিন্তু তাঁহারা মনে বেশ বুঝেন যে, সাধারণের জ্ঞাতসারে এই দলে মিশা বড়ই লজ্জাজনক—নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সর্ব্বসাধারণের নিকটেই অত্যন্ত গৌরব-হানিকর। কিন্তু শিক্ষিত হইলেই ত আর সকলের মজা লুটিবার সখটুক চলিয়া যায় না। তাঁহাদিগের কাহারও সখ গোবেচারী ধনীযুবকের যুড়িগাড়ী বা মটরকারখানি দৌড়ান, কাহারও আকাঙ্ক্ষা যে, উক্ত যুবকের টেবিলে বসিয়া মদ্য মাংসের শ্রাদ্ধ কিংবা প্রাইভেট্ বাইখেম্টার মজলিসে বসিয়া আমোদ স্ফূর্ত্তি বা আড্ডা জমাইয়া প্রাণের চিরসঞ্চিত লুক্কায়িত বুভুক্ষার তৃপ্তি করা। কাহারও সখ যে, উহাদের স্কন্ধে চাঁপিয়া নানা দেশ ভ্রমণের আমোদ উপভোগ বা ফুটবল বা টেনিসক্লব বা "Reading club" নামে, ইয়ারকির আড্ডা প্রতিষ্ঠা করিয়া আসর গুল্জার করা ইত্যাদি। সকলের তো আর এই সকল প্রাণের লুকান সখ্ অর্থের অভাব হেতুই বল, কিংবা বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে অসম্ভব বলিয়াই বল, মিটাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে না। কাজেই তাঁহারা "পালখে

জল না লাগে” এই ভাবে অলক্ষিতে তথায় ডুব দিয়া জল খান। আর ঐ সোণার “চালকুমড়াগুলি” মনে করে যে, আমরা এমন সব লোকের সঙ্গে বসিয়া বা এক হুঁকায় তামাক খাইয়া কৃতার্থ হইলাম। যাঁহারা এইরূপে এই সকল দলে মিশিয়া পরস্মৈপদে নিজেদের ভোগবিলাসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া থাকেন এবং সাবধানতার সহিত নিজকে তথায় প্রবেশ কালে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত পদোচিত সম্মানটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্যই নিজকে বড়ই চালাক বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া লন। বিনা ব্যয়ে পরের মাথায় হাত বুলাইয়া সখ মিটাইতে পারিলেই যে আজ কালের দিনে চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য ও প্রশংসিত হওয়া যায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঈদৃশ ধনীদিগের থিয়েটার করার সখ হইলেই অমনি কলিকাতা হইতে নাট্যাচার্য্যনামে একনম্বরের কতকগুলি বোম্বেটে অগ্রিম দাদন স্বরূপ বিলক্ষণরূপে কিছু হস্তগত করিয়া উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসে। অভিনেতৃ আসে, অভিনেতৃদের কুটুম্বের কুটুম্ব তস্য কুটুম্ব রাজার উপচারে পরের উপর খাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কনসার্টপার্টির শুভাগমন হয়, এবং সিন্-চিত্রকর আসিয়াও গোঁফে তা দিয়া বসিয়া যায়। ইহারা কএক দিন পুষ্করিণীর বড় রুই, কাতলা মাছ, নধরদেহ অজ বা কুক্কুটমাংস, জল খাবার মোহনভোগ, লুচি সন্দেশ ইত্যাদি বিলক্ষণরূপে ধ্বংস করিয়া নানারূপে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় করাইয়া, নিজেদের আঠার আনা বুঝ

বুঝিয়া, দু'চারিদিন নাটক করিয়া সময় বুঝিয়া পীঠটান দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

সম্প্রতি আবার ইঁহাদের এক হালফ্যাশনের বালাই যুটিয়াছে, ইহার নাম ফুটবল বা ক্রিকেট ক্লাব। কেহ ভুলেও মনে করিবেন না, আমি কোনরূপেও শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা, ফুটবল বা ক্রিকেট প্রভৃতি নানারূপ স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াকৌতুকের বিদ্বেষী। আমি এই সকল শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা মানুষের নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু সাধারণ স্কুল এবং কলেজে যে সকল ক্রিকেট ও ফুটবল ক্লাব থাকে, তাহার সহিত আমাদের এই ধনীসম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ক্লাবের একটুকু পার্থক্য আছে। স্কুলের বালকেরা সকলে মিলিয়া চাঁদা দেয় ও শুধুই খেলা করে। কিন্তু বিলাতী কায়দায় রাজা মহারাজাদের অনুকরণে, আমাদের এই ধনী যুবকেরা যে ক্লাব করেন, তাহাতে খেলার সঙ্গে সঙ্গে পান চুরুট সিগারেটের আড্ডাই বেশী হইয়া থাকে। খেলোয়ারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কারি কাটলেট্, মিঠাই মণ্ডা, সোডা লেমনেড্, পান চুরুট অনেক সময়েই মজুত থাকে; এমন কি, নৈশ-আমোদের জন্য সময় সময় নাটকের টিকেটও ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। পাঠক কাজেই বুঝিতে পারেন যে, এই শ্রেণীর ক্লাবে ব্যায়াম বা খেলার অনুশীলন অপেক্ষা ইয়ারকি ও বখামিরই অনুশীলন সমধিক মাত্রায় হইয়া থাকে! ফলে, প্রকারান্তরে ইহাতে ছেলেদের মাথা খাওয়া হয় এবং উহাদের কতকগুলি কু-অভ্যাস অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই দলে মিশিলে অনেক ছেলেরই

পড়াশুনা লোপ হয়; যাহাদের একেবারে লোপ না হয়, তাহারাও প্রায়শঃ তিন চারি বার চেষ্টার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। এইরূপে যথেষ্ট অর্থ অকারণে এবং পর-অপকারে ব্যয়িত হয়। সহরের যত রকমের ফাকিব্যবসায়ী সকলেই সাধ্যানুরূপ জোঁকের মত ইঁহাদের পিছে লাগিয়া থাকে এবং প্রতিপদেই তাহাদিগের কিছু না কিছু উপার্জ্জন হয়। ইহারা যখন রাস্তা দিয়া চলে, তখন ধূমকেতুর পুচ্ছের মত ইহাদের পশ্চাতে ইয়ারকিতে পটু বখাটে ছোড়াদের এক বহর লাগা থাকে—এবং, ইহাদের এই ভাবের গমন সকলেরই দৃষ্টি আর্কষণ করে। এইরূপে "যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধন ক্ষয়ম্" এই মহাবাক্যের সার্থকতা হয়। সর্ব্বদা এই ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাতে এই শ্রেণীর ধনীযুবকদের বিন্দুমাত্র নিজেদের বিষয় কার্য্য বুঝিবার শক্তি জন্মেনা, অথবা তদনুরূপ সময় ও সহিষ্ণুতা থাকে না। মন সর্ব্বদা হাল্কা হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, কোন বিষয়ে একটু গভীর চিন্তা করিতে পারে না; ফলে ক্রমে ঋণগ্রস্ত, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক অবসাদে ধ্বংসের মুখে গড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ব্যবসায়ী মহাজনদিগের ঘরে যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে একবার অনেকে হাবুডুবু খাইলেও বংশগত রক্তের গুণে ২৫ বৎসর পার হইলেই, অনেকে শোধরাইয়া যান, কিন্তু রাজা মহারাজ বা জমিদারের ঘরে এই পরিবর্ত্তন সহজে হয় না। জমিদার—রাজা মহারাজাদের ঘরে, উপরে অভিভাবকবিহীন হইয়া বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষালাভে

অসমর্থ হইলে যৌবনের বিলাস আবিলতায় এবং ধূর্ত্ত বঞ্চকদিগের নানাভাবে, নানাসাজে আক্রমণ হইতে নিজকে বাঁচাইয়া উঠান অনেক সময়ই অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অভিভাবকশূন্য, বিষয়সম্পত্তিশালী, উদারচেতা, সরল স্বভাব, সংসার ও লোক-চরিত্রে অনভিজ্ঞ, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন যুবকদিগের উপর সওয়ার হইয়া, ফাঁকি দিয়া দুপয়সা লাভ করিতে, ফাকিব্যবসায়ীদের কেহই ছাড়ে না। উকিলবাবু এক ঘণ্টা খাটিয়া সারাদিনের বিল করেন। বাবুর কর্ম্মচারীরা বিলের প্রাপ্য যত বেশী হয়, ততই বেশী আনন্দের সহিত বিল মুঞ্জুর করেন। কারণ, তাহাতে "দশৎরা" হিসাবে তাহাদের প্রাপ্তি বাড়ে; এবং উকিল বাবুর বৈঠকে পান তামাক খাওয়া ও অন্য রকমের যথেস্ট আদর অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। সময়ে কর্ম্মচারীমহাশয়েরা তাঁহাদের নিজেদেরও মাম্‌লা-মোকদ্দমা উক্ত উকিলবাবুকে দিয়া মোফৎ করাইয়া লইয়া নিজ মুনিবের অর্থেই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। পরের ধনে পোদ্দারী করার প্রলোভন বড় সহজ নহে। উকিল-বাবু ধনী গৃহে আগমন পূর্ব্বক, দুই চারিটা ফাঁকা উপদেশ দিয়া বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন করেন, এবং নিজের ছেলে বা মেয়ের বিবাহে আত্মীয়তার চিহ্নস্বরূপ বিস্তর খাসী, পাঁঠা, তরিতরকারী, বড় বড় মৎস্য আদায় করিবার পথ করিয়া লন। অথচ মামলার ফীস্ লইবার সময় চক্ষু উল্টাইয়া ঠেকাইয়া ডবল চার্জ্জ আদায় করিতে ছাড়েন না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই মিনিট কথা বলিলেও consultation fee ধরিয়া লন।

ডাক্তারবাবুও ধনীগৃহে বন্ধুরূপে যুটিতে আগ্রহান্বিত। বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ ২ ঘণ্টা রোগীর নিকট বসিয়া ১ দিনের চার্জ্জ করেন; রাত্রিতে এক ঘণ্টা শুধু দেখিতে যাইয়া বা তথায় বসিয়া ২ ঘণ্টা তাস খেলিয়া বা গল্প গুজব করিয়া সারারাত্রি-ব্যাপী ডিউটি (Night dutyর) ফীস্ আদায় করিয়া লন। কর্ম্ম-চারীরা বিল মঞ্জুর করিতে আপত্তি করে না, কারণ তাহারাও শতকরা হারে কিছু পায় এবং তাহাদেরও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের চিকিৎসা বিনা ভিজিটে উক্ত ডাক্তার দ্বারা অনায়াসে হইয়া যায়।

যদি এইশ্রেণীর অবস্থাপন্ন যুবকদের একটু মদ্যপান দোষ থাকে, তবে ত কথাই নাই। উকীল ডাক্তার বলিয়া কথা কি, তাদৃশ সুযোগ ঘটিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইয়া উঠে, কোন কুকার্য্য করিবার অনুষ্ঠান করিলে, অনেক সময়ে ডাক্তার ও উকীলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। উকীল অপেক্ষা সাধরণতঃ ডাক্তারের সঙ্গেই অন্তরঙ্গটা কিছু বেশী হয়। কেন হয়, তাহা ভাবুকব্যক্তি সহজেই অনুভব করিবেন। এমনও দেখা গিয়ছে যে, এইশ্রেণীর কোন ডাক্তারবাবু এই শ্রেণীর কোন ধনী যুবকদের পিতার অন্নে এখন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন এবং পিতৃহীন ধনী যুবকদের মদ্যপানের এবং ইয়ারকীর সঙ্গীরূপে জুটিয়াছেন, তিনিই অভাবের সময় বা কোন বিপদকালে এই সকল অবোধ বালকদের নিজের নামে পাঁচ হাজার কর্জ্জদিয়া হ্যাণ্ডনোটে সাত হাজার লিখাইয়া লইয়াছেন, অথবা বাজারে কাহারও নিকট হইতে ১৪ হাজার উহাদের নামে

কর্জ্জ করাইয়া দশ হাজার উহাদের দিয়া, বৃক্রী চারি হাজার দালালী বাবৎ নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন; অথবা বালকদের শত্রুপক্ষের সহিত তলে তলে যোগ দিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছনা ভোগ ও অসম্মান করাইবার ফিকির ফন্দি করিতেছেন। জানি না, পৃথিবী কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর দানবচরিত্র জালিয়াতের ভার বহন করিতেছেন। আমলাকর্ম্মচারী, মোসাহেব ইয়ার-বন্ধু এবং আরও যে কত শ্রেণীর কত বঞ্চক কত ভাবে কত সাজে ইহাদের স্কন্ধে সওয়ার হইয়া আছে, তাহার আর অবধি নাই এবং কুকুরের অঙ্গলগ্ন "আঠালী" বা নিরীহ গরুর অঙ্গলগ্ন জোঁকের ন্যায় সর্ব্বদাই ইহাদের রক্তে নিজেরা বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে। উপযুক্ত শাসন সংরক্ষণের অভাবে এমনও কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, খুনী মোকদ্দমার আসামী গ্রেপ্তার বা তদন্ত উদ্দেশ্যে যদি কোন উৎকোচগ্রহণপিপাসু পুলিশকর্ম্মচারী মফঃস্বলে কোন জমিদরের ডিহি-কাচারীতে উপস্থিত হন, তত্রত্য দানব-চরিত্র জঘন্য নাএব উক্ত পুলিশকর্ম্মচারী সহ পরামর্শ করতঃ, তথাকার অবস্থাপন্ন নিরীহ প্রজাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ঐ খুনী মোকদ্দমার আসামী রূপে চালান দিবে এই ভয় দেখাইয়া, বিলক্ষণ অর্থ আদায় করিয়া উভয়ে ভাগ বাঁটরাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করেন। নিরীহ প্রজাগণ প্রাণের ভয়ে যথাসর্ব্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, এই শ্রেণীর ভূস্বামিদের অমনোযোগিতায় ইহারা যেমন আপন সম্পত্তি নষ্ট করেন, তেমন উপযুক্ত শাসন ও কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের অভাবে

নানাপ্রকারে অধীনস্থ নিরীহ প্রজা বা মাঠের চাষাদেরও নিপীড়ন ও সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পরোক্ষভাবে কারণস্বরূপ হইয়া উঠেন।

ধনীগৃহে আর একশ্রেণীর যুবক আছে, তাঁহাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা বেশ আছে, রুচি-মার্জ্জিত, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ইত্যাদি কলাবিদ্যায় বেশ অধিকার আছে, তাঁহারা বুঝেনও সমস্ত, কিন্তু কি এক উৎকট গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহারা গদ্যময় বৈষয়িকব্যাপারে এতদূর বীতস্পৃহ যে, কাজকর্ম্ম একেবারেই দেখেন না।—তাঁহারা সেই টেনিসনের palace of art এ নিরন্তর থাকিতে চাহেন, এবং সেখানে কবিত্বময় জীবনের অপরিহার্য্য অনুসঙ্গী আমোদের ফেনিলস্রতে কখনও আবিল কখনও অনাবিল ভাবে প্রবহমান থাকে। এইভাবে বৈষয়িক অমনোযোগিতা হেতু দিনের দিন আয়ের স্বল্পতা হইতে থাকিলেও ব্যয়ের পরিমাণ নানাপ্রকারে মার্জ্জিত রুচির পরিতর্পণকল্পে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাঁহারা ভয়ানক ঋণগ্রস্ত হইয়া একেবারে ধ্বংসের পথে চলিয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা এই সঙ্গে সঙ্গে একটু পদোচিত বা তদপেক্ষা অধিক মান সম্মান, বংশগৌরব ও ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি জনসাধারণে প্রকাশ করিতে সমধিক প্রয়াসপর হন, তাঁহাদের ত কথাই নাই,—তাঁহারা এমন ভাবে ডুবিয়া পড়েন যে, তাঁহাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না। অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলেও শুধু আত্মগৌরবের প্রহসন লোক মধ্যে প্রচার করিবার অন্তিম চেষ্টায় কত ঘর যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ্-শিখার মত একবার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া চিরকালের তরে

নিবিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শ্রেণীর সংসারও লোক চরিত্র অনভিজ্ঞ অর্থ বিত্তশালী প্রতিভাবান্ যুবাদের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের বৈষয়িক কাজকর্ম্মে অমনোযোগিতার কারণ যথেষ্ট-রূপে যথেচ্ছাচার করিবার সুবিধা পায়। তাহারা তখন নানা মামলা মোকদ্দমা ও ফৌজদারী লাগাইতে আরম্ভ করে, এবং প্রায় কোন মোকদ্দমাই তাহাদিগের কৌশলে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। মুনিবের ঘরে গোলযোগ ও বিভ্রাট থাকিলেই সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগের আয়ের পথ উন্মুক্ত থাকে এবং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনপ্রয়াসে বিঘ্ন বাধা প্রাপ্ত হন। ম্যানেজার বা কর্ম্মচারীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ কোন কোন কাজ কর্ম্ম বা কাগজ পত্র এমন গুপ্তভাবে বা জটিল অবস্থায় রাখিয়া দেয়, যেন মালিক তাহাদিগকে চিরদিন ষ্টেটের কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হয়। মূর্খেরা ইহা বুঝে না, যাঁহার একটু সাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি আছে, তাঁহার কাছে এ চাতুরী বা ফাকিবাজী কিছুতেই টিকিতে পারেনা ;—সাময়িক একটুবেগ পাইতে হয়, এই মাত্র কথা। যদি কখনও সাময়িক উত্তেজনায়, এই সকল যুবক আপনাদের বিষয় কার্য্য বুঝিতে চেষ্টা করেন, তখনই ধূর্ত্ত ও পরধনেপুষ্ট কর্ম্মচারীগণ স্তূপে স্তূপে গাদিতে গাদিতে কাগজ আনিয়া উপস্থিত করিয়া "তলব বাকী" "জমা ওয়শীল "সুমার" "রোকর" "আমদানী" "আগতখারিজ" "সায়রাতমহাল" "গুজস্তা" ইত্যাদি নানাবিধ "ফার্সী" কথার অবতারণা করিয়া এই সকল কাগজ পত্র যে তাঁহাদের পক্ষে

বুঝা প্রায় অসম্ভব এমন কথা মুখে না বলিলেও ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। হিসাব নিকাশের জটিলত্ব, মামলা মোকদ্দমার কুট হিসাব, দলিল পত্রের হাল ওয়াকিব ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে তাঁহারাই যে অতি প্রবীণ ব্যক্তি এবং বাহিরের আর কেহ যে এই সকলের মর্ম্মার্থ কিছুতেই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ নহে, তাহাও আভাসে জানান হইয়া থাকে। একে ত ঐ সকল যুবক আজীবন কলাবিদ্যার অনুশীলনে এবং কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চায় বিভোর হইয়া আছেন,—গদ্যময় সাংসারিক জীবনের তাঁহারা আদৌ পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা এই চাহেন যে, তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি যে ইচ্ছা সে-ই পরিচালনা করুক, তাঁহাদের প্রয়োজন মত টাকা পাইলে এবং সুখে শান্তিতে চলিতে পারিলেই হইল। তাঁহারা কোনরূপ বৈষয়িক কার্য্য দেখার কষ্ট স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হন না; তাহাতে যদি ও বা কালে ভদ্রে সাময়িক উত্তেজনায় কখন তাঁহাদের নিজের বিষয় সম্পত্তি দেখার ইচ্ছা হয়, তখন ঐরূপ গাদা গাদা কাগজ, পিপীলিকা সারির ন্যায় লেখা, গণ্ডা, কাহন, ক্রান্তির বিচিত্র চিহ্ন, নানারূপ ফারসী বয়েৎ দেখিয়াই তাঁহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যায়, অমনি তাঁহাদের সেই ক্ষীণপ্রবৃত্তিটুকুও একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়,—তখন আবার সেই সকল কর্ম্মচারীর উপরেই পুনর্ব্বার নির্ভর করিয়া, তাঁহাদের দুই চারিটা আশা ও ভরসার বাণী শুনিয়াই তাঁহারা আরাম ও শান্তি বোধ করেন। কাগজ পত্র দেখার যে একটা "জুজুরভয়" এটা চিরকালই তাঁহাদের লাগিয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, ধৈর্য্য

কষ্ট, সহিষ্ণুতা সহকারে প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে আরম্ভ করিলে, জাল জুয়াচুরি ও ফাঁকির কোন পথই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। পুষ্করিণীর এক ধার হইতে অন্য ধার পর্য্যন্ত জাল টানিয়া নিলে এবং কোন দিকেও ফাঁক না পড়িলে বা জাল ছেড়া না থাকিলে জালের নীচভাগ একেবারে মাটির সহিত ঠেকিয়া থাকিলে উপরেও মৎস্য লম্ফদিয়া যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, জাল তাহার উপরে ধরিয়া রাখিলে মৎস্য যতই ডুবদিয়া থাকুক বা ছুটিতে থাকুক না কেন, তাহার ডাঙ্গায় না উঠিয়া উপায় নাই। কিন্তু বরাবরই পরচর্ব্বিত ভক্ষ্যদ্রব্য চক্ষু বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতে তাঁহারা তখন এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক কাগজ পত্র দেখা তাঁহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মচারীবর্গ এমন ভাবে একে অন্যকে ঈদৃশ মনিবের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন যে, তাঁহাদের কেউ না থাকিলে সংসার অচল হইবে। ধনীযুবকেরা ইহা বোঝেন না যে, যদি আজ তাঁহাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও সংসার এই ভাবেই চলিবে, সুতরাং কর্ত্তব্য বোধে তাহাদিগকে কার্য্যে না রাখিলেও, প্রথমে একটু অসুবিধা হইলেও, সংসার তাহাতে একেবারে নষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। যদি ঐ সকল ধনী যুবকেরা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, নিজের আয় ব্যয় দেখেন, আদায় উশুলের বন্দোবস্ত করেন, কাগজ পত্রের শৃঙ্খলা করিয়া লন, তাহাহইলে জলের মত সমস্ত কাজ চলিতে পারে। যাঁহারা সেক্ষপীর, মিল, মেকলে, স্পেনসার বোঝেন, তাঁহারা যে ভাতের হাঁড়ীতে

হাতানাড়া, ভোতাখাগের কলমের জরিপ আমিনী বা তলপবাকী জমা ওয়াশীল-বিত্থায় বিভূষিত কর্ম্মচারীবৃন্দের কর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য? তাঁহারা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিলেই সকল ধরা পরিতে পারে। গণিতে যখন ভুল নাই তখন হিসাবে ভুল হইবে কেমন করিয়া? দুই এবং তিনে যোগ করিলে পাঁচ হইবে ইহা নিশ্চিত। অনেক ভূস্বামীদের হয় ত খাজানা আদায় হয় পাঁচ হাজার, কাগজে লিখা থাকে দশ হাজার এবং জমিদারও চক্ষু বুজিয়া তাহাই খরচের বজেটরূপে মঞ্জুরপূর্ব্বক ঢেরা সই করিয়া দেন। ফলে বৎসরান্তে পাঁচ হাজার দেনা হইয়া থাকে। এই-ভাবে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; জমিদারও তাঁহার কর্ম্ম-চারিদের বর্ণিত সেই দশ হাজারের এবং অন্য দশপ্রকার ভবিষ্যৎ আয়ের অলীক আশায় সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকেন; শেষে একদিন পাওনাদারের রোষ-কষায়িতলোচন ও মোটা গলার কর্কশস্বর তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দেয়। তখন চক্ষু মেলিয়া দেখেন যে, তিনি অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছেন। পাঠক আপনাকে যেই কেন কোন সাংসারিক কাজ বুঝিবেন না বলিয়া হতাশ্বাস করিতে চেষ্টা করুক, আপনি যদি ধৈর্য্যসহকারে প্রথম অবধি দেখিতে থাকেন, তাহাহইলে অবিলম্বে তাহার সূত্র ও প্রণালী পাইবেন, হয় ত বা আপনি নিজেই বুদ্ধিবলে তাহাতে আরও কত সুন্দর নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা যুবকদের প্রধান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বা ম্যানেজার থাকেন;

তাঁহারাই ফলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ান এবং সাধুতার বিরোধী কর্ম্মসকল করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করেন। ফলে মনিবের রক্ত শোষণ এবং সেই সঙ্গে তাহাদের অধীন যে সকল গরীব প্রজা থাকে, তাহাদেরও রক্তশোষণ হয়। এই শ্রেণীর ম্যানেজার মুনিবের অর্থে বাহিরের সুখ ও সম্মান ক্রয় করেন। কিন্তু ভাবিতে গেলে দোষ যতটা মুনিবের,— কর্ম্মচারীর ততটা নয়। সুবিধা পাইলে, পথ থাকিলে প্রলোভন সম্মুখে পড়িলে, আজকাল কঠোর কর্ত্তব্য এবং সাধুতার পথ হইতে স্খলিত না হন এরূপ লোক অতি অল্প। এই ভাবে অভাবের তীব্রদংশনে, কবিত্বের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার পরে হতভাগ্য যুবক চক্ষু মেলিয়া একেবারে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকিলেও কর্ম্মচারীবৃন্দ তখনও তাঁহাকে বৈষয়িক কর্ম্মে তেমনি অপ্রবিষ্ট ও অজ্ঞ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, বৈষয়িক কর্ম্মের দুর্ব্বোধ্যতা এবং জটিলতা প্রতিপদে বুঝাইয়া যুবককে ভগ্নোত্তম করিয়া রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি করে না। নিজের বৈষয়িক ডুবু ডুবু অবস্থায় এই সকল অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কি দুরূহ ব্যাপার তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগী ছাড়া কেহই বুঝিবেন না।

পাঠক, অর্থ সর্ব্বস্ব যুগধর্ম্মে এমন সকল অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে যে, প্রথম শুনিলে তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু যাহা সত্য তাহা চিরদিন কখন ঢাকা থাকে না। সময়ের স্রোতে ঘটনার আবর্ত্তনে আপনি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

অধুনা একদল অর্দ্ধশিক্ষিত হালফ্যাশনের বাবু এক অভিনব শ্রেণীর ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম, মান সম্মান সকলই অর্থের বিনিময়ে অতি আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন করিয়া গৌরব বোধ করেন। পাঠক শুনিলে ঘৃণায় লজ্জায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন, ইঁহাদের এই নিতান্ত জঘন্য ব্যবসায়ের মূলধন হইল ইঁহাদের নিজেদের হালফ্যাশনের আলোকপ্রাপ্তা বিবিয়ানা চালের ঘরের স্ত্রী বা স্থল বিশেষে আপন বা পালিতা কন্যা। পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী, অভিভাবকশূন্য অর্থবিত্তশালী সৌখিন যুবকদের স্কন্ধেই ইঁহারা, সাধারণতঃ আপতিত হইয়া ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। ইঁহাদের সম্মোহন অস্ত্র অধিকাংশ স্থলেই অব্যর্থ ও অমোঘ;—যে শর সন্ধানে ধ্যান-মগ্ন ধূর্জ্জটির ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে রক্ত মাংসের দেহধারী স্ফূরন্ত যুবক যে অতি সহজেই বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় অনলে পতিত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? এই শ্রেণীর জঘন্য ব্যবসায়ীরা পূর্ব্ববর্ণিত অভিভাবকশূন্য উঠন্তবয়সের অবস্থাপন্ন যুবকদের সর্ব্বদা অনুসন্ধান লইয়া বেড়ায়; এবং শনি যেমন রন্ধ্র খুঁজিয়া নল রাজার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাঁরাও তেমন রন্ধ্র খুঁজিয়া কোন ভাগ্যবান্ ধনসম্পন্ন যুবকের সংসারে কোন না কোন এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাঁরা সাধারণতঃ কখনও ম্যানেজার, কখনও মাষ্টার অভিভাবক, কখনও বা থিয়েটারের অপেরা মাষ্টার ইত্যাদি নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রবেশ লাভ করেন। প্রথমে ইহাঁদের হাব ভাব, কথা বার্ত্তা, সাজ পোষাক ও তেড়ি চস্‌মার বাহার দেখিলে

যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত উচ্চদরের লোক বলিয়াই ভ্রম হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাঁরা কর্ম্মস্থলে Family quartar ফেমিলি কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছুদিনের মধ্যেই হারমোনিয়ামের সহিত মধুর স্ত্রীকণ্ঠের হোমশিখার ন্যায় উচ্চ-কম্পনস্বরের সুখসম্মিলনধ্বনিতে ইহাদিগের আলোকপ্রাপ্তা সাহিত্য সঙ্গীতানুরগিনী হালফ্যাশনের গৃহ লক্ষ্মীদের শুভাগমন বিঘোষিত হইয়া পড়ে। তৎপর চা পান, বৈকালিক আহারের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি উপলক্ষে আদর আপ্যায়নের আদান প্রদানে এই আলোকপ্রাপ্তদিগের ধনীগৃহের যুবকদের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্য ও পরিণতি পাঠককে আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। এই ঘনিষ্ঠতা যাহাতে উত্তোরোত্তর নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ক্রমে ঐ যুবকদের আদর অভ্যর্থনা, পান আহার কি তাঁহাদের সঙ্গে পত্নীর সাহিত্যচর্চ্চা, হাস্য পরিহাস, স্বামীর ইচ্ছাক্রমে তাঁহার অনুপস্থিতি সময়েও হইতে থাকে। তৎপর ব্যবসায়ীদের কেহ টোপ গিলাইবার আশায় রাখিয়া, কোন স্থানে বা টোপ গিলাইয়া বিলক্ষণ শোষণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এই অবস্থায় ইহাঁদিগের আহার বিহার সাজসজ্জার ঠাট দেখিয়া চক্ষু স্থির হয়। পরে শেষে যখন বেশী ঢলাঢলী হইবার উপক্রম হয়, তখন একচোটে ১০।২০ কি পঞ্চাশ হাজার লইয়া পত্নীসহ চম্পট দেওয়া ইহাঁদিগের এই সাংঘাতিক বীভৎস অভিনয়ের শেষ অঙ্ক। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য পাইলে ও পত্নীর অভিপ্রায় থাকিলে অথবা ফিরাইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা কম দেখিলে একেবারে

সাফকাওলা পত্র করিয়া বিক্রয় করিতেও তাহাদের আপত্তি থাকে না। অনেকে যেমন নিজের ব্যবহার্য্য টেবিল চেয়ার কিছুদিন নিজে ব্যবহার করিয়া তৎপরে second hand সেকেণ্ড হেণ্ড জিনিষ রূপে বাজারে বিক্রয় করে বা ভাড়া, দেয় ইহারাও ঘরের স্ত্রীর সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ভগবান্ ইহাদের মনুষ্য শরীরে যে কিসের আত্মা দিয়াছেন তিনি জানেন। একবার কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান্ বলিয়াছিলেন, সুন্দরী শিক্ষিতা এবং মিলিতে মিশিতে পটুস্ত্রী থাকা আজকাল অতি শীঘ্র শীঘ্র উচ্চপদে প্রমোশন পাইবার একটি অমোঘ উপায় স্বরূপ। ধন্য তুমি কাল,—ধন্য তোমার মাহাত্ম্য।

দেশস্থ ধনী সম্প্রদায়ে একশ্রেণী আছেন, যাঁহারা বিলক্ষণ হিসাবী। তাঁহারা প্রায়শঃ বিশেষ কোন ভোগবিলাসের প্রয়োজনে তেমন অর্থ অপব্যয় করেন না। কিন্তু তাঁহারা স্বদেশী নামের এমনই উৎকট ভক্ত ও অন্ধ উপাসক যে, স্বদেশী নাম করিয়া যে কোন ফাকি ব্যবসা বা বাণিজ্যের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ অতি সহজেই বাহির করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং সুবিধা পাইয়া, কতকগুলি ধূর্ত্ত, আজ কাপড়ের কল করিব, কাল দেশে দেশালাইর কল খুলিব, তুলার চাষ করিব ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, ইহাঁদের নিকট হইতে সময়ে সময়ে পাঁচ, দশ, বিশ হাজার কি ইহারও অনেক উপরের অঙ্ক ফাকি দিয়া লইয়া যায়,—দেশস্থ নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও দুই একখানি চিঠি বা recommendation letter

লইয়া ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে ত আর কথাই নাই, একেবারে হাতে হাতে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। প্রথম কয়েকদিন একটু ব্যবসায়ের আয়োজন উদ্যোগ দেখাইয়া তৎপরে তাহারা এমন গা ঢাকা দেয় যে, আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর ধূর্ত্তেরা যে কত নামে, কত সাজে, স্বদেশীর নাম করিয়া, এই সদাশয়-ধনী-সম্প্রদায়ের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া, ইঁহা-দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বলিতে কি, অনেক রাজা মহারাজা বা বড়লোক এই ভাবে বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ যে অর্থরাশি দেশের প্রকৃত উপকারে লাগিতে পারিত, তাহা এইরূপ ধূর্ত্তেরা লুণ্ঠন করিয়া ফাঁকি দিয়া খাইয়া থাকে। এই সকল দেখিলে বোধ হয় যে, হিসাবীই হউক, আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্‌ই হউক, অথবা কৃপণই হউক, চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া মেজাজ বুঝিয়া, রন্ধ্র অনুসন্ধান করিয়া ঢুকিলে প্রায় সকল স্থানেই দন্ত বসান যায় এবং কোন না কোন ভাবে কিছু গলাইতে পারা যায়। তবে প্রকার ও প্রণালী ও মন্ত্র-প্রয়োগের বিভিন্নতা হয় এই মাত্র।

আর এক শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী রাজা মহারাজা নবাব বা জমিদার আছেন, তাঁহারা উৎকট সাহেবীয়ানা রোগে ভয়ঙ্কর-রূপে আক্রান্ত। তাঁহাদের সাহেবী মেজাজের পরিতর্পণ করিতে লাখে লাখে টাকা উড়িয়া যায়। এখানে বাঙ্গাল-নবীশের কোন আশা নাই। সাহেবী পোষাক এবং সাহেবী ধ্বজা ধরিয়া বিলাতী জুয়াচুরী দ্বারা ইঁহাদের তহবীলের হাজারে হাজারে টাকা লুট করিলেও কেহ কিছু বলিবে না। পাঠক

সাহেবীকায়দায় যতদূর এবং যত প্রকারের অপব্যয় আপনি কল্পনা করিতে সমর্থ, এবং বিলাসিতার যজ্ঞে যত রূপে আহুতি যোগাইতে পারা যায় বলিয়া মনে করিতে পারেন, এখানে তাহার প্রায় সকলই অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের বাহিরে "লেপাফা-দুরস্ত" যে পরিমাণে, সে অনুপাতে ইঁহাদের ভিতরে প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞান অতি অল্প। বিলাতী সভ্যতার মোহে, বিলাসিতার দুষ্পূরণীয় আকাঙ্ক্ষায় ইঁহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকে। ইঁহাদের বিলাসিতার আড়ম্বর যোগাইবার পক্ষে ইঁহাদের সম্পত্তির আয় নিতান্তই কম হইয়া পড়ে। ইঁহারা প্রাণ ছাড়িতে পারেন, কিন্তু চাল ছাড়িতে পারেন না। ইঁহারা অভাব গ্রস্ত হইলেও চাল বজায় রাখিবার জন্য দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া ইয়াদির্কিদ্দ পাঠ লিখিতে বা হ্যাণ্ড্‌নোট সহি করিতে থাকেন। এই কর্জ্জ করিবার সময় কতকগুলি লোক দালাল সাজিয়া বিলক্ষণ উপায় করে। অবশেষে এই সকল দেনার ফল এই দাঁড়ায় যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোর্টঅব্‌ওয়ার্ডের হাতে সকল সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণের ভার অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং অযোগ্য ভূম্যধিকারী নাম লিখাইয়া, সামান্য কিছু পেন্‌সনের উপর দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। এইসকল স্থলে সাহেবী জুয়াচুরির বড়ই প্রাদুর্ভাব; এবং সেই প্রভাবে অতি অল্প সময়েই ইঁহাদের অধঃপতন ঘটে।

বড়লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, চরিত্রবান্, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মপটু, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ও মিতব্যয়ী—যাঁহাদের মস্তিষ্ক লোকের মতামতে উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা হয় না,—যাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি আছে, আত্মকল্যাণের সহিত যাঁহাদের

দেশের ও দশের কল্যাণসম্পৃক্ত,—যাঁহারা লোকচরিত্রঅভিজ্ঞ ও বহুদর্শী, যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণজনক কর্ম্মে মুক্তহস্ত, যাঁহাদিগের সান্নিধ্যে কোন শ্রেণীর ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক প্রবেশপথ লাভ করিতে সমর্থ হয় না,—যাঁহাদের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড যুড়িগাড়ী বা 'মটরকার' আসিয়া দাঁড়াইলে কিংবা যশ বা নিন্দার কোনরূপ আসন্নসম্ভাবনা দেখিলেই যাঁহাদের প্রাণে একটা ভূমিকম্পের ভাব উপস্থিত হয় না,—রাজা মহারাজা বা সরকারি অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এমন কি লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেও যাঁহারা আপনাদিগের সত্তা বা অস্তিত্ব ভুলিয়া যান না, তাদৃশ বড় লোক বস্তুতঃই দেশের আশা ভরসাস্থল। তাঁহারা খেতাবির উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় বা সেলাম-সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতেও প্রস্তুত নহেন। আবার অপবাদ ভয়ে প্রকৃত কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়পদে অগ্রসরহইতেও বিমুখ নহেন। তাঁহারা আত্মসম্মান প্রকৃত পদার্থটা কি তাহা বুঝেন এবং ইহাও বুঝেন যে, তাঁহারা নিজে তাঁহাদের নিজের মর্য্যাদা নষ্ট না করিলে, বাহিরের কেহ ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগের অবমাননা করিতে পারে না। তাঁহারা আত্মবান্;—লোক-মুখ-নিঃসৃত যশোনিন্দার সাময়িক ফুৎকারে বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় তাঁহারা কখন পরিচালিত হইবার পাত্র নহেন।

ফাঁকিবাজ বঞ্চকদিগের দ্বারা, অর্থসম্পত্তিতেহীনতর মধ্য-বিত্ত শ্রেণী এবং নিম্নস্তরের জনসাধারণের উপরেও কিরূপ চতুরচালের কৌশলময় বাটপাড়ির অনুষ্ঠান হয়, এক্ষণ সঙ্ক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। এই শ্রেণীর চাতুরী

পটু ফাঁকিবাজের দলে কোন কোন উকীল ও মোক্তারের আসন অগ্রগণ্য। সকল উকীল বা মোক্তারই যে এই শ্রেণীভুক্ত এমন কথা বলিতেছি না। অনেক মহনীয় চরিত্র উকীল, প্রকৃতই দেশের ও দশের অবলম্ব, অনেক সাধুচরিত্র মোক্তার যথার্থই বিপন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িতের বন্ধু। কিন্তু যাহাদিগের অভাব ও অনাটন অত্যধিক, সাধু, ও সৎপথে থাকিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের শক্তি নাই—অথচ অর্থলালসা প্রবল, তাহাদিগেরই অনেকে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় এবং ভুয়া অসার চমক দেখাইয়া অজ্ঞ ও অবোধের মন আকর্ষণপূর্ব্বক, তাহাদিগকে আপনাদিগের বিশ্বগ্রাসী লোভের অনলে ভস্মীভূত করে। বড়ই দুঃখের বিষয় ও লজ্জার কথা এই যে, ঈদৃশ নীচ প্রকৃতির বঞ্চকেরাও বুদ্ধিমান্ চতুর লোক বলিয়া সমাজে প্রশংসিত হয়; সুতরাং আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ চতুর জ্ঞানে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অবাধে গোঁফে তা দিয়া অজস্র আসুর বৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে থাকে। নির্ব্বোধ জনসাধারণকে কুবুদ্ধি দিয়া এই শ্রেণীর উকীলসম্প্রদায়ের অনেকে বিলক্ষণ দোহন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই যে মোকদ্দমাপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহাতে যে অধিকাংশ লোকের সংসার ছাড়খার হইয়া যাইতেছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ—আমাদের ঐ শ্রেণীর উকীল মহাশয়দিগের কুপরামর্শ। এই শ্রেণীর উকীলের আইন কানুনের চক্রব্যূহে একবার কোন মোকদ্দমা পড়িলে আর তাহা হইতে বহির্গত হইবার পথ থাকে না। কিছুতেই আর উভয় পক্ষের

মধ্যে কোনরূপ আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে না; মেড়ার লড়াইয়ের ন্যায়, উভয় পক্ষের সংঘর্ষ চলিতে থাকে; যাবৎ না একজন একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে, তাবৎকাল মামলার নিবৃত্তি হয় না। যদি বা উভয় পক্ষের অত্যন্ত আগ্রহে কোন কোন স্থলে আপোষ মীমাংসা হয়, তখন উকীল মহাশয় সাধ্যমত এই চেষ্টা করেন, যাহাতে আপোষের দলিল পত্রে ঝগড়ার বীজ বা অঙ্কুর একবারে নির্ম্মূল না হইয়া একটুকু থাকিয়া যায়; সুদূর ভবিষ্যতে হইলেও, আবার যেন তাহা লইয়া একটা খ্‌টকা বাঁধে। কখন কখন ইহা অভিসন্ধি মূলে হয়, কখন কখন বা বিনা অভিসন্ধিতে 'পেচানউকীলিবুদ্ধির' স্বাভাবিককৌশলে বোনাফাইডিরূপে আপনি হইয়া যায়। সময় সময় আবার কোন উকিলপুঙ্গব নির্ব্বোধ প্রজাদিগকে, নানারূপ স্বার্থের অলীক প্রলোভন দেখাইয়া, জমিদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও বিদ্রোহী করিয়া তোলেন, এবং কিছু দিন ঐ সকল প্রজারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা মাথট ধরিয়া যাহা উঠায়, তাহা বিলক্ষণরূপে শোষণ করিয়া লন। কতক দিন পরে যখন দেখেন যে আর কোন তস্ নাই, তখন পদ্মপত্রের জলের মত 'আল্‌গোচে' নিঃশেষে সরিয়া পড়েন! ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, যাহাদের অন্ন যুটে না, তাহারাই সাধারণতঃ ঈদৃশ জঘন্যকর্ম্মে লিপ্ত হয়। কোন কোন নূতন উকীল অনেক সময়ে, কোন মক্কেল পথ ভুলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেই তাহাকে বসিতে দিয়া, অতি গম্ভীরভাবে তাঁহার মোহরেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "অমুক কোর্টে যে মোকদ্দমা করিয়াছিলাম

তাহার কি হইল ?” মোহরেরও পূর্ব্ব উপদেশমতে বলে যে “মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়াছে”। এই ভাবে নব্য উকিলবাবু তাঁহার এই নবাগত মক্কেলটির সম্মুখে অন্ততঃ দশ বারটি মোকদ্দমা যে তাঁহার কৃতিত্বে ডিক্রী হইয়াছে মোহরের উক্তি দ্বারা তাহা বিবৃত করাইয়া লন। ফল এই হয় যে, উকীল-বাবুর উপর নবাগত মক্কেলটির ভক্তিবিশ্বাস পূর্ব্বে না থাকিলে নূতন জন্মে; আর পূর্ব্বের সঞ্চিত ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু থাকিয়া থাকিলে উহা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, উকিলবাবু হয় ত এপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, কোন মক্কেলের মুখও দেখেন নাই। এটর্ণিদের মধ্যে এরূপ বহু আছেন যে, তাঁহাদের জুয়াচুরি দিনে ডাকাইতি বলিলেও চলে। আমরা যত দূর জানি ও বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে, অধিকাংশ স্থলে ব্যবহারজীবী বা আইন ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য যাহাতে দেশে উভয় পক্ষে মামলা মোকদ্দমা না হইয়া ন্যায়তঃ উভয়পক্ষে আপোষে মীমাংসা হয়, আপন যত্ন উদ্যোগও চেষ্টায় তাহারই সংঘটন করা এবং তজ্জন্য উভয় পক্ষ হইতে তাহার যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। দুঃখের বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কদাচিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে।

ডাক্তারবাবুদের মধ্যেও কেহ কেহ অবৈধরূপে জন-সাধারণের অর্থ শোষণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। ঈদৃশ ফিকিরবাজ ধন্বন্তরিরা যে রোগ ৭ সাত দিবসে ভাল হইবার কথা, তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ১২ দিন লাগাইয়া দেন। গম্ভীর মুখে রোগের গুরুত্বের কথা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট

বলিয়া তাহাদের অনুরোধক্রমেই দিনে দুইবার রোগী দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার স্থানীয় ডাক্তার সাহেবের নেকনজর বা অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভ করিবার আশায় হঠাৎ এক সময়ে রোগীর নাড়ী ধরিয়া গম্ভীরমুখে এমন আশঙ্কা প্রদর্শন করেন যে, বাড়ীর লোকেরা অমনি তাঁহাকে ডাক্তরসাহেবকে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ না করিয়া পারেন না। এই ভাবে ডাক্তার সাহেবকে একটা ভিজিট দেওয়াইয়া, তাঁহার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টাকরা হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীর জঘন্য ডাক্তারদের মধ্যে আবার কেহ কেহ রোগী মহলে পসার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে, বাসা হইতে বাহির হইবার সময়েই, নিজের বাক্স হইতে ৮।১০টি টাকা নিজের পকেটে ফেলিয়া বাহির হন। উদ্দেশ্য যে, তাঁহার পকেটের এই টাকার টুন্ টুন্ ধ্বনিতে রোগীমহালে ডাক্তারবাবুর পসার প্রতিপত্তি এবং তিনি যে কতই টাকা উপায় করিতেছেন, তাহা প্রচারিত হইবে। যেমন কোন কোন শ্রেণীর উকীলবাবুদের মক্কেল ধরিবার চর থাকে, তেমন এইশ্রেণীর ডাক্তরবাবুদেরও রোগী ধরিবার চর থাকে। নানা স্থানে নানা বৈঠকে ঐ শ্রেণীর ডাক্তারবাবুদের রোগ আরোগ্য করিবার অপার ক্ষমতার কথা তাহারা বলিয়া বেড়ায়। একবার আমার বন্ধু একটি উকীল বাবু আমাকে কথাপ্রসঙ্গে হাস্যপরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যেমন হইয়াছেন তাঁহারা উকীল, তেমন হইয়াছেন তাঁহারা ডাক্তার, উভয়েই সমান! তবে কথা এই যে, তাঁহারা মোকদ্দমা

হারিলে, তাহার একটা আপীল আছে, কিন্তু ডাক্তার রোগী মারিয়া ফেলিলেত আর তাহার আপীল নাই। বলাবাহুল্য ডাক্তার এবং উকীল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতুল্য সদাশয় লোক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল।

আর এক শ্রেণীর জুয়াচোর আছে, ইহাঁরা সাধারণ্যে Professor of Hypnotism বলিয়া নিজকে প্রচার করিয়া স্কুলের ছাত্রগণের নিকট হইতে যথাসম্ভব অর্থ আত্মসাৎ করিয়া লয়। প্রকৃতপক্ষে Hypnotist নাই এবং তাহাদের মধ্যে ভাল লোক নাই, এমন কথা আমি বলিতেছিনা। তবে এই নামের পেশাদার শ্রেণীর পেশাদারীর চাতুরীর কথাই এস্থলে বলা যাইতেছে। ইহারা যে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সত্যের সেবক সৎশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নহে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ইহা বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক। ইহারা সাধারণতঃ বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি করিয়া, সহরের কোন বড়লোকের বাড়ীতে, কিংবা ষ্টেজ ভাড়া লইয়া লোককে সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism) প্রভাব দেখায় এবং সাধারণকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া বেশ দু,পয়সা উপায় করিয়া লয়।

যদি ইহাতে প্রকৃতই সম্মোহন বিদ্যার প্রদর্শন হইত, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু যখন এক বিষয়ে নাম করিয়া, ফাঁকি দিয়া অন্যরূপ বিষয় দেখান হয়, তখনই তাহাতে দুকথা বলিতে হয়। ইঁহারা কোন স্থানে Performance হইবার কথা সাব্যস্ত হইলেই, নানাস্থানে ঘুরিয়া নানারূপে ঘুষ দিয়া, ১০। ১২টি ছেলে ঠিক করিয়া রাখে ;

এবং তাহাদিগকে মিষ্ট ও মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিয়া কতকগুলি উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া আসে, এবং তাহারাও ঘুষের প্রলোভন পাইয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরদিন যেখানে Performance হইবে, সেখানে দেখা যায়, যথা সময়ে দলে দলে ছেলেরা Hypnotism দেখিবার জন্য বসিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত ভাড়া করা ছেলেরা যাইয়াও সেইখানে আসন গ্রহণ করে। Professor যথারীতি, ক্রমে সাজ সজ্জা করিয়া, ষ্টেজে উঠিয়া অতি সাহস এবং মুক্ততার সহিত দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলেন যে, আপনাদের যাহার ইচ্ছা হয়, ষ্টেজের উপর চলিয়া আসুন, আমি তাহাকেই (Hypnotise) সম্মোহন করিব। অনেক বালক ও যুবক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ষ্টেজে উঠিতে থাকে। এই সঙ্গে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ভাড়া করা বালকেরাও ষ্টেজে উঠিয়া পড়ে। ফলে ষ্টেজে এত লোক হয় যে, কিছু নামাইয়া না দিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। তখন Professor অতি ভাল মানুষের মত বলিতে থাকেন, "অত লোক দিয়ে কি হবে" ৫।৭।১০ জন হইলেই চলিবে। তখন তিনি অন্য সব বালক অথবা যুবকদের নামাইয়া দিয়া, তাঁহার সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ৮।১০ জন বালককে বাছিয়া রাখিয়া, অন্য সকলকে তাহাদের স্থানে যাইয়া বসিতে অনুরোধ করেন, এবং এই কার্য্যটি এমন সুকৌশলে সম্পন্ন হয় যে, ঐ সকল বালকেরা যে তাহারই ভাড়া করা লোক, ইহার বিন্দুমাত্রও কেহ সন্দেহ করিতে পারে না।

দর্শকেরা মনে করেন যে, ইহারা ত সকলেই বাহিরের লোক, ষ্টেজে বেশী লোক হওয়াতে কয়েকজন নামিয়া আসিল মাত্র; ইহাতে আর দোষ কি? যখন ভাড়া করা কতিপয় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ছেলে ষ্টেজে রহিল, তখন আর চিন্তা কি? একেবারে রামরাজ্য! তখন ঐসকল ছেলেদের তিনি ইচ্ছামত ঘুম লওয়ান, কখন হাসাইতে থাকেন, কখন বা কাঁদান, কখন সূঁচ ফুটাইয়া দেন। তখন তাঁহার সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে না হয় এমন কি আছে—তিনি তখন সমস্ত পারেন। আর ঘুষের প্রলোভনের প্রভাবে, ছেলেগুলিও যেমন বলে, তেমনই করিয়া বেশ অভিনয় করিতে থাকে। আর দর্শকবৃন্দ Professor কে প্রায় ভগবানের একাদশ অবতার বলিয়া তখন মনে করিতে থাকে। এইরূপে এইশ্রেণীর জুয়াচোরেরা ফাঁকি দিয়া সময় সময় সাধারণের অর্থ লুণ্ঠন করে।

আর এক শ্রেণীর ফাঁকিবাজী ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইতেছে "জ্যোতিষীব্যবসা।" জ্যোতিষশাস্ত্র আমাদের দেশের অতি প্রাচীন ও গৌরবের জিনিস। আজকাল এই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেকবঞ্চক, জ্যোতিষশাস্ত্র অতি সামান্য আলোচনা করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্ হইয়া মানুষ ঠকাইতেছে। সহরে এই-শ্রেণীর ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ীরা বড় বড় অক্ষরে "জ্যোতিষ-তত্ত্ববাগীশ" "জ্যোতিষবারিধিরত্ন" ইত্যাদি নাম দিয়া ফাঁকিদিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছেন। ইঁহারা হাত দেখিতে প্রথমেই কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ করেন; তারপর এমন সকল কথা এমনভাবে বলেন যে, অনুমানেও একজনের সম্পর্কে

এইরূপ বহুকথা বলা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ একটু হাইফ্যাশনে থাকিয়া নিজের দর আরও বাড়াইয়া লন। আত্মকৃত জ্যোতিষীগণনায় যাহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বিশেষ লাভের প্রত্যাশা আছে, যখন এমন কোন অবস্থাপন্ন লোক ইহাঁদিগের নিকট গমন করেন, তখন হয়ত এখন "লগ্ন ভাল নয়" বলিয়া অন্য সময়ে তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত অনুরোধপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দেওয়া হয়; ইত্যবসরে গুপ্তচর দ্বারা বা অন্যপ্রকার অনুসন্ধানযোগে ঐ বাবুটির যথাসম্ভব সংবাদ সংগৃহীত হইয়া আসে। ইহার পর বাবুটি যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে গণনার প্রয়োজনে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন হাত দেখিয়া বা মুখের দিকে চাহিয়াই ইহাঁরা তাঁহার সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলেন, যাহাতে স্বতঃই তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন হয় সুতরাং সহজেই, বিলক্ষণ প্রণামীর যোগাড় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, জ্যোতিস্তত্ত্বের যতটুকু ইহাঁরা জানেন, তদ্দারা ভূত বা বর্ত্তমানের এত কথা বলা চলে না; বহিঃস্থ গুপ্তচরেরও একটু প্রয়োজন হয়। কবিবর ভিক্টর হ্যাগো বলিতেন,—"আমি এক মন্ত্র দ্বারা একপাল মেষ মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু আমার মন্ত্রের সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক বিষ থাকা চাই।" বস্তুতঃ, জ্যোতিষের সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহাঁরা খুবই কম জানেন, মোটা রকমের কয়েকটি বঁধিগৎ দ্বারা জ্যোতিষের পরিচয় দিয়া ইহাঁরা জনসাধারণের অর্থ শোষণ করেন এবং সময়ে উল্লিখিতরূপে অবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির স্কন্ধে চাপিতে পারিলে

গ্রহবৈগুণ্যের কথা প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহশান্তির জন্য পূজা অর্চ্চনা বাবতেও বেশ দুপয়সা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই বুঝিবেন যে, সকল ব্যবসায়েরই এমন এক কৌশল থাকে যে, তদ্দ্বারা দুই একটা চতুরতা-পূর্ণ কথা বলিয়া বা দুই একটা অদ্ভুত কর্ম্ম দেখাইয়া সাধারণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মান সহজ। বলিতে কি এরূপ সুযোগ না থাকিলে এইশ্রেণীর ব্যবসা চলিতেই পারে না। যখন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর Magician রা নানারূপ ভেল্কিবাজী দেখান, তখন তাহাদের হাতের "সাফাইতে" আমাদের চক্ষু কিরূপ প্রতারিত হয় এবং মিথ্যাকেও কিরূপ দৃঢ় সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে তাহা সকলেই জানেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মন্দকে ভাল বলিয়া ভ্রমজন্মানের প্রবৃত্তি ও কলকৌশল যথেষ্ট অবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ন্যূনাধিকরূপে সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ জ্যোতিষেরাই সন্তোষজনকরূপে ধারাবাহিক কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। হঠাৎ দু একটা সত্য হয়, আর অধিকাংশই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু তথাপি প্রণামীর পরিমাণ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না। অতীত ঘটনার কথা কোন কৌশলে কতকটা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেই গণকদিগের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু লোকে অতীতের কথা শুনিতে উৎসুক নহে। ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ ফলাফল জানাই লোকের লক্ষ্য। যে ভাবী ঘটনার সত্যতা তন্মুহূর্ত্তে প্রমাণিত হইবে না,

গণকগণ তাদৃশ ভবিষ্যৎগণনা অতি সহজে ও নিঃশঙ্কচিত্তেই করিয়া থাকেন।

একটু ধীরভাবে ও স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই সমাজে কতপ্রকার কতমূর্ত্তিতে ও কতভাবে যে এই পাপ ফাঁকি ব্যবসায় চলিতেছে তাহা উপলব্ধি করিয়া দুঃখে অভিভূত ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইবে। সহর বল, বন্দর বল, আর গ্রাম বল, ফাঁকিব্যবসা, ফাঁকিবাজব্যবসায়ী না আছে কোথায়? গ্রামে কতকগুলি ধূর্ত্তশ্রেণীর মোড়ল গ্রাম্য দলাদলির আড়ৎদার। ইহারা গ্রামে দলাদলির আগুন জ্বালাইয়া গ্রামবাসিদিগের পরস্পরের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা বাঁধাইয়া দেয়, এবং কোন এক পক্ষে মোকদ্দমার তাদ্বির উপলক্ষে বহু অর্থ ফাঁকি দিয়া অপলাপ করে এবং ঐ দলের লোক দ্বারা নানারূপে তাহার বৈষয়িক কাজ করাইয়া লয়।

গরীবসম্পাদক মাত্র মাসিকপত্রখানি বাহির করিয়াছেন। এমন গ্রাহক হয় নাই যে, সেই গ্রাহকের প্রদত্ত অর্থে পত্রিকা চলিবার কাজ সুনির্ব্বাহ হইতে পারে। তিনি ফাঁপড়ে পড়িয়া কোন বড়লোকের নিকট যাইয়া তাঁহার ছবি পত্রিকায় ছাপাইবেন বলিয়া কিছু আদায় করিয়া লইলেন। ইহার পর পত্রিকার সম্পাদকমহাশয় তাঁহাকে অদ্বিতীয় সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া নীচে নানাবিধ স্তুতি লিখিয়া ছবি বাহির করিলেন। সে ছবিরই বা কত বাহার!—টেরা সিঁথি, কোচান ঢাকাই কাপড়, হাতে ছড়ি বা বহি, অঙ্গুলিতে আংটী, পায়ে মোজা এবং পাম্প-সু, বুকে ঘড়ীচেন, গায়ের

কোটের উপর শাল ঝালর দেখাইয়া দেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মোট কথা, যত রকম রাংতার কাজ করা সম্ভব তাহার কিছুই বাকী নাই এবং ফটোগ্রাফে উঠিতে তাহার যেন কোন একটাও বাদ না যায়, বা আড়ালে না পড়ে, তজ্জন্য যে বিশেষ লক্ষ্য, ছবি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। এইরূপে অঙ্কিত ময়ূরবিহীন সেই কার্ত্তিকটির ন্যায় ছবি খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং ছবির অঙ্গে অঙ্গে নিরক্ষর ও নীরব তোষামোদের সেই বিরাট্ কবিত্ব দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় যে উপযুক্ত শিকার করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাহাও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা বা অকর্ম্মা লোক আছে তাহারা বড় আদমির পুচ্ছের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সর্ব্বদা ধনী বড়-লোক, উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী বা হাকিমদিগের গা ঘেষিয়া থাকাই তাহাদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর লোকেরা সেই সুপা-রিশের বলে দু পয়সা উপার্জ্জন করে,—সাধারণের নিকট মাতব্বর পরামাণিকরূপে পরিচিত হয়, রাজা মহারাজার দর-বারে যায়, তথায় উপাধি প্রাপ্তির সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া কিছু পসার প্রতিপত্তি করিয়া লয় এবং বড় বড় সামাজিক দলাদলিতেও যোগ দিয়া থাকে। লোকের কাছে "বার হাত কাকুড়ের তের হাত বীচির" ন্যায় বড় বড় গল্প করিয়া আসর জমকানই ইহাদিগের চিরন্তন অভ্যাস।

জামাতা এখন অনেকস্থলেই "আলালের ঘরের দুলাল"। শ্বশুর শাশুড়ী ও পত্নীর সহিত ব্যবহারে নবাব সেরাজউদ্দৌলার

বড় ভাই। এখন বর বা বরপক্ষ কখন কন্যাপ্রার্থীরূপে কাহা রও দ্বারে উপস্থিত হন না। কন্যার পিতা বা তৎপক্ষীয় লোকেরাই এক্ষণ কন্যাদানার্থ যাচমান হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব সহ বর বা বরপক্ষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হন। তথাপি জামাইবাবু বা তৎপক্ষের মন পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। অনেক শিক্ষিত জামাতা বিবাহিতা পত্নীর উপর অসহনীয় অত্যাচার দ্বারা সেক্ষপীয়রের সাইলকের মত কন্যাবৎসল শ্বশুরের বুকের মাংস কাটিয়া লইতে চেষ্টা করেন। কত জামাতা অর্থলোভে বা অন্য কুৎসিত প্রলোভনে নিরপরাধা পত্নী ত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আমাদিগের পরিচিত কোন ভদ্রসন্তান দ্বারা অল্পদিন হইল, এমন এক জঘন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে যে, তাহা শুনিলে সজ্জন মাত্রেরই মনঃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। এই ভদ্রকুলপাংশুল বিবাহিতা পত্নীর যাবতীয় অলঙ্কার, বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই, বিক্রয় করিয়া, বিক্রয় লব্ধ সকল অর্থ অপব্যয়পূর্ব্বক, শ্বশুরের নিকট হইতে আরও অর্থ শোষণ উদ্দেশ্যে, পত্নীর উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, স্ত্রী তাহা সহিতে না পারিয়া পিতৃ গৃহে আশ্রয় লইল। ইহাতে সুযোগ্য জামাতা শ্বশুরের প্রতি কন্যা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত একবারেই খাড়া শমন জারী করিয়া বসিল। শ্বশুর কিছু দিন পরে কন্যা ছাড়িয়া দিবেন বলিলেন; গুণধরের বিলম্ব সহ্য হইল না। জামাতাবাবাজী অমনি দুই শত টাকা যৌতুক পাইয়া আর এক ভদ্রলোককে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়া

দিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ পূর্ব্বক আপন বাহাদুরী ও ক্ষমতা খ্যাপন করিলেন! ধিক্ এমন কন্যাদায়ে—শত ধিক্ এমন কুলাঙ্গার দস্যুস্বভাব পাষণ্ডকে, আর দ্বিতীয় বার বররূপে নির্ব্বাচনকারী ব্যক্তিদিগকে! যে শিক্ষায় মানুষকে এমন গলাকাটাদস্যুতে পরিণত করে, তাহাও কি না আবার শিক্ষা? আর তাদৃশ শিক্ষিতের আবার মনুষ্যত্বের গৌরব ও শিক্ষাভিমানের এই বাহাদুরী? সমাজ যে ইহা নীরবে সহিয়া লইতেছে এ বস্তুতই যারপর নাই বিস্ময়াবহ ও দুঃখ জনক।

ছেলের বাপ ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া বাজারে পাঠাইতেছেন, আর কন্যাদায়গ্রস্তগণ পরীক্ষাপাসের ওজন হিসাবে কোথাও দুই হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার মূল্যে মেয়ের বিবাহের জন্য ছেলে খরিদ করিয়া লইতেছেন, ইহা ঠিক্ ফাকি ব্যবসায় না হইলেও ডাকাতি ব্যবসায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ বা বংশ মর্য্যাদা বিক্রয় করিয়া খাইতেছেন;—কুলীন কন্যা, অর্থের লোভে, নিতান্ত হীন বংশ-মর্য্যাদার ব্যক্তির কাছে যাইয়া পড়িতেছে। আজ কাল কন্যা-দায়ে যে কতলোক একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছেন—কত লোক আজীবন ঋণের বোঝা বহন করিয়া নানারূপে অপমান ও লাঞ্ছনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অকালে কালের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সকল ক্ষেত্রে সময় সময় এমন বর্ব্বরোচিত ব্যবহার হয় যে, পশুর মধ্যেও তাহা সম্ভবে কি না সন্দেহ।

যে পরিণয় সংসারধর্ম্মের মূলভিত্তি তাহাও অনেক স্থলেই ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের ঘটকগণ যে, আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, সময় সময় সাধারণ ভদ্র আখ্যাধারীকে গঙ্গাস্রোত কুলের কুলীন সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—প্রচুর পুরস্কার লোভে, কালো অপরাজিতার কলির অঙ্গে যে পদ্ম বা গোলাপের রঙ্ ফলাইতে প্রয়াস পান এবং শৌণ্ডিকালয়ের গঞ্জিকারঞ্জনকে জিতেন্দ্রিয়কুলতিলক রূপে প্রতিপন্ন করিয়া যে বঞ্চনার ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার পরে শিক্ষাপ্রাপ্ত পাস করা বরের পিতা অথবা তাদৃশ শিক্ষিতবর স্বয়ং ঠিক্ বঞ্চনার ভাবে না হইলেও চতুর চালের অনুকরণে, নিষ্পেষণ পূর্ব্বক, সময়ে সময়ে কন্যার পিতার সর্ব্বস্বান্ত সাধন করেন; কখন কখন বা এই উদ্দেশ্যেই বিবাহিতা কন্যার উপর অমানুষিক উৎপীড়ন করা হয়, সমাজের পক্ষে তাহাও এক্ষণ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। ঈদৃশ অত্যাচার যখন ডাকাতি নামে অভিহিত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডার্হ হইতেছে না, ইহার অঙ্গে বঞ্চনার গন্ধই যখন সমধিক মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে, তখন আমি এগুলিকেও প্রকারান্তরে ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়েরই অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম।

এক দিন এদেশে কন্যাপ্রার্থী উপযুক্ত বরকে কন্যার পিতা যথাযোগ্য আদর সহকারে, আপন গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, নানা উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক, কন্যাদান করিতেন। কখনও ষোড়শোপচারে সাড়ম্বর আয়োজনে ঐ

দানক্রিয়া সম্পন্ন হইত; কখন বা মাত্র ৫ পাঁচটি হরিতকী যোগেও কোনপ্রকারে ইহার সাত্বিক অনুষ্ঠানটুকু হইয়া যাইত। যাঁহার যেরূপ আর্থিক সংস্থান, তিনি তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়াই কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন। এদিকে জামাতাও সাংসারিক সম্পদে যতই বড় অথবা যতই দরিদ্র, হউন না কেন, পূজার উপচারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সহধর্ম্মিণী লাভেই পরিতৃপ্ত হইতেন। সেই সহধর্ম্মিণীর শত ত্রুটি, শত অভাব সহিয়া লইয়া, মিষ্ট মধুর ব্যবহার ও সদুপদেশ দ্বারা, তাহাকে পতির মনোমত এবং পতির সাংসারিক অবস্থার অনুরূপ করিয়া লওয়া হইত। যাহার গর্ব্ভজাত সন্তান একদিন জল-পিণ্ড দান দ্বারা পতির ও পতির পিতৃপুরুষের পারত্রিক মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, সে সহধর্ম্মিণী কখনও অনাদরের বস্তু নহে। এই উদার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এ দেশের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর গৌরবাত্মক আসনের প্রতিষ্ঠা করা হইত। কিন্তু হায়! সেই দেশে কাল মাহাত্ম্যে আজি এ কি দেখিতেছি? এক্ষণ অনেক স্থলেই বঙ্গের সুশিক্ষিত ও আলোক-প্রাপ্ত বরেরা রূপ, কুল মান বা গুণ-গরিমাদির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন না। তাঁহারা যেন স্নেহ প্রীতি দয়া ও ধর্ম্মের পুণ্যময় আভরণের পরিবর্ত্তে নগদ সম্পত্তির প্রচুর যৌতুক সংবলিত সোনা রূপা পাথর ও তামা কাঁসার তৈজস-মণ্ডিত, স্বর্ণালঙ্কার সজ্জিত সাজের পুতুল বিবাহ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। ইহার ফল এই হয় যে, কোন স্থলে ঈদৃশ পরিণয়ের সেই গৃহলক্ষ্মী, গৃহকর্ম্মার সমস্ত গোল্লায় দিয়া,

সাজের পুতুলরূপেই খট্টায় বসিয়া হাওয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। কোন স্থানে বা বিলাসিনীর ফুলশয্যায় শয়নপূর্ব্বক আলস্যের হাই তুলিতে তুলিতে, দিবাকে নিশায় পরিণত করিয়া লইয়া, বঙ্গগৃহে এক অভিনব অদ্ভুত সংসার পত্তন দিয়া বসেন। কোন কোন স্থানে দুর্ব্বৃত্ত নিষ্ঠুর পতির দুর্ব্যবহারে তিনিই আবার চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অথবা, নয়নজলে ভাসিয়া অকালে মৃত্যু মুখে গা ঢালিয়া দেন।

ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসা

(বিজ্ঞাপন)

এক দিন এদেশে আত্মহত্যা ও আত্মপ্রশংসা তুল্য পাপ-রূপে গণ্য ছিল। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে র্ভৎসনা করিয়া, যেই আত্মহত্যা দ্বারা সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি পাণ্ডবসখা বাসুদেব তাঁহাকে এই সাংঘাতিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিন্দারূপ মহাপাতকের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ, আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন, ইহার পরে, বাসুদেবের আদেশ অনুসারে, আত্মপ্রশংসা পূর্ব্বক, আপনাকে প্রকৃতই লজ্জায় মৃতবৎ অনুভব করিয়া ছিলেন। এখন আর আত্মপ্রশংসায় নিন্দা বা লজ্জা নাই ; বরং উহাই এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের মুখ্য উপায়। আজিকালিকার দিনে আপনার বাহাদুরী আপনি ব্যাখ্যা না করিলে, আপনার ঢাক

আপনি না বাজাইলে, কোনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিরই পথ পরিষ্কার হইয়া আসে না। পূর্ব্বে বেদব্যাসের বুদ্ধিও, বহু সাধনায় তত্ত্ব রত্ন আবিষ্কার করিয়া, আপনার নামে সেই কৃতিত্ব ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হইত, এবং সময় সময় উহা ভগবদোক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, আপন প্রাপ্য যশ ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। কিন্তু অধুনা রাম শ্যামও প্রতিনিয়ত ব্যাস বাল্মীকির ঘরে সিঁদ দিয়া আপনার যশঢক্কায় পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তুলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। দেশ কাল ও পাত্রভেদে কি না সম্ভব পর ?

এই আপনার প্রশংসা আপনি গাইবার সর্ব্বপ্রধান উপায় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের প্রসাদে অনায়াসে, পাচক ঠাকুর বিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্য, বিলাসের কীট মহাযোগমগ্ন যতি বা সন্ন্যাসী, কামুক কুক্কুর জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, পথের ভিখারী নবাবজাদা, আফ্রিকার কাফ্রিও কান্তিমান্ কার্ত্তিক বা কন্দর্প এবং অক্ষরজ্ঞানশূন্য গর্দ্দভও যোগ্য বিজ্ঞ গ্রন্থকাররূপে গণ্য হইতে পারে। এই সম্মোহন মন্ত্রবলে, বিজ্ঞাপন আজি বহু ফাঁকি বা বঞ্চনাব্যবসায়ের অমোঘঅস্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, কাল ধর্ম্মে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করিলে, যথার্থ গুণরাশিও আকরস্থিত মণির ন্যায় চিরতিমিরাবৃত রহিয়া যায়। জগতের কোন প্রয়োজনেই উহা লাগে না। সুতরাং যাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন, তাহাই যে কৃত্রিম ও অসার, যদিও এমন কথা বলা যাইতে পারে না, তথাপি বঞ্চনার চতুর চালে বিজ্ঞাপন

যে অন্যতর শ্রেষ্ঠ অবলম্ব ও সহায়, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপনের বলে এ দেশে যে সকল ফাঁকি বা বঞ্চনার ব্যবসায় চলিতেছে, তাহার মধ্যে পেটেণ্ট বা হাতুড়ে ঔষধের ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও মারাত্মক। অসংযত জীবন ও অমিতাচারের পরিণাম ভগ্নস্বাস্থ্যের অবশ্যম্ভাবি ফলে, এক্ষণ অনেকেরই অকালে ইন্দ্রিয়লুপ্ত হয় বা টাক পড়ে, অনেকে উপদংশ বা প্রমেহ ইত্যাদি লজ্জাজনক পীড়ায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে; অনেকের যৌবনেই ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়। ম্যালেরিয়ার বীজাণু বা বিষ ত আজি বাঙ্গালার নগর বন্দর গ্রাম ইত্যাদি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান। ইহার পরে বিলাসিতারও তেমনই সর্ব্বব্যাপক অসহ্য কণ্ডুয়ন। বাজারে যে মালের যত প্রয়োজন, সেই মালেরই আমদানী তত বেশী। এই হেতুই পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে "প্রমেহে রাবতসিংহ, উপদংশধন্বন্তরিরস জীর্ণজ্বরবিঘাতন বটী, কেশ রঞ্জণী বা কেশবর্দ্ধনতৈল, মুখশ্রীবর্দ্ধিনীরেণুকা এবং ইন্দ্রিয়সঞ্জিবনী বা ধ্বজভঙ্গনাশিনী বটিকা ইত্যাদি নামধারী কত সন্ন্যাসীপ্রদও অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপন যে হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কোন কোন মাদুলি বা ঔষধ সর্ব্বরোগ নাশী রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। একমাত্র ঔষধ সকল লোকের সর্ব্বরোগ নাশক, এই উক্তি যে কি রূপ হাস্যাস্পদ ও অসার, যাঁহার সামান্য একটুকু বুদ্ধি আছে, অথবা যাঁহার

শারীরবিজ্ঞান নিদানতত্ত্বে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান আছে তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের সে বুদ্ধি হয় না। তাহারা মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল কবচ বা ঔষধ ক্রয় করে এবং পরিণামে বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত হইয়া লজ্জায় আর ওকথা মুখের বাহির করিতে সাহস পায় না।

এই সকল ঔষধের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রশংসা-পত্রও প্রচারিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনদাতা কখন কখন স্বয়ং রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অপ্রকৃত ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরযোগে প্রশংসাপত্রের অবতারণা করিয়া লন। কখন কখন মোলায়েম তৈল মর্দ্দনের কৌশলে প্রশংসা পত্র সংগৃহীত হয়। ঔষধ ব্যবহারে যাহারা কোনরূপ ফল প্রপ্ত হয়, তাহারা যেমন চিঠিতে ঔষধে গুণ ব্যাখ্যা করে, যাহারা ফল পায় না, তাহারা আবার তেমনই উহার নিন্দা বাদ লিখিয়া পাঠায়; কেহ কেহ আবার ঔষধের যে অংশে গুণ ও যে অংশে দোষ আছে, দুই-ই লিখিয়া পাঠায়। বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞাপনদাতা প্রশংসাটুকুই প্রচারে করেন, দোষের কথাটুকু একবারেই তুলিয়া ফেলিয়া দেন। যাহা হউক, এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন ও প্রশংসা বাদ প্রচারের ফলে, যেমন প্রকৃত ঔষধের, তেমন ফাঁকি ব্যবসায়ীর কৃত্রিম ঔষধের, প্রসার এবং প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে কত বঞ্চক বা ফাঁকিবাজ—পেটেণ্ট ঔষধ-বিক্রেতাও যে খাটি ঔষধ বিক্রেতা সৎব্যবসায়ীর সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিশালী বড় মনুষ হইয়া উঠে, কে তাহা গণনা করিবে?

ফাঁকিবাজী ব্যবসায়ের মাদুলী ও কবচ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া যাহারা বিড়ম্বিত হয়, তাহাদিগের অর্থনাশে সাময়িক মনক্ষোভ ভিন্ন আর কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা ফাঁকিবাজের কৃত্রিম ঔষধ সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধি বুঝিয়া ব্যবহার করে তাহাদিগের প্রথম অর্থনাশ হয়, পরে স্বাস্থ্যনাশ ও প্রাণ-সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

চুপে চুপে বিজ্ঞাপন প্রচারিত অব্যর্থ ঔষধ ব্যবহার দ্বারা উপদংশ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গাদি, রোগের বহু লোককে অবশেষে কুষ্ঠাশ্রমের অতিথি, মূত্রকৃচ্ছ্রের কঠোর আক্রমণে চিরজীবন শয্যাশায়ী এবং পুরুষত্বহীন হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইতে হইয়াছে। অনেকে পেটেণ্ট ঔষধের অযথা ব্যবহারে অকালে মৃত্যুমুখে গড়াইয়া পড়িয়াছেন। কেহ যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দুঃখে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইবে। যাহারা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন লইয়া এইরূপ খেলা করিতে অভ্যস্ত এবং অর্থ লালসায় ঈদৃশ চাতুরী, বঞ্চনা বা ফাঁকিবাজীর আশ্রয় লইতে প্রস্তুত, তাহারা কিরূপ ভয়াবহ জীব বা মারাত্মক জনোয়ার, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যেমন রাজ-বিধি, তেমন সমাজবিধি, এই উভয়ের নিকটই তাহারা দণ্ডার্হ সন্দেহ নাই। এইশ্রেণীর বঞ্চনা দ্বারা একদিকে কৃত্রিম ও অনুপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারে যেমন হয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু অনিষ্ট, তেমন হয় এই বঞ্চনার মিশালে খাটি ও ভাল ঔষধের অনাদরে সাধারণের অপকার। কিন্তু এ পাপের প্রতিকার কি ও পরিণতি কোথায় ইহাই এক্ষণ প্রশ্ন।

হাতুড়ে চিকিৎসক।

যেমন হইয়াছে বাজারে এই সকল কৃত্রিম ও মানুষমারা পেটেণ্ট ঔষধের আবির্ভাব, তেমন হইয়াছে ভূঁইফোঁড় সহস্রমারী হাতুড়ের প্রাদুর্ভাব। ইহারা চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুমাত্র অধ্যয়ন না করিয়াই, ডাক্তারী ব্যবসা করে। একটি সত্য ঘটনার কথা এখন উল্লেখ করিতেছি। একবার এইরূপ এক গ্রাম্য হাতুড়ে-ডাক্তার একটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছিল; রোগীটি ভয়ানক মারাত্মক শ্রেণীর জ্বর ও কাশরোগে আক্রান্ত। যখন রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত, তখন আত্মীয়স্বজনেরা বেগতিক দেখিয়া অন্য একটি ভাল ডাক্তার আনাইলেন। রোগীর তখন হিমাঙ্গ অবস্থায় নাড়ীর ক্রিয়া প্রায় স্থগিত হইয়া আসিতেছিল,—শরীরের উষ্ণত্ব প্রায় নাই বলিলেই হয়—এতদ্দৃষ্টে হাতুড়ে ডাক্তার বলিলেন যে, আপনাদের ইচ্ছা হইয়াছে, অন্য ডাক্তার আনিতে পারেন, কিন্তু জ্বরটা আমি সারাইয়া দিলাম; এখন কশিটা শুধু বাকী; বলা বাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর কাশি এবং জ্বর চিরতরে ভাল হইয়া গেল! এইরূপে অকালে কুচিকিৎসায় এক জনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। এইরূপ যে কত স্থানে কতরূপ দুর্ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এতদ্ব্যতিরেকে দানরী ওঝা ইত্যাদি কত শত ফাঁকিবাজ "ফুকা" বা "ঝাড়াপোছা" করিয়া বা ভূতের বা পেত্নীর দৃষ্টি ছাড়াইয়া এবং তৎসঙ্গে নানারূপ অকর্ম্ম করিয়া অজ্ঞ

জনসাধারণের নিকট হইতে সময় সময় বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সহর অপেক্ষা গ্রামেই এই শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব বেশী।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কালধর্ম্মে সাধুনামে সম্মানিত ব্যবসায়ী মহাজনদিগের মধ্যে অনেকেই এখন বঞ্চক চূড়ামণি, ভয়ানক ফন্দিবাজ ও ফাঁকিবাজ হইয়া ব্যবসায়ের অঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। শুধু তাহরাই নহে— ঔষধ বিক্রেতা, হাট বাজারের সামান্য দোকানদার, এমন কি ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত অনেক স্থলেই, বঞ্চনা ও ফাঁকিব্যবসায়ের আশ্রয় লইয়া, সামান্য দুইটি পয়সা লাভের প্রত্যাশায়, লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ভেজাল দেওয়া খাদ্য, কৃত্রিম ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বঞ্চক ব্যবসায়িগণ একদিকে যেমন লোকের অর্থশোষণ করিতেছে, অন্যদিকে আবার তেমনই সঙ্গে অখাদ্য বা কুখাদ্য মিশাইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং অনেক স্থলে প্রাণনাশেরও সূত্রপাত করিয়া দিতেছে। কিন্তু কেহ যদি বঞ্চকের চাতুরীতে ভুলিয়া কাঞ্চন জ্ঞানে কাঁচ ক্রয় করে, তাহাতে তাহার অর্থনাশ ও সাময়িক মনস্তাপ ভিন্ন অন্য কোনরূপ মারাত্মক অনিষ্ট ঘটে না। কিন্তু যদি কেহ রোগের যন্ত্রণা প্রশমনার্থ ঔষধ নামে বিষ ক্রয় করে, খাদ্যজ্ঞানে অখাদ্য বা কুখাদ্য কিনিয়া লয়, তাহার পরিণাম কি ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। স্বাস্থ্যহানি—অকালমৃত্যু ও

পাপাচারের বৃদ্ধি, এই সকল দুষ্কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল।

এক্ষণ হাট, বাজার, বন্দর যেখানে যাও ভেজালের স্তুপ হইতে খাঁটি জিনিষ বাছিয়া লইতে ভয়ানক বেগ পাইতে হইবে। ইহাতে চক্ষুষ্মান্‌ব্যক্তির চক্ষেও অনেক সময় ধাঁধাঁ লাগিয়া থাকে। ভেজাল নাই কোথায়? দুগ্ধ বিক্রেতার কাছে দুগ্ধ কিনিতে যাও, দেখিবে তাহার ভাঁড়ের মধ্যে শ্বেতবর্ণের জলরাশি ফেনিল-শোভা ফলাইয়া, খাঁটি দুধ ও মিঠা দুধ বলিয়া আপনার নাম ঘোষণা করিতেছে! কিন্তু লোকের কাছে ধরিলেই উহা হইতে 'পানাপচা পুকুরের' দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া ঐ দুগ্ধ কি পদার্থ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে। কিন্তু উহাতে কলের জল, কূপোদক বা নদ্যম্বু মিশ্রিত থাকিলে আর এরূপ ধরা পড়িবে না। মাঠার সম্বন্ধেও ঐ কথা। মাখন কখন কখন রেড়ির তৈলের সাহায্যে কলেবর পুষ্ট করিয়া লয়। মৃতবৎসা গাভীদোহনের লোমহর্ষণ ব্যাপার বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এতদূর বীভৎস অত্যাচার কিরূপ পাপাচরণে ডুবিলে সম্ভবপর তাহা সহজে অনুমান করা যায় না। ফেরিওয়ালার ভাঁড়ের মধ্যে কখন কখন ঘৃত তবকের চমক দেখাইয়া লোকের নয়ন অকর্ষণ করিতে থাকে; কিন্তু ক্রেতা কেমনে বুঝিবে যে উহার বার-আনাই সাপের চর্ব্বি। বাজারে সময় সময় ছাগমাংসের সঙ্গে কুকুরের মাংস মিশ্রিত থাকে। সরিষার তৈলে এরণ্ড তৈলের সংযোগ অনেক সময়েই পরিলক্ষিত হয়।

ফেরিওয়ালা ঔষধ বিক্রেতাদিগের মধ্যে, মাঝে মাঝে, যে কৌশলময় বঞ্চনার ব্যবসায় চলে, তাহা শুনিলে মনঃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। এই ফেরিওয়ালা কবিরাজদিগের কেহ কেহ জারিতস্বর্ণরূপে স্বর্ণমাক্ষিকের সূক্ষ্ম গুড়া, রূপার পরিবর্ত্তে রসাঞ্জন চূর্ণের সূক্ষ্ম অংশ, স্বর্ণসিন্দুর রূপে হিঙ্গুল চূর্ণ বা রসসিন্দুর চূর্ণ বিক্রয় করে। তাহাদিগের কস্তুরী বন-কস্তুরার বীজ কচ্ছপের রক্তের সহিত ইন্দুর বা ছুঁচার রোমযোগে বাটিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং আসল কস্তুরীর ঠোঙ্গায় উহা ভরিয়া রাখিয়া উহাতে কস্তুরীর গন্ধ ফলান হইয়া থাকে। তাহাদিগের অভ্র তামা ও রাঙ্ প্রভৃতি সমস্ত ঔষধের উপকরণই এইরূপ কৃত্রিম বস্তুর রূপান্তর মাত্র। এই শ্রেণীর ফাঁকিব্যবসায়ী বঞ্চক দিগের উপযুক্ত দণ্ড কি, বিজ্ঞ পাঠক একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। ধরা পড়িলে, আইনের শাসনে, এই সকল বঞ্চকদিগের দণ্ড হয় বটে, কিন্তু তাহাতে দেশব্যাপী এই পাপের স্রোতের দুর্দ্দমগতি ক্ষণকালের তরেও নিরুদ্ধ রহিতেছে কি? এইরূপে প্রতিষ্ঠাবান্ অনেক কবিরাজের কবিরাজী ঔষধেও দারুণ ভেজাল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই সমস্ত অঙ্গহীন কৃত্রিম ঔষধের মূল্যও "খাটি ঔষধ" বলিয়া আসলের মূল্যের হারেই কবিরাজ বা ঔষধব্যবসায়িগণ আদায় করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ঔষধে যে রোগীর কোন ফল হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। ফলে দোষ পড়ে—আমাদের পৃথ্বীপূজ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের। আজ কাল বাবুদের "শস্তা শস্তা" করিয়া চীৎকারও এই শ্রেণীর ভেজাল বা পাপকর্ম্মের এক অন্যতম কারণ।

যোথ কারবার।

যাহারা ফাঁকি ছল বা বঞ্চনার আশ্রয় লইয়া অর্থ উপার্জ্জন বা কোনরূপ স্বার্থ সাধন করিয়া লয়, তাহাদিগের কৃত অনুষ্ঠান ও কার্য্য-প্রণালীকেই "ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়" নামে অভিহিত করিয়া এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যে অধুনা যে ফাঁকিবাজী ছল-চাতুরী ও জুয়াচুরী চলিয়াছে, সংক্ষেপে সেই সকল ব্যবসা বাণিজ্যের কথাই বলা যাইতেছে।

এ দেশে, একসময়ে, ব্যবসায়ী বণিক্‌সম্প্রদায় সাধু নামে আখ্যাত হইতেন। তাঁহাদিগের আর এক নাম মহাজন। প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ বণিক্ চন্দ্রধর বা চাঁদসওদাগর, শ্রীমন্ত-সওদাগর ও শাহসওদাগর প্রভৃতি সাধু নামে সম্মানিত ছিলেন। দেখা যায়, এদেশের রাজা ও সওদাগর, প্রচলিত পুরাতন অখ্যায়িকার সম্মানের হিসাবে, পাশাপাশিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যে দেশের বাণিজ্যে এক্ষণ প্রকৃতই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, সেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বণিক্ সম্প্রদায় বস্তুতঃই দেশের অন্যতম শক্তি-রূপে সম্মানিত ;—মান মর্য্যাদা ও আত্মগৌরবের হিসাবে তাহা-দিগের অধিকাংশই প্রকৃত মহাজন ও যথার্থ সাধুপদ বাচ্য। ব্যবসায়িদিগের এই সাধু আখ্যা নিরর্থক ছিল না। ব্যবসায়ীর মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ চলিত। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হইলেও তাঁহাদিগের কথা নড়িত না। কালধর্ম্মে আজকালের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও এদেশে এখনও অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী সর্ব্বাংশে সাধু বা মহাজন নামে

অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য, তথাপি কতকগুলি আত্মসম্মান ও আত্ম-গৌরব জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর বঞ্চক, ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সাধু ও মহাজন নামে দুরপনেয় কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। অনেক ব্যবসায়ী কারবারী মহাজন দেউলিয়া নাম লেখাইয়া বহু লোকের বহু প্রকারের গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিয়া বসেন। দেউলিয়া নাম লিখাইয়া এইরূপে বঞ্চনার ব্যবসা আজ কাল অনেক স্থলেই হইতেছে। ফলে, কোন স্থানে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে এখন সকলেই অতি শঙ্কাবোধ করেন ; এবং ইহাতে যে দেশে কোন লগ্নী বা মহাজনী বা অন্যবিধ কোন বড় কারবার চালাইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পাটের কারবারে বঞ্চনা বা জুয়াচুরীর অনন্ত প্রকারের প্রক্রিয়া হয়। আমি তৎসমুদয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। নানাকারণে ফেল হইবার উপ-ক্রম দেখিলে বা বিনা আয়াসে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার অভিপ্রায়ে, প্রথমে অগ্নিদাহ জনিত ক্ষতিপূরণ লাভার্থে, কোম্পে-নীর পাট বীমা করতঃ, দু'চারিমণ পাট গুদামে রাখিয়া, নিজেরাই সুকৌশলে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক, তৎসমুদয় ভস্মীভূত করিয়া, বীমা কোম্পেনীর নিকট হইতে লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ বাবত আদায় করিবার চেষ্টা করা হয়। এই শ্রেণীর দিনেডাকাতি আজ কাল প্রতিনিয়তই দুই একটা ঘটিতেছে। সাধু নাম এক্ষণ অনেক স্থলেই ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সহাস্যমুখে কাহাকেও এখন সাধু বা মহাজন নামে সম্ভাষণ করিলেই লোকে সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে ভাক্ত, ভণ্ড, বিড়ালতপস্বী, ধূর্ত্ত বা শঠ বলিয়া

ধরিয়া লয়। ব্যবসায়ীর সাধু নামে এ কলঙ্ক কেন, তাহারই দু'একটি কথা কহিব।

দশ জনের মূলধন, কোন একটা নির্দ্দিষ্টহারে, একত্র সংগ্রহ করিয়া কোন ব্যবসা চালাইলে তাহাকেই যৌথ কারবার বলা হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের এক একটা যৌথ কারবার পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর অপরিসীম কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এ হতভাগ্য দেশে, বিদেশের অনুকরণে, মাঝে মাঝে যৌথ কারবার খোলা হইতেছে সত্য, কিন্তু একটিও স্থায়ী হইতেছে না। প্রায় সকল গুলিই, বড় বড় আশার বড় বড় কথা বড় গলায় ঘোষণা করিয়া, পর্ব্বতের মূষিক প্রসব বা আকাশ কুসুমের ন্যায়, পরিশেষে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া যাইতেছে। অনেক সময়ই অংশীদারগণ, মূলধনে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইয়া, যৌথ কারবারের নামে শত ধিক্কার দান ও অজস্র অভি-সম্পাত প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ধীরভাবে অনুসন্ধান করিতে গেলে অধিকাংশস্থলেই কর্ম্মচালকদিগের সাধু ব্যব-সায়ের নামে ঘোরতর অসাধুতা, অনুচিত স্বার্থপরতা, জঘন্য বঞ্চনা বুদ্ধি ও ফাঁকিবাজীর পরিচয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিতে হইবে। কোন কোন স্থানে কর্ম্মকারকদিগের অক্ষমতা বা কর্ম্মে অপটুতা, ঈদৃশ ব্যবসার ফেল পড়িবার কারণরূপে অনুভূত না হয় এমন নহে। কিন্তু উহার সংখ্যা বড় কম। কর্ম্মে অক্ষমতা দূষণীয় হইলেও মার্জ্জনীয়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা কখনও মর্জ্জনীয় নহে। এক সরল প্রাণ সাধু অর্থাৎ আক্তি

কালিকার হিসাবে এক বোকারাম তাদৃশ অন্য বোকারামকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের চতুর চালাক নামধারী অর্থাৎ যাহারা ধূর্ত্ত নামে পরিচিত হইতে পারা গৌরবাত্মক মনে করে, অমন গৌরবান্বিত এক মহাপুরুষ অন্য তাদৃশ মহাপুরুষের উপর কোন প্রকারেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। ইহাও এদেশের যৌথ কার-বার ফেল পড়িবার অন্যতম কারণ। বঞ্চনা, কর্ম্ম চালাইবার অপটুতা এবং বিদেশ হইতে যাহারা কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আসেন তাহাদের নিতান্তই কাচা রকম শিক্ষা, আমাদের বিলাসপ্রিয়তা এবং আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার-পরাঙ্মুখতা এই সকল কারণে দেশে কোন উন্নতিপ্রদ যৌথ ব্যবসায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা বীমা কোম্পানী।

আজি কালিকার এই দুর্দ্দিনে অপরিহার্য্য দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন নির্ব্বাহ এবং সেই সঙ্গে দেশ-ব্যাপক বিলাসিতার অনুরোধ রক্ষা এই দুই কুল বজায় রাখিয়া অনেকের ভাগ্যেই ভাবীকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা বীমাকোম্পানী, এক এক স্থানে এক একটা মঙ্গল বিগ্রহের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া, দেশের ধনী ও দরিদ্রদিগকে সুমধুর আশ্বাসবাক্যে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতেছে যে, যে যেখানে আছ—আইস, তোমাদের কষ্টার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ, বিশ্বাসপূর্ব্বক, আমাদের হাতে সঁপিয়া দেও; পরিমাণে

বা প্রয়োজন মতে নির্দ্দিষ্ট সুদ সহ ঐ টাকা বুঝিয়া পাইবে এবং উহা তোমাদিগের ভাবীকালের প্রধান সম্বল হইতে পারিবে। তুমি ধর্ম্মার্থিনী দুঃখিনী বিধবা,—আইস, তোমার ভিক্ষালব্ধ ও কায়ক্লেশে অর্জ্জিত ঐ পুটলীটি আমাদিগের কাছে রাখ! আমরা তীর্থ বীমা কোম্পানী,—তীর্থ যাত্রা সময়ে তোমাকে উহা দেড়া বা দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিব। আমরা বিবাহ বিমা কোম্পানী,—তুমি কন্যা দায়গ্রস্ত ও বিপন্ন; তোমার সঞ্চিত অর্থ আমাদিগের কাছে রাখিয়া দেও, কন্যাদান সময়ে উহা দ্বিগুণিত করিয়া দিব। জীবন বীমা বলিতেছেন,—মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা দেও, মৃত্যুর পরে তোমার উত্তরাধিকারী প্রচুর টাকা সম্বল লইয়া সংসার পত্তন করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি আহ্বান কিরূপ আশ্বাস জনক ও আশাপ্রদ তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

এইরূপ আশার ঢোল পিটাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশে জীবনবীমা, তীর্থবীমা উপনয়নবীমা ও বিবাহবীমা ইত্যাদি নামে বহু সংখ্যক বীমাকোম্পানী ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। কত দরিদ্র, কত বিধবা, কত কন্যাদায়গ্রস্তব্যক্তি, প্রাণের সরল বিশ্বাসে, বীমা কোম্পানীর হাতে আপন আপন পুঁজী পাট্টা সঁপিয়া দিয়া, কল্পনার আকাশে অট্টালিকা গড়াইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছে; যথাসময়ে কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য টাকা চাহিয়া পায় নাই। কেহ আদালতের আশ্রয় লইয়া টাকা আদায় করিয়াছে; কেহ কেহকে অনেক যোগাড় যন্ত্র ও তদ্বিরের পরে বহুকষ্টে

কতক টাকা হস্তগত করিয়াই নিরাশপ্রাণে নিরস্ত হইতে হইয়াছে; কেহ কেহবা একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছে। কতিপয় বীমাকোম্পানীর জাল জুয়াচুরী ফাঁকিবাজী ও প্রতারণা ধরা পড়াতে উহার কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কাহাকে কাহাকে আদালতে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে; কোন কোন কোম্পানী কিছু দিন বঞ্চনার ব্যবসায় চালাইয়া একেবারে পটল তুলিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এখনও অনেক প্রভিডেণ্টফণ্ড বা বীমাকোম্পানী, লোকের হিতব্রতে ব্রতী রহিয়া, পদে পদে আপন আপন সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক, সঙ্কল্পিত ব্রতধর্ম্ম যথারীতি পালন করিতেছে সত্য; কিন্তু উল্লিখিত বঞ্চক ও ধূর্ত্তদিগের প্রতারণাব্যবসা হইতে বীমাকোম্পানীর নামেই লোকের যে অবিশ্বাস ও আতঙ্কের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অংশতঃ তাঁহারাও, উহার ফলভোগী হইয়া, অল্পাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। আবার কোন কোন কোম্পানী, দ্বিগুণ ত্রিগুণ দেওয়ার সর্ত্তে, অনেকের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া, প্রত্যর্পণের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, আসল অপেক্ষাও কম বা অর্দ্ধেক টাকা দিয়া, নানা প্রকার ছল চাতুরী প্রদর্শনে, বিলক্ষণ কিছু লুটিয়া লইতে ত্রুটি করিতেছেন না; এবং কোন কোন কোম্পানী একলক্ষ কি দুই লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া, দশ কোটি টাকার কারবার বলিয়া প্রচার করতঃ, অবশেষে দেউলিয়া বা ফেল হইতেছে এবং নিজ নিজ বীমাকারী-গণেরও সর্ব্বনাশের কারণ হইতেছে। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই ফাঁকিবাজী, বঞ্চনা ও চাতুরীর

পাপ-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মনঃপ্রাণ বিস্ময়-বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?—এরোগের প্রতিকার কোথায় ?

জমিদার ও প্রজা।

নিকৃষ্ট সার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ফাঁকি, বঞ্চনা বা প্রতারণার ভাব এবং অন্যায় উৎপীড়নের প্রবৃত্তি, অল্পাধিকমাত্রায়, এক্ষণ দেশের প্রায় সমস্ত সমাজ ও সম্প্রদায়েরই মজ্জাগত সাংঘাতিক ব্যাধিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পরের সেই পুরাতন প্রীতির বন্ধন অধিকাংশ স্থলেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বার্থের প্রবল সংঘর্ষে সে অমৃত-সমুদ্রে গরল উঠিয়াছে। জমিদার ও প্রজা চিরদিনই রক্ষক বা প্রতিপালক পিতা ও স্নেহদয়ার পাত্র পুত্র অথবা আশ্রয় ও আশ্রিতের ভাবে অবস্থিত ছিল। অনেক স্থলে, প্রজাগণ জমিদারকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত ; জমিদারও প্রজার জন্য প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আম, কাঁঠাল বা নারিকেল ইত্যাদি গাছে যথাসময়ে ফল না ধরিলে, প্রজা, দেবতার নামে যেমন মানস করে, জমিদারের নামেও সেইরূপ মানস করিয়া রাখিত এবং ঐ গাছে প্রথম ফল ধরিলেই, বড় যত্নের সহিত, সেই ফল লইয়া, গললগ্নীকৃতবাসে, জমিদারের নিকট উপস্থিত হইত। জমিদারের পাতের প্রসাদী অন্ন আনিয়া খাওয়াইলে পুত্রের পীড়া আরাম হইবে, এই বিশ্বাসে, অনেকে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিত। জমিদারও, তাহার প্রজাগণ কিসে সুখে শান্তিতে

থাকিবে, সতত এই চিন্তা এবং এই সূত্র ধরিয়াই প্রজা শাসন বা প্রজাপালনের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু হায়! দেশের সেই প্রাণ-প্রীতিকর মধুর চিত্র, কালের হিল্লোলে ধুইয়া পুছিয়া, অচিহ্ন হইয়া গিয়াছে!

এক্ষণ অনেক প্রজারই মনের ভাব কেমন করিয়া জমিদারকে প্রতারণা পূর্ব্বক এক কাণির খাজনা দিয়া তিন কাণি জমি ভোগ করিতে পারে;—কি উপায়ে জমিদারের খাজনার দাবিতে তমাদির দোষ ফলাইয়া তাহাকে ঠকাইতে সমর্থ হইবে; এবং জমিদার ন্যায্য জমা আদায়ের জন্য একটুকু পীড়াপীড়ি করিলেই কিরূপে কয়েদখালাসীর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া লইতে পারিবে। যেমন প্রজা, তেমন জমিদার! জমিদারদিগেরও অনেকে, কি কৌশলে, কোন চাতুরীর আশ্রয়ে, প্রজার রক্ত শোষণ করা যায় সর্ব্বদাই তাহার পথ খুঁজিয়া বেড়ান। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই, প্রজার সম্পর্কে, অসুরের প্রাণে অনুপ্রাণিত। পূর্ব্বে নির্ব্বোধ ও মূর্খ জমিদারের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কাহাকেও বঞ্চনা করে না। ব্যবসায়ী বঞ্চক কর্ত্তৃক নিজেরাই বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণ যাঁহাদিগের কথা বলা হইতেছে তাঁহারা এতদূর সাংসারিক ও সর্ব্ব বিষয়ে এত হুঁসিয়ার যে, তাঁহারা কাহারও কর্ত্তৃক সহজে বঞ্চিত হইবার পাত্র নহেন; বঞ্চনার বাক্‌কৌশলে বরং তাঁহারাই সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদিগের বঞ্চনা ও উৎপীড়নের ক্ষেত্র নিজ নিজ জমিদারীর নিজ নিজ প্রজা ও কর্ম্মচারী। চাঁদা ও মাথট আদায়ের সময় তাঁহারা যে কৌশলজাল

বিস্তার করেন, তাহার কাছে কণিকের নীতিসূত্রও বুঝি বা হা'র না মানিয়া পারে না। আজি মেয়ের বিবাহ, কাল বাই-খেমটার নাচ অথবা থিয়েটারের সমারোহ; চাঁদাস্বরূপ গরীব প্রজার মুখের গ্রাসের এক অংশ এ জন্য উৎসর্গ করিতেই হইবে। তাহাদের কাহারও কাহারও মনের অবস্থা এতদূর নিকৃষ্ট যে, কোন প্রজার বাড়ীতে টীনের ঘর বা অন্য কোনরূপ সম্পদের লক্ষণ একটু দেখিলেই তাঁহার চক্ষু টাটাইয়া উঠে; তিনি তাহাকে অকারণে ফাঁদে ফেলাইয়া তাহা হইতে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেন এবং যাহাতে সে সর্ব্বস্বান্ত হয় তজ্জন্য নানা ফিকির-বাজি করিতে প্রবৃত্ত হন। সময় সময় কেহ কেহ প্রজার বাড়ীতে পাঁঠা, খাসী বা গাছের আম কাঁঠাল বা কলা ইত্যাদি থাকিলে তাহা অন্যত্র বিক্রয় করিতে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করেন; শেষে আপনি কৌশল ক্রমে উহা নাম মাত্র মূল্যে খরিদ করিয়া লন। জমিদার কুলে এই শ্রেণীর ধড়িবাজ ধুরন্ধর অনেক আছেন।

বঞ্চনা ও ফাঁকিবাজির জের বিবিধ নমুনা।

বিনা মূলধনে যাহারা কথা বিক্রয়ের ব্যবসা করে, তাহারা পরের ভাব ও পরের উক্তি, কৌশলপূর্ব্বক নানারূপে চাতুরীর খেলা খেলিয়া, আপন সম্পদ্‌রূপে বাজারে চালাইয়া দেয় এবং এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ও অজ্ঞলোকের মধ্যে একটু যশ উপার্জ্জন করিয়া লয়। এইশ্রেণীর কথা ও ভাব-চোর যদি অপহৃত দ্রব্য লুকাইতে না পারিয়া মাল সমেত ধরা

পড়ে, তাহা হইলে, চোরের শাস্তি না পাইলেও, ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আর একশ্রেণীর ভদ্র বঞ্চকদিগের অনুচিত চুরী বা বঞ্চনার কোন দণ্ড নাই। কেহ কেহ দায়ে ঠেকিয়া ভদ্রভাবে টাকা হাওলাত লন, কিন্তু ফিরিয়া আর তাহা পরিশোধ করা আবশ্যক মনে করেন না। কোন জিনিষ, সাময়িক ব্যবহারের জন্য ভদ্রভাবে চাহিয়া এবং ভদ্রতার অনুরোধে উহা হস্তগত করিতে পারিয়া, যাহার বস্তু তাহাকে প্রত্যর্পণের কথা একবারেই ভুলিয়া যান। পুস্তক সম্বন্ধেই ইহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর চুরী বা বঞ্চনা ভদ্রলোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় বক্তা ও প্রখ্যাতনামা গ্রন্থকার স্বর্গগত বিদ্যাসাগর রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর গ্রন্থরাশিকে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আল্‌মারিতে থরে থরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আলমারির কাচগুলিকে রং মাখাইয়া এরূপ অস্বচ্ছ অবস্থাপন্ন করিয়া রাখিতেন যে, ভিতরে কি আছে বাহির হইতে তাহার কিছুই দেখা যাইত না। আমি এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি এমন মূল্যবান্ দুর্ল্লভ গ্রন্থগুলিকে এমন করিয়া লোক-চক্ষুর অবিষয়ীভূত করিয়া রাখেন কেন?" তিনি একটুকু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"ইহা করি শিক্ষিত ভদ্রলোক বঞ্চক বা চোরের ভয়ে। কেহ পাঠের নিমিত্ত এক খানি পুস্তক ধার চাহিলে না দিয়া পারা যায় না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়

ও লজ্জার কথা যে, অনেক ভদ্রলোকই আর উহা ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। এইরূপে আমি অনেক দুর্ল্লভ গ্রন্থ হারাইয়া নিরতিশয় ক্লিষ্ট আছি।" আমি শুনিয়া মনে মনে কহিলাম, স্বচ্ছ কাচের এ অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব কাচের মালিন্য নহে। ইহা শিক্ষিত ভদ্রলোকেরই নির্ম্মল-চরিত্রের ঘৃণার্হ-কলঙ্ক।

এই ভদ্র চুরি বা বঞ্চনা অপরাধরূপে গণ্য নহে। এজন্য কোন মালিক কখন আদালতে অভিযোগ করা দূরে থাকুক, একবার দুইবার চাহিয়া না পাইলে, চক্ষু লজ্জাহেতু আর উহা ফিরাইয়া চাহেন না। সমাজও ঈদৃশ গুণধরের উপর কটাক্ষপাত করে না, কিংবা তাহাকে দাগী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে না। এইরূপে দণ্ডনীয় না হইলেও ইহা যে ভদ্র চরিত্রের যারপর নাই নিন্দনীয় কলঙ্ক তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কোন কোন সহরে, একশ্রেণীর ধূর্ত্ত বোম্বেটে আছে তাহাদিগকে কোন প্রকারেই সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না; তাহারা নানা মূর্ত্তিতে নানা সাজে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা প্রায়শঃই চেন ঘড়ী ও সোণার চশমা লাগাইয়া, পোষাক পরিচ্ছদের খুব ঠাট ফলাইয়া, দুই চারিটা ইংরাজী বুকনী-মিশ্রিত বড় চালের কথা চালিয়া, রবাহূত হইয়া আসিয়া, উঠন্ত বয়সের বড় লোকদের স্কন্ধে চাপিয়া বসে। এ সওয়ার একবার কাঁধে চাপিলে আর সহজে অব্যাহতি নাই। তাহারা এমন সকল উপায়ের অভিনয়ে আপন আপন কর্ম্মসাধন করিয়া লয় যে, যাঁহার রক্তমোক্ষণ

হইতে থাকে তিনিও তাহা একবার অনুভব করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না। মফঃস্বল হইতে যে সমস্ত অবস্থাপন্ন লোক রাজধানীতে যান, তাঁহাদের পৃষ্ঠেই এই ধূর্ত্ত বোম্বেটেগণ সওয়ার হইতে অধিকতর সুবিধা পাইয়া থাকে।

লটারী খেলা ও নীলাম বিক্রয়।

যদিও ইউরোপ প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান দেশে লটারী বা "ভাগ্য পরীক্ষা" বাণিজ্যের অঙ্গবিশেষে পরিণত হইয়াছে বটে, এবং ঐ সমস্ত দেশে, অধিকাংশ স্থলে সত্যতা অক্ষুণ্ণ থাকা নিবন্ধন, নিরপেক্ষভাবেই ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন, তথাপি আজকাল আমাদের দেশেও তদনুকরণে উল্লিখিত লটারী খেলার বহুল প্রচার হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার দু'চারিটি স্থানে সত্য অব্যাহত রহিলেও, অধিকাংশস্থলেই প্রতারণার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সময়ে হঠাৎ একটি কোম্পানী যুটিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিল যে, অমুক স্থানে অমুক কোম্পানীতে, অমুক তারিখে পাঁচলক্ষ টাকার একটি লটারী খেলা হইবে; অতএব যিনি এক টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন, যদি লটারীতে তাঁহার নাম উঠে, তাহা হইলে তিনি উক্ত টাকা প্রাপ্ত হইবেন বা ঐ পাঁচ লক্ষ টাকা, পাঁচ, আট, দশ কি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত হইয়া, যথা সময়ে ব্যক্তিবিশেষের বা যাহার যাহার নামে পড়িবে, তাহাকে অথবা তাহাদিগকে উল্লিখিত ভাগ্যলব্ধ টাকা বিতরিত

হইবে। তজ্জন্য অনেক স্থলে কোম্পনীর লোক বা এজেণ্টও স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং কেহ কেহ এজেণ্টের নিকট চাঁদা প্রদানে রসিদ প্রাপ্ত হইয়া, হঠাৎ বড়লোক হইবার আশায়, নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু ওদিকে, বিজ্ঞাপন প্রচারিত মূলধন সম্পূর্ণ বা কতক আদায় হইতে হইতেই খেলার সময় উপস্থিত হওয়াতে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে (তারিখে) খেলা আরম্ভ হইল; খেলাশেষে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফলে এই দেখা গেল যে,—হয় ত কোম্পানীর অংশীদার বা সেয়ারারদের পত্নী অথবা পুত্র কন্যা কিংবা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি নিজেদের লোকদিগের নামান্তর বা স্থানান্তরের কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক, পোনর আনাই কৌশলে বণ্টন করিয়া তাহাদের নিজস্ব রূপে আত্মসাৎ করা হইয়াছে। তবে পুনর্ব্বারের আশায় দূরবর্ত্তী বা স্বতন্ত্র লোকের নামেও উহা হইতে দুই চারিটি ক্ষুদ্র বখ্‌রা ফেলিয়া দিয়া—বাহিরে সৎ ও সাধু নাম ঘোষণাপূর্ব্বক, বহুলোকের উপর বাহাদুরী ফলাইয়া হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিবার পথ করাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রিকাওয়ালারাও, মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত রূপ লটারীর ধ্বনি দিয়া, সাড়ম্বরে দু'চারি সংখ্যা পত্রিকা বাহির করতঃ, জন্মের মত বঞ্চনার অভিনয়ক্ষেত্রে যবনিকাপাত করিয়া বসেন। আমার বিশেষ পরিচিত দু'চারিটি ভদ্রলোক উহার ভুক্তভোগীও বটেন। পরন্তু, দেশীয় চিঠিখেলা প্রভৃতিও ঐ রূপ জুয়া বা লটারী-খেলার অঙ্গীভূত।

আর এক শ্রেণীর বঞ্চনা-ব্যবসায়ী আছে, তাহারা বকেয়া মাল বা পুরাতন মালে নূতন রং ফলাইয়া নিজেদের লোক লইয়া নীলাম ডাকাইতে আরম্ভ করে। এই নীলামের কৌশলপূর্ণ আড়ম্বর ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া নবাগত বা নিরীহ পল্লীগ্রামবাসী লোক সহর হইতে শস্তায় জিনিষ কিনিয়া নিবে মনে করিয়া উহা ক্রয় করতঃ—ফলে, বাজার দর হইতেও অধিক মূল্য দিয়া প্রতারিত হয় এবং পরে প্রসঙ্গ ক্রমে জ্ঞানবান্ লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া তিরস্কৃত ও লজ্জিত হইয়া থাকে এবং আপনিও পরিতাপ ভোগ করে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই থাকে যে কর্জ্জ লইয়া কর্জ্জ পরিশোধ না করা ও জিনিষ পত্রাদি ধারে লইয়া তাহার মূল্য না দেওয়া। কিন্তু এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কেহ কেহ আবার পরিশোধ করিবে বা পরিশোধ করিতে পারিবে ভাবিয়াই টাকা কর্জ্জ করে বা ধারে জিনিষ লইয়া থাকে। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য-বশতঃ দারুণ অভাবের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া, ঋণ শোধে অসমর্থতা প্রযুক্ত, মহাজনকর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া, উৎপীড়নের ভয়ে নিরাপদ স্থানে পলাইতে বাধ্য হয়; এবং কেহ কেহ ব্যক্তিগত বা বংশগত উচ্চতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, শত লাঞ্ছনা ও শত যন্ত্রণাসত্ত্বেও পলায়নে অপারগতা নিবন্ধন, উত্তমর্ণের নিকট সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতা সহকারে একান্ত কাতর থাকে; এবং নিজ দুরবস্থা জ্ঞাপন করতঃ ক্ষমা প্রার্থী হয়, ও লজ্জা, ভয়, অপমান ও আত্মগ্লানিতে মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে

এবং জীবন্মৃত হইয়া ঋণকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক অবশ্যই ক্ষমার্হ। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর জুয়াচোরেরা মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া, নানাপ্রকার বাক্‌চাতুর্য্যে, সাজ সজ্জার ঠমকে এবং বহুপ্রকার কৌশল অবলম্বনে, মহাজনের চিত্তাকর্ষণ করতঃ, কেহ ষ্ট্যাম্পে, কেহ হ্যাণ্ডনোটে, কেহ বা পাকা খাতায় নাম সহি করিয়া কেহ বা হাওলাতসূত্রে টাকা কর্জ্জ করতঃ একেবারে চম্পট দিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু বেশী চালাক, তাহারা উল্লিখিতরূপে গৃহীত কর্জ্জ টাকা হইতেই কিছু ডিপজিট (আনামত) রাখিয়া, মাসে মাসে মহাজনের সুদ প্রদান করতঃ, মহাজনের মনে নিজ সম্বন্ধে "ভাল খাতক বা অধমর্ণ" বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক, এইরূপ আরও দুই চারি কিস্তা স্বয়ং কর্জ্জ করে; এবং নিজদলের লোকের সহিত যুক্তি করিয়া একটা সেয়ারের বন্দোবস্ত করতঃ, উল্লিখিত মহাজন হইতে টাকা কর্জ্জ লওয়াইয়া দিয়া, জন্মের মত অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকে।

টাকা কর্জ্জ করিবার সময় মহাজন যদি ইহাদের নিকট বাজার প্রচলিত রেট হইতে অনেক বেশী পরিমাণের সুদও চাহেন, তথাপি এই শ্রেণীর সিদ্ধহস্ত ধূর্ত্তেরা, মহাজনকে শত গুণ লাভ-জনক ব্যবসায়ের ভাণ দেখাইয়া, ঋণ-দাতার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করতঃ, তদীয় ইচ্ছানুসারেই দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হারে সুদ স্বীকার পূর্ব্বক, তাহার উপর চক্রবৃদ্ধি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন জালিয়াত

যে, ষ্ট্যাম্পে নিজের নামটি অবিকল অন্যের অক্ষরের ন্যায় দস্তখত করে; খতের মিয়াদ অন্ত হইবার উপক্রম। হইলে, যখন মহাজন আদালত করিতে বাধ্য হন, তৎকালে শমন প্রাপ্ত অধমর্ণ বা খাতক আদালতে উপস্থিত হইয়া, মহাজনই-যে জালিয়াত, তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া, স্বয়ং, আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ সাব্যস্ত এবংঋণ দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে। ইহার পরে ঋণদাতাকে বিশেষ বিপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, নানা প্রকার যোগাড় যন্ত্র দ্বারা উক্ত মহাজনকেই ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করায় ও ইচ্ছানুরূপ অপদস্থ করিয়া প্রাগুক্ত ফাঁকি বা বঞ্চনার বাহাদুরী দেখাইয়া দেয়।

জিনিষ পত্রাদি গ্রহণ সম্বন্ধেও তাহাদের এই উদারতা দৃষ্ট হয়! মণি, মুক্তা, জহরৎ, স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার, শাল বনাত, নানারূপ মনোহারী জিনিষ বা অন্য যে কোন বস্তু তাহাদের মনোমত হয়, তাহাই তাহারা, অম্লান বদনে, বিক্রেতার নিকট হইতে যত দূর পরিমাণে সম্ভব, ধারে গ্রহণ করে। যখন মূল্য দেওয়ার অভিপ্রায় আদৌ নাই, তখন যত অধিক মূল্যেরই হউক না কেন, তাহাদের ক্রয় করিতে তো কোন বাধাই নাই। প্রচুর লাভের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হইয়া বহু দিন ঘুরিবার পরে, বিক্রেতা বা মহাজন যখন বুঝিতে পারেন যে, মূল্য প্রাপ্তির আর কোন আশা নাই, তখন তাঁহারা একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। দেশস্থ অনেক বড়লোক-নামধারী ব্যক্তিদের মধ্যে ঈদৃশ নীচাশয়

বঞ্চনা-ব্যবসায়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই না কি আবার সমাজের অনেকস্থলে চালাক বলিয়া পরিচিত! অনেক মহাজন অন্য দশ প্রকারে পীড়নের ভয়েও ঈদৃশ বড়লোক-নাম-ধারী বঞ্চকদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস পায় না। তাঁহাদের লাভের বাণিজ্য অনেক সময়ই এইরূপে সমাপ্ত হয়।

অধুনা দালালী এবং ঘটকালী অধিকাংশ সময়েই ফাঁকি ব্যবসায়ের অন্তর্গত। ইহারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির পথ করিয়া লয়। এই যুগের দালালের অন্য নাম ঠগ বা গামছামোড়া রাখিলেও অসঙ্গত হয় না। সহরে আজকাল অনেকেই দালাল দিয়া কার্য্য করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের অধিকাংশ যে কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির লোক তাহা অনেকেই জানেন। এতদ্ব্যতি-রেকে সহরের বহু গুণ্ডা এবং বদমাশ্ আছে, যাহারা নানারূপে অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু সভ্যতা, ভদ্রতা ও সাধুতার আবরণে যাহারা সমাজে থাকিয়া ফাঁকি ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের কথাই এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফাঁকি বা বঞ্চনা ব্যবসায়ের কথা বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিতে গেলে, এক এক বিষয়েই এক এক খানি বড় গ্রন্থ হইয়া পড়ে, আমি সে চেষ্টা না করিয়া প্রত্যেকেরই প্রকার ও আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলাম। ভুক্ত ভোগী বিজ্ঞ পাঠক ইহাদ্বারাই সম্যক্ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং অনেক বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিবার জন্য

প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন। এক কথায়, আপনাকে যখনই যিনি যে ভাবে যে সাজে যে কোন পরামর্শ বা উপদেশ দিতে আসুন না কেন, আপনার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে যে, তাহার বা তাহাদের আপনাকে ঐ পরামর্শ বা উপদেশ দিবার স্বতঃ পরতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষ ভাবে এমন কি সুদূর-সূত্রিত ভাবেও কোন স্বার্থ আছে কি না, তাহা জানা ; এবং তৎপরে বিচার করিবেন যে, উক্ত পরামর্শ আপনার পক্ষে মঙ্গল জনক কি না, আজ কাল স্বকীয় স্বার্থ ব্যতিরেকে পরার্থে বাক্য-ব্যয় করে এরূপ লোক অতি বিরল।

উপসংহারে আমার এই বিনীত নিবেদন যে, অধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূল, ইহা শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার বরিবেন। দেশের উন্নতি করিতে গেলে সমাজের পাপ-স্রোত বন্ধ করিতেই হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, সত্য ও ত্যাগের পথ অবলম্বন না করিলে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমরাই যদি আমাদের পতনের মূল হই, তবে অন্যে কেন গায়ের বলে আমাদিগকে উচুতে উঠাইল না, ইহা বলিয়া বিলাপ পরিতাপ ও চীৎকার করিয়া কোন পুণ্য নাই। সমাজের এই সকল ফাঁকিবাজী প্রভাবে, আমরা নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করিতে পারি না,—একের উপর অন্যের আদৌ নির্ভরের ভাব হয় না। যাঁহারা প্রকৃত সৎলোক তাঁহাদের উপরও এই সকল কারণে সন্দেহ জন্মায়। কারণ, মেকির মিশ্রণে অনেক স্থলে সার রত্নও কৃত্রিম রূপে অবহেলিত হইয়া থাকে। দেশের উন্নতি ও দশের কল্যাণ

করিতে গেলে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় দেশ ও সমাজের মেরুদণ্ড সবল ও সুদৃঢ় করিতে হইবে। সে মেরুদণ্ড প্রেম, সত্য, ন্যায়, ত্যাগ, পরিশ্রম, শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং ভগবানে ভক্তি ও একান্ত নির্ভরতা।

ফ্যাশন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রখর সভ্যতার যুগে "ফ্যাশন" কি পদার্থ, ইহা বোধ হয় কাহাকেও কষ্ট করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে হইবে না। শব্দটি যদিও ইংরাজী,—তথাপি সমাজের অতি স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলের নিকটই 'ফ্যাশন' সুপরিচিত। 'ফ্যাশন' শব্দে যাহা জ্ঞাপন করে, ঠিক তাহা বুঝাইতে বাঙ্গালায় বোধ হয় তেমন কোন প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু তথাপি 'ফ্যাশন' আত্মমহিমায় সর্ব্বত্রই অতি সুবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং ইহা যেমন নানা মূর্ত্তিতে দেশের অঙ্গে, তেমন ভাষার কলেবরেও একটা নূতন আমদানী পাশ্চাত্য আভরণ রূপে পরিগৃহীত হইয়া পড়িয়াছে।

এই যুগে 'ফ্যাশন' না করে কে? ফ্যাশনের মোহে একেবারে মুগ্ধ হয় নাই এমন অনাসক্ত নির্লিপ্ত যোগীই বা আছে কয় জন? যাহার চলে সেত করেই, আর যাহার "অন্নচিন্তা চমৎকারা" সেও একবার যথাসাধ্য ফ্যাশনের গৌরবরক্ষার্থ চেষ্টা করিয়া দেখে; এবং কখন কখন কষ্টোপার্জ্জিত দৈনন্দিন জীবনোপায়ের কিয়দংশ ফ্যাশনের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া হরিবাসরের পুণ্য সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়।

এখন দেখা যাউক, ফ্যাশনের উদ্ভব কেন হয় এবং ফ্যাশন কি কি উপাদানে গঠিত ?

মনুষ্য চিরদিনই সৌন্দর্য্যের উপাসক। সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার এই অনুরাগ প্রকৃতিদত্ত বা স্বভাব-সিদ্ধ। বোধ হয়, এই সৌন্দর্য্য-বোধ ও সৌন্দর্য্যানুরাগই পশুত্বের স্তর হইতে মানবীয় স্তরের বিভিন্নতানির্দ্দেশক ও বিশেষত্বব্যঞ্জক আদিম আরোহ-সোপান। সুসভ্য মনুষ্য-সমাজের কথা ছাড়িয়া দাও, অতি আদিম কালের মনুষ্যেরাও সৌন্দর্য্যপিপাসু ছিল। তাহারাও তৎকালের আপনাপন শিক্ষা ও রুচি অনুসারে, কেহ নানাবর্ণে দেহ রঞ্জিত করিত, কেহ আভরণ স্বরূপ বিচিত্র রঙ্গের পাখীর পালখ পরিত, কেহ বা কেশের নানারূপ অদ্ভুত পারিপাট্য বিধানপূর্ব্বক সৌন্দর্য্যগর্ব্বে স্ফীত হইত; এবং এতদ্ব্যতিরেকে তাহাদের আরও অনেক রূপ সাজ সজ্জা ছিল। সেই সকল সাজ সজ্জা তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-অনুরাগিত্বেরই যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিত। 'ফ্যাশন' এই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগও তাহার ক্রম-অনুশীলন হইতেই উদ্ভূত। মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অভাব অসুখ অসুবিধা দূরীকরণ মানসে বা সর্ব্বপ্রকার সুখ-নিশ্চিন্ততা ও আরাম বিধান কল্পে দেশ, কাল, শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী এবং সৌন্দর্য্য জ্ঞান কর্ত্তৃক নিয়মিত ও উদ্ভাবিত নানারূপ প্রকরণ প্রণালীই এই ফ্যাশনের গঠন উপাদান। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্য এ দুইয়ের সঙ্গেই ফ্যাশনের সম্বন্ধ। ফ্যাশনের দ্বারা জাতিগত বা ব্যক্তিনিষ্ঠ শিক্ষা ও রুচি বিষয়ক উৎকর্ষতার তারতম্য

উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফ্যাশন চিরকালই ছিল, বর্ত্তমানেও ষোড়শোপচারে আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে এবং দেশ কাল সমাজ, শিক্ষা, রুচি ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহা চিরদিনই ক্রম-পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত হইতে থাকিবে এ কথাও সত্য।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সমাজের যাহা কিছু প্রাচীন, তাহারই পক্ষপাতী এবং প্রতিনিয়ত তাহারই গুণকীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ; আর যাহা কিছু আধুনিক, তাহাই তাঁহাদিগের চক্ষে বিদ্বেষ-জনক ও ঘৃণাস্পদ। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকেন। আমি এই উভয় শ্রেণীর মতই ন্যূনাধিকরূপে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি এবং ইহাদের কোন সম্প্রদায়ই একদেশদর্শী-নয়নে কখন বিদ্বেষ-অঞ্জন মাখিয়া কখনও বা সুখদ-রসাঞ্জন সংযোগে ভাবাবিষ্ট হইয়া আধুনিক বঙ্গ সমাজের পানে তাকাইতে প্রস্তুত নহেন।

স্বতঃই হউক, আর অনুকরণ প্রভাবেই হউক—প্রাচীনই হউক, আর আধুনিকই হউক, যে সকল ফ্যাশন শারীরিক মানসিক, বৈষয়িক বা সামাজিক ইহার কোন দিকেই কোনরূপ ক্ষতি বা অবনতি না জন্মায়—যাহা কোনরূপেও শুধুই নিরর্থক রূপে বিলাসিতাবর্দ্ধক এবং মনুষ্যত্ববিঘাতক নহে, পক্ষান্তরে এই সকলের বিপরীত ভাবাপন্ন, এবং সৌন্দর্য্যশ্রীবিলসিত,—বিলাসিতার সহিত সম্পৃক্ত থাকিলেও সরল ও সবল স্বাস্থ্যশ্রীতে পূর্ণ, এবং প্রকৃত মঙ্গলের সহিত সম্পৃক্ত, তাদৃশ ফ্যাশন কোন অংশেই নিন্দনীয় হইতে পারে না ; বরং তাহা আদরের সহিত

গ্রহণযোগ্য। আর, যে সকল 'ফ্যাশন' ইহার বিপরীত—যাহার পোষকতা করিতে কতকগুলি অর্থশূন্য বাদ-প্রতিবাদের অবতারণা করিতে হয়, অথবা 'আধুনিক' বা 'প্রাচীন' এই দুইটি বিশেষণ ব্যতিরেকে যাহার পক্ষে বলিবার আর কিছুই থাকেনা, তাদৃশ ফ্যাশন নূতন হউক আর পুরাতন হউক, আমার মতে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এখন এই সিদ্ধান্তের আলোকে, আধুনিক বঙ্গসমাজের সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত 'ফ্যাশন' পরীক্ষা পূর্ব্বক, প্রাচীন এবং আধুনিক যুগদ্বয় পরস্পর পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করতঃ দোষ-গুণের আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে বেশভূষা বা পোষাক-পরিচ্ছদের কথা কহিব। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। এ দেশে, নিতান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজন ব্যতীত, সর্ব্বদা কোট পেণ্টুলেন আঁটিয়া, রুমালের সাহায্যে প্রতিনিয়ত ঘর্ম্ম পুছিবার অনুষ্ঠান দ্বারা, অষ্ট প্রহর 'ফুটবাথ' লইয়া জ্বর ছাড়াইবার অভিনয়, অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার ক্ষিপ্ততা বই আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে, যে সাহেবী পোষাক পরিয়া আমরা সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যানুশীলনতার পরিচয় দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হই, তাহা প্রায় পৌনে পোনর আনা স্থলেই আসলের নকল নহে—নকলের নকল। কারণ, এ দেশে খাঁটি সাহেবী সমাজে পরিবারভুক্তভাবে মেলা-মেশার সুবিধা অনেকেরই নাই। প্রয়োজন বা চাকরীর খাতিরেই আমাদিগকে অধিকাংশ সময়ে সাহেবদের সম্মুখীন হইতে হয়। বিলাত-ফেরত বাবুদের নিকট হইতেই অধিকাংশ সময় আমাদিগকে সাহেবী কায়দার সাজসজ্জা ও চলিবার ফিরিবার তালিম লইতে

হয়; এ জন্য অধিকাংশ স্থলেই 'তিন নকলে আসল খাস্ত' হইয়া পড়ে। সমাজে অধিকাংশেরই অবস্থা এমন নহে যে, Rankin প্রভৃতির বড় বড় সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদবিক্রেতার দোকান হইতে খাঁটি সাহেবী পোষাক উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে পারেন! সাধারণ দরজীর দোকানই আমাদের অধিকাংশের সম্বল। এরূপ অবস্থায় সাহেবদিগের চক্ষে আমাদের সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদে নানারূপ লজ্জাকর ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পোষাকের ছাট কাট, পরিধান করিবার কায়দা ও দস্তুর, কলার নেকটাইয়ের আধুনিক ফ্যাশনমাফিক যথারীতি সন্নিবেশ, কোন্ আসরে কিরূপ পোষাক ব্যবহার্য্য ইত্যাদি নানা বিষয়েই আমাদের লজ্জাজনক ত্রুটি থাকিয়া যায়। ফলে, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া যে পোষাকে সজ্জিত হইয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করি, সাহেবেরা সেই clown অথবা ভাঁড়ের সংসজ্জা দেখিয়া মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসে; এবং হয়ত বা আংশিক রূপে Zoo জু গার্ডেন দেখিবার সখ ও কৌতুক মিটাইয়া লয়। কাক যদি ময়ূরের পুচ্ছ পরিয়া ময়ূর বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার ঈদৃশ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। তবে অবশ্যই যাঁহারা বিলাত-ফেরৎ তাঁহারা খাঁটি বিলাতী সমাজে মিশিবার সুবিধা পাওয়ায় এ সকল ত্রুটি সারিয়া চলিতে পারেন। আর কতক পরিমাণে পারেন তাঁহারা,— যাঁহাদের অর্থের প্রাচুর্য্য আছে। কারণ, তাঁহারা বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে most up-to date পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া পরিতে পারেন।

কিন্তু আবার পোষাক পরিধান ব্যাপারে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিতে হয়ত ধরা পড়িয়া যান। মৌলিক পদার্থ আর মুখস্থ অনুকরণের পার্থক্য এই যে, মুখস্থ তালিমের বহির্ভূত হইলেই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। তখন বিলাতী খোলসের নানা ছিদ্র দিয়া আমাদের অভ্যন্তরীণ সেই আদিম নগ্ন মূর্ত্তি উঁকি দিতে থাকে। আমাদের দেশে দরিদ্র ভদ্র লোকেরও সামাজিক সম্মান আছে। কিন্তু যাহারা অর্থের বলে সাহেবী অনুকরণের ধ্বজা উড়াইয়াছেন, এবং নিজ পরিবার মধ্যে ইহা বদ্ধমূল করিতেছেন, যদি অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদের সন্তানসন্ততির দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন যে তাঁহারা সমাজের আবর্জ্জনারূপে কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইবেন, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ঈদৃশ অনুকরণের সফলতা সাধন বিলক্ষণ অর্থব্যয় ও তদ্বির সাপেক্ষ।

পর-উচ্ছিষ্ট-ভোজী নিজস্ব-বিহীন আমরা এইরূপে যেমন উৎকট অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয় দেই, পক্ষান্তরে তেমন পুরুষকারের জীবন্তমূর্ত্তি, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন, সাহেবেরাও তাঁহাদের স্বজাতি ও স্বদেশের আচার-পদ্ধতি, এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও, উৎকট যত্নে অনুসরণ পূর্ব্বক, পরের উচ্ছিষ্ট বা পরস্বে গভীর বিতৃষ্ণার পরিচয় প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই টুকু, তাঁহারা শীত প্রধান দেশের লোক, তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ শীত প্রধান দেশেরই উপযোগী। কিন্তু আমাদের এই উষ্ণ প্রদেশের প্রখর উত্তাপে অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের সেই পোষাক পরিচ্ছদ কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশের প্রচলিত ধূতি চাদর পরিধান

করেন না। আর, আমরা গ্রীষ্ম প্রধানদেশের লোক হইয়াও উষ্ণদেশের উপযোগী ধূতি চাদর ফেলিয়া দেই এবং পরের পরিচ্ছদে তনু ঢাকিয়া লইয়া সাধ করিয়া নিদাঘ-দহনে দগ্ধ হই। আমরা সাহেবদের অনুকরণ করিতে যাইয়া অনুকরণ করি তাঁহাদের পোষাকটার,—তাঁহাদের স্বদেশ ও স্বজাতির আচার পদ্ধতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবার অপ্রতিহত প্রবৃত্তি ও কঠোর প্রয়াস কি পদার্থ, কেহই তাহা লক্ষ্য করি না। ননীচুরী বা গোপীর বস্ত্র হরণের অনুকরণ সহজ কথা; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ কোন কৃষ্ণভক্তের সাহস ও সামর্থ্যে কুলায় কি? বস্তুতঃ, সাহেবীর অনুকরণ সহজ; কারণ উহা সাহেবদিগের একটা বহিরাবরণ বা বাহ্যিক অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সাহেবের অনুকরণ শক্ত কথা। কারণ উহার সহিত তাঁহাদিগের অভ্যন্তরীণ সারবত্তা ও প্রাণ-নিহিত মনুষ্যত্বের সম্পর্ক।

আমাদের দেশে এই ফ্যাশন-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বোঝেন না যে, সাহেবী পোষাক যেমন উষ্ণ দেশের অনুপ-যোগী, তেমনই এই দরিদ্র দেশের পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য। খাটো কাপড় পরিলে এক রকম চলিয়া যায়, কিন্তু খাটো পেণ্টুলান পরিলে একবারে ইজ্জত যায়। একটি চলন-সই রকম ভাল সাহেবী সুট প্রস্তুত করিতে গেলে যে খরচ পড়ে, তদ্দারা একজন ভদ্রলোকের প্রায় এক বৎসর পরিধানের উপযুক্ত ধুতি চাদর জামা ইত্যাদি হইতে পারে। তার পর এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কোট পেণ্টুলান পরিলে

সাধারণের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের গণনায়ও তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত গুরু প্রয়োজন ব্যতীত এতাদৃশ অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নহে। এ সকল ছাড়া, এই সাহেবী ফ্যাশনে আনুসঙ্গিক আরও কতকগুলি বিলাসিতার ফ্যাশনদার পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন মনে হয় যে, এই টুকু করিলে ঐ টুকুও করিতে হয় এবং এইরূপে সাহেবী-য়ানার নিত্য নূতন উপসর্গ বাড়িতে থাকে; এবং তাহা না করিলেও মন "সোয়াস্তি" লাভ করে না। আফিস আদালতে বাধ্য হইয়াই সাহেবী পোষাকে যাইতে হয়; তাহা ছাড়া ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলিতে, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটির কোন কাজ করিতে, রেল ষ্টিমারে যাইতে, সাহেবী পোষাকের প্রয়োজ-নীয়তা আমি একবারে অস্বীকার করি না। নতুবা শুধু কাল চামড়ায় সাহেব সাজিয়া বাহিরে বাহার দিবার নিমিত্ত বা 'সাহেব' এই উপাধি ধারণের নিমিত্ত সাড়াকে কোট পেণ্টুলান পরিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটান আমি নিতান্তই নিকৃষ্ট-মাস্তিষ্কের কর্ম্ম বলিয়া মনে করি।

অন্য দিকে, বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা এখন আর ফাটকে আটক নহেন, তাঁহাদের অনেকে এক দম্ কাপড়ের পরিবর্ত্তে গাউন অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা দয়া করিয়া ততটা অগ্রসর হন নাই, তাঁহারাও জ্যাকেট, কামিজ, শেমিজ, 'ছায়া কায়া' আর কত কি এখন ব্যবহার করিতেছেন এবং গাউনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা পিছনের দিকে কোচার ন্যায় করিয়া কাপড় একটুকু ফুলাইয়া 'পার্শী লেডীদের' অনুকরণে

কাপড় পরিবার সমধিক অনুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছেন। কাপড়েরও যে আজি কালি কতরূপ 'ফ্যাশন' বাহির হইয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। আমি মহিলাদের নিজ নিজ অবস্থানুসারে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা ও পরিপক্ক মার্জ্জিত-রুচি অনুমোদিত দেশ ও কালের উপযোগী আড়ম্বরবিহীন সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী। এইরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসনায় রুগ্ন বিলাসিতার বা ধন-গর্ব্বের ধ্বজা উড়িতে দেখা যায় না,— শুধু সৌন্দর্য্য ও লক্ষ্মী-শ্রীরই মহিমা পদে পদে ফুটিয়া পড়ে। আমি স্ত্রীলোকদিগের খালি গায়ে থাকিবার আদৌ পক্ষপাতী নহি। উহা পুরাতন চলিত রীতি হইলেও আমি উহা বর্ব্বরতা বলিয়াই মনে করি। অবশ্য, যাঁহারা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। তাঁহাদের কোন জামা গায়ে না দিলেও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু জামা গায়ে দিবার পক্ষ সমর্থন করিলেও তাঁহারা বর্ত্তমানে যে ফ্যাশনের অস্বাভাবিক অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া অসংখ্য অনাবশ্যক উপকরণ যোগে বিলাসিতার অনলে অনন্ত-প্রকার আহুতি দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমি তাহার ঘোর বিরোধী। পাদুকা ব্যবহার আমি অসঙ্গত বোধ করি না; কিন্তু তাই বলিয়া অষ্ট প্রহর জুতা পায়ে দিয়া, নগ্ন-পদের সঙ্গে মৃত্তিকা-সংযোগ অসম্ভব করিয়া তোলা আমি কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না। বর্ত্তমান সময়ে মহিলারা যে সকল স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন, তাহাতে যে পূর্ব্ব সময় হইতে বহুগুণে মার্জ্জিত রুচির পরিচয় প্রদান করে, তাহা একবারে নিঃসন্দেহ। তবে দুঃখের বিষয়

এখন এটা "জিল্লা" ও পালিশের যুগ ;—প্রকৃত সোণা হইতে গিনির আদর কিছু বেশী হইয়াছে।

এক্ষণ আহারের কথা বলিব। যেমন বেশ ভূষা সম্বন্ধে, তেমনই আহার সম্পর্কেও সাহেবী খানা আমাদের এই উষ্ণ-দেশের অনুপযোগী। কাঁটা চামচ লইয়া পুষ্পস্তবকে সজ্জিত টেবিলে বসিয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ভাবে আহার করিতে বসা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণতঃ আমরা যে ভাবে এবং যে স্থানে বসিয়া কোন এক প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া আহারের কর্ম্ম সম্পন্ন করি, তাহাতে সৌন্দর্য্য, রুচি এবং আরাম অপেক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনেরই সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেবী খাদ্যের অনুকূলে কিন্তু কোন কথা বলিবার নাই। আমাদের দেশের অনেকে নিরন্তর সাহেবী খানা খাইয়া পশ্চাতে গাউট, রিউমেটিজম্, পাকস্থলীর ও মূত্রাশয়ের নানারূপ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন ; এবং এইরূপে একেবারে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু প্রাণের দায়ে শেষে ডাক্তারগণের উপদেশক্রমে কেহ শুধু দুগ্ধ, কেহ ফল মূল, কেহ বা এক বেলা হেলাঞ্চার শুক্ত ও ভাত মাত্র খাইয়া যতিব্রত তাপসের ন্যায় কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

সাহেবী খানা খাইয়া, কাঁটা, ছুরি চামচ চালাইবার কায়দা দেখাইয়া, সাহেবী সমাজে চলিতে এবং সাহেব বলিয়া পরিচিত হইতে কাহারও কাহারও এমনি মারাত্মক সখ যে, অনভ্যাসবশতঃ সাহেবী খানার কোন দ্রব্য খাইতে বমন হইয়া গেলেও বরং

কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক উহা খাইয়া পেটে রাখিতে অভ্যাস করা হয়। আমার একটি বন্ধু তাঁহার নিজের কথা বলিয়াছেন যে, প্রথমে যখন তিনি 'পনীর' খাইলেন, তখন উহার নিতান্ত বিশ্রী গন্ধ ও বিস্বাদবশতঃ, খাইবামাত্রই উহা বমি হইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইবার সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিলে নিতান্ত লজ্জার কথা হইবে এবং তাহাকে তাঁহারা 'নেটিব' বলিয়া ঘৃণা করিবে ইত্যাদি কারণে আমার বন্ধু প্রতিদিনই একটু করিয়া পনীর খাইতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বমি করিবার জন্য নিকটে একটি পাত্র রাখিতেন। প্রথম ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত তিনি উহা খাইবামাত্রই বমি করিতেন, এইরূপ কিছু দিন করিবার পর ক্রমে তাহার পনীর খাওয়া অভ্যাস হইয়াছিল। এখন দেখুন কি সাংঘাতিক ব্যাধি—ফ্যাশনের জন্য কি উৎকট তপস্যা!

সাহেবী খানার মধ্যে মাংসের ভাগই অধিক, সুতরাং আমাদের দেশে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না। আমাদের দেশী খাদ্যেও, প্রস্তুত করিতে পারিলে, অনেক রকম পুষ্টিকর সুস্বাদু দ্রব্য আছে। তাহাতে আমাদের জিহ্বার তৃপ্তি ও উদরের পূর্ত্তি এবং শরীরের বলবৃদ্ধি না হইবার কোনও কারণ নাই। এই অবস্থায় অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া হীন-শ্রী এবং নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ করি। কোন কোন বাবু আবার হোটেলে খানা খাইয়া থাকেন। হোটেলের খাদ্য দ্রব্যে সচরাচর নানারূপ মৃত জন্তুর মাংস এবং সময় সময় শূকর বা গরুর চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে।

ইহাতে যে কত সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাতের পাক-সংশ্রব ঘটিতে পারে—ভিতরে কত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা থাকিতে পারে, বাবুরা বাহিরের একটুকু সাজ সজ্জা চমক দেখিয়া, ভুলিয়াও একবার তাহা ভাবেন না। যাহাদের এই শ্রেণীর সাহেবী খানা ভক্ষণ করিবার স্পৃহা থাকে, তাঁহারা, নিজের বাড়ীতে ঐসকল প্রস্তুত করাইয়া লইলে যে কত শত রূপ বিপদ ও ব্যাধির আক্রমণ আশঙ্কা হইতে অব্যাহত থাকিতে পারেন কিছুতেই তাহা বুঝেন না। এই-রূপে সর্ব্বদিকেই উচ্ছৃঙ্খলতা আধুনিকযুগের ফ্যাশনের একটা বিশেষ উপসর্গ। বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি যে, মদ্যপানও স্থলবিশেষে ফ্যাশনের একটা অন্যতম অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহার প্রভাবে স্বাস্থ্য, বিত্ত ও মনুষ্যত্ব, এ সকলই, কি ভাবে ছারখার হইয়া যায়, তাহা বড় ছোট আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। এই কারণে কত কত সমৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত ঘরের ব্যক্তিদের অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—কত কত অর্থবিত্তশালী লোক পথের ভিখারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

এইবার আচার পদ্ধতি ও গার্হস্থ্য কর্ম্মের কথা বলিব। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অতি প্রত্যূষে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিবার প্রথা ছিল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া নিজেদের বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। এখন পুরুষদের কথা দূরে থাক, আমাদের অনেক গৃহলক্ষ্মীরাও বেলা নয়টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না।

যাঁহারা পূর্ব্বে, পুরুষদেরও উঠিবার পূর্ব্বে, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূজার জন্য পুষ্প চয়ন ও তাঁহাদের দৈনন্দিন শিবপূজা বা সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক গৃহ কর্ম্মে এবং রন্ধনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের আজি এই অবস্থা! এক্ষণ নব্য-ফ্যাশনে মুগ্ধ বাবু-বিবিরা প্রায়শঃ সূর্য্যোদয়ের বহু পরে শয্যাত্যাগ করেন, কেহ কেহ বা শয্যায় থাকিয়াই মল-মূত্র ত্যাগ এবং হাত মুখ প্রক্ষালনাদির পূর্ব্বেই দুর্গন্ধ লালা-বিজড়িত বাসী-মুখে চা বিস্কুট খাইতে থাকেন।

পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই বাড়ীতে কোন না কোন বিগ্রহ স্থাপিত থাকিত। সকালে বিকালে বিগ্রহের অর্চ্চনা এবং আরতি ইত্যাদি হইত। গ্রামস্থ সকলেই দেব দর্শন করিতে আসিত, প্রসাদ পাইত—ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিত। এইরূপে তখন ধর্ম্মালোচনা ও ভগবদ্ভক্তির স্রোত প্রবহমান থাকিত; এখন কাল প্রভাবে ক্রমশঃই তাহা লোপ পাইতেছে। আমাদের ধর্ম্মালোচনা, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষার পথ এক্ষণে অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যদিও পৌত্তলিকতা আমি হিন্দুধর্ম্মের অতি নিম্ন স্তর বলিয়া মনে করি, তথাপি জন-সাধারণের পক্ষে প্রথম সোপান-রূপে উহা নিশ্চিতই অত্যন্ত কার্য্যকরী। যদিও শুধু ইহাতেই চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকা—উচ্চতম বেদান্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া সকল দিকে, সকল পদার্থে, অনন্তদেবের অনন্তত্বের অস্তিত্ব প্রাণে অনুভব করিবার অধিকার না হওয়া আমি অতি দুর্ভাগ্য

মনে করি, তথাপি কিছু না করিয়া অধঃপাতে যাওয়া অপেক্ষা ভগবানের কাল্পনিক মূর্ত্তি পূজা করিয়া চিত্ত শুদ্ধি ও প্রেম ভক্তির স্রোত প্রাণে আনিতে চেষ্টা করা কোটি গুণে শ্রেয়ঃ সন্দেহ নাই। এখন মাতৃগর্ব্ভ হইতে পতিত হইয়াই অনেকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' হয়। এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানী সমাজে যাইয়া অজ্ঞানতা ও অনধিকার বশতঃ প্রকৃত উচ্চতত্ত্ব প্রাণে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শার্ট কোটের বা জ্যাকেট শেমিজেরই ফ্যাশন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেকি ধনী কি মধ্যবিত্ত কি গরীব সকলের ঘরেই গো-পালনের ব্যবস্থা ছিল ;—গো-সেবা স্বয়ং গৃহস্থের একটা অবশ্য-করণীয় কর্ম্ম ছিল। হিন্দুগণ গো-সেবাকে ঐহিক পারত্রিক পুণ্যজনক কর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতেন। এখন অনেক ঘরেই সেই বালাই নাই। ফলে, খাঁটি দুগ্ধ পান করিতে না পাইয়া সকলেই রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন—আর বিলাতী সেই কতকালের জমান দুধ (condensed milk) পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে গোপালন এবং গো-চারণের কত দিক্ দিয়া সম্পর্ক তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না।

পূর্ব্বে রমণীরা গৃহকর্ম্মে ও রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন—পরিবারস্থ সকলকে এবং আগন্তুক অতিথি ও আত্মীয় কুটুম্ব যে যখন বড়ীতে উপস্থিত হইতেন তাহাদিগকে তাঁহাদের রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইতে হইত। সেবা পরিচর্য্যা সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁহাদিগেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন অধিকাংশ আলোকপ্রাপ্তদের ঘরে সে পালা নাই। তাহারা সকাল বেলা

চা বিস্কুট কলা বা "কেলা" দ্বারা প্রাতরাশ সম্পন্নপূর্ব্বক খবরের কাগজ পড়েন; না হয়, কোলের দিকে মাথা নীচু করিয়া পশমের গলাবন্ধ তৈয়ার করিতে এবং নূতন নূতন ফ্যাশনের মতলব মনে মনে আঁটিয়া লইতে প্রবৃত্ত হন। আগন্তুক অতিথির কথা দূরে থাকুক, বঙ্গ নবিশ কোন আত্মীয় স্বজন বা কুটুম্বের তথায় প্রবেশ অধিকার নাই। কারণ, ভোগ-বিলাস উদ্দেশ্যে উপার্জ্জিত অর্থের কোন অংশ ব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগতের খোরাকী যোগান কষ্ট-সাধ্য ইহা এক কথা বটে। তার পর, এমন ফুরস্থৎ কই যে, তাহাদের খাওয়া দাওয়ার খোঁজ-খবর লওয়ার কষ্ট স্বীকার করা যায়?

অতিথিসৎকার হিন্দুগৃহের অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। মর্ম্মঘাতী রিপুও অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে সে প্রিয়-জনোচিত আদরে আপ্যায়িত হইত। এখন হাল ফ্যাশনে "আপনিটি আর কৌপ্নিটি" এই বুদ্ধিই সার হইয়াছে। ফলে, অতিথি সেবা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যাহারা ফাঁকিবাজ ব্যবসায়ী অতিথি,—আমি তাহাদিগের সৎকার অপেক্ষা প্রহারই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু যাহারা প্রকৃতই অতিথি তাহাদের সেবা সর্ব্বথা ধর্ম্ম সঙ্গত। যোগ্য পাত্রে দান, অতিথি সৎকার ইত্যাদি কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি জন্য যে হৃদয়ের উচ্চতা ও উদারতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণ নানা কারণে অনেক ভদ্র বা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের সপরিবারে বাধ্য হইয়া সহরে বাস করিতে হয়, সুতরাং মৃত্তিকার সহিত তাহাদিগের নগ্নপদ স্পর্শ করিবার সুযোগ বড় একটা

ঘটিয়া উঠে না। ইহার উপরে আবার পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে মহিলাদিগের শারীরিক কোন পরিশ্রমের কর্ম্ম প্রায়শঃ করিতে হয় না। সহরপ্রবাসী পুরুষদিগেরও শরীরশ্রমসাধ্য কর্ম্ম বেশী কিছু নাই। বাহিরের পবিত্র স্নিগ্ধবায়ু সহরের সর্ব্বত্র সুলভ নয়। ইহার ফল এই হইতেছে যে, এখন স্ত্রীমহলে হিষ্টিরিয়া, পুরুষ মহলে ডিস্‌পেপসিয়া অম্বল ইত্যাদি নানারোগ দেখা দিয়াছে। ইহার নানাবিধ কারণ আমি ইহার পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। তাঁহারা এখন শুধু ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাহেন—এবং নিরন্তর ঔষধ খাইতে খাইতে এমন অবস্থায় পঁহুছেন যে ঔষধে আর ধরিতে চায় না। পূর্ব্বে পঞ্জিকা দেখিয়া লোকে আহারের ব্যবস্থা করিত ;—যে ঋতুতে, যে তিথিতে, যে দ্রব্য খাওয়া নিষেধ তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা হইত। দাম্পত্যবিধিসম্পর্কেও এইরূপ নিয়ম বলবৎ ছিল। এই সকল কারণে আশী বৎসরের বৃদ্ধ যে শক্তি প্রকাশ এবং যে পরিশ্রম করিতে পারিতেন, আমাদের দাড়ি-গোঁফ-কামান চশমাধারী অনেক নব্যযুবকের পক্ষে ও তাহা সম্ভবপর হয় না।

পাড়াগাঁয়ে সাবেক আমলের সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, পৌষ মাসের শীতে, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, প্রাতঃস্নান ও পবিত্র ভাবে দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনাদি ও গৃহের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম সমাধা করেন ; তৎপর, বাড়ীর সাধারণের নিমিত্ত পাক-শালায় পাকের আয়োজন এমন কি, সময়ে স্বহস্তে পাক করিয়াও সকলকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করান। সকলের আহার হইয়া গেলে

স্বয়ং আহার করেন। আহারের পর ক্ষণিক বিশ্রাম কখনও ঘটে—কখনও ঘটে না। ইহার পরেই আবার সংসারিক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং রাত্রিতেও আবার সকলের পাকের বন্দোবস্ত করিয়া, পাক হইলে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া, নিজে প্রায় রাত্রি এগারটার সময় শয্যা গ্রহণ করেন। এই সকল কাজের মধ্যে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলিও তাঁহার স্কন্ধেই অষ্ট প্রহর লাগিয়া থাকে—বিছানায় শুইলে পরও অনেক সময়ে তাহাদিগকে আবার ঘুম পাড়াইতে হয়। ইহাদের অপরিসীম খাটুনি ও সেবাতৎপরতা দেখিলে মনে হয় যে, ইহাদের শরীর বোধ হয় দধীচির অস্থিতে গঠিত! আধুনিক সহরবাসিনী শিক্ষিতা মহিলারা, পাউডার মাখিয়া, জ্যাকেট সেমিজে লেসের বাহার দিয়া এবং পার্শী শাড়ীর পাল্ উড়াইয়া, এই শ্রেণীর পরিশ্রমের সিকি ভাগও করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের রক্তশূন্য দুর্ব্বল দেহ-যষ্টি শিক্ষার দুর্ব্বহ ভারে প্রপীড়িতা—তাঁহাদের চশমালঙ্কৃত ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুর পাতা, উপরের দিকে উঠাইয়া তাকাইতে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন পরিশ্রমের কাজই সম্ভবপর নহে।

ফ্যাশনের রঙ্গভূমি নব্যবঙ্গে আধুনিক স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা এক বিরাট পর্ব্ব বা অধ্যায় বিশেষ। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি বা প্রমাণ এপর্য্যন্ত অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রেষ্ঠ, বিশ্বাস অপেক্ষা প্রতীতি ভাল। এক্ষেত্রেও, "আমি

এই সূত্রেরই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষ ও বিপক্ষের আনুমানিক মত অপেক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রথম প্রবর্ত্তনার পর হইতে এত কাল সমাজে চলিবার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা দেখাই অধিকতর সঙ্গত। লোকে কথায় বলে "ফলেন পরিচীয়তে।" আমি এ বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার অসন্তোষ জনক ফলের ভুক্তভোগী তাঁহারাও Prestige রক্ষার্থে আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইবেন। এই Prestige এর কথা পশ্চাৎ স্থানান্তরে বলা যাইতেছে।

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক মার্কায় চিহ্নিত হইয়া অন্ধ-পক্ষপাতিতার বশবর্ত্তী হন নাই—যাঁহাদের ধীরভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, এমন অধিকাংশ শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আধুনিক স্ত্রীস্বাধীনতা আমাদের সমাজের পক্ষে অধিকাংশস্থলেঅমঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করিবেন।

স্ত্রীস্বাধীনতার প্রথম প্রবর্ত্তনা কালে আমাদের বুক যতটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে, তাহা অনেক পরিমাণে দমিয়া গিয়াছে এবং সংস্কারের 'কড়ি' স্বর ক্রমেই কোমলের দিকে নামিয়া আসিতেছে। আমাদের অনুকরণ-সম্ভূত সুখ-স্বপ্নের সুদূর-পরাহত কল্পনা বাস্তব জগতের কঠোর পরীক্ষার ফলে ক্রমেই অকিঞ্চিৎকর এমন কি হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়! এবং পক্ষান্তরে স্ত্রীস্বাধীনতার ফল দেখিলে আমাদের শাস্ত্রকার মনুর বচন হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া বোধ হয়। মনুর মতে স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর

এবং প্রৌঢ়ে সন্তানদিগের রক্ষণীয়া। স্ত্রীস্বাধীনতার জন্মভূমি ইয়ুরোপে এই স্বাধীনতায় বহুসংখ্যক লোক পারিবারিক জীবনে ভয়ানক মর্ম্মচ্ছেদ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া কিরূপ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছে, তাহা সভ্যজগতে এখন কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই। অনেক সাহেব যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া, বাড়ীর বিশেষ বিশেষ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, বাড়ীতে থাকিলেও, বাড়ীর 'ফটকে' "not at home" লিখিয়া রাখেন। কত আত্মহত্যা, কত Divorce কত Judicial separation নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। অধুনা বিলাতের চণ্ডী বা চামুণ্ডা দলের অর্থাৎ suffragetteদের ভীষণ কার্য্যাবলীর কথা কাহার অপরিজ্ঞাত? কত কত সুরম্য ভবন, কত কত সুন্দর বহুমূল্য চিত্র, কত মূল্যবান্ বস্তু, যে ইহাদের দ্বারা ভস্মীভূত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংলণ্ড এক্ষণ ইহাদের উগ্র তাণ্ডবে অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছে। ইহা কি?—না, স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল। এখন প্রতীচ্য জগতে বহু জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা ও দয়ামায়া পূর্ণ প্রগাঢ় শান্তিময় প্রাচ্য ভূমির সুস্নিগ্ধ শান্ত-রসাস্পদ পারিবারিক জীবনের প্রতি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিন্তু একবার যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা সম্বরিয়া ঘরে নেওয়া কি সহজ কথা? প্রায় অসম্ভব। এ সকল দেখিয়াও যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার আর কি আছে? হিন্দুপরিবারে কি স্বাধীনতা

নাই ?—আছে। কিন্তু তাহা নিয়ম ও সংযমের গণ্ডীতে সুদৃঢ়রূপে বেষ্টিত। হিন্দু স্ত্রী, বয়সের তারতম্য অনুসারে, পরিবারস্থ সকলের সঙ্গেই শীলতার সহিত সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া মিলিয়া মিশিয়া চলাফেরা করেন—আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও যাইয়া থাকেন। গৃহকর্ত্রীরূপে নিজের সংসার চালান তাঁহা-দিগের নিত্য কর্ত্তব্য। স্বামী বা নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খোলা গাড়ীতে বেড়াইলে বা চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিলেও তাঁহাদের জাতি যায় না। তবে স্বাধীনতার অভাব কোথায় রহিল তাহা বুঝি না। বিবিয়ানা পোষাক পরিয়া, যার তার সঙ্গে introduced হইবার পরেই হ্যাণ্ডসেক বা করমর্দ্দন করিয়া, কিংবা সভ্যতার হাসি হাসিয়া, আদর আপ্যায়িতের পর কাঁধে চাপিয়া না বসিলে কি এক টেবিলে তাদৃশ পরিচিত বহু বাবু বিবি একত্র বসিয়া খানা খাইয়া ইয়ারকির পথ প্রসর না করিলে বুঝি আর স্বাধীনতা হয় না! এই স্বাধীনতার ফল কোথায় যাইয়া গড়ায় তাহা সকলেই বুঝেন; দুর্ব্বল-রোগীর অন্তিম বিকারের ন্যায় রুগ্ন সমাজের এই স্ত্রী স্বাধীনতা, নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপের এই অন্তিম দীপ্তি, আশাপ্রদত নহেই—বরং ভীতিপ্রদ।

আজকাল অনেক আলোকপ্রাপ্তদের ঘরেই অনেক বালিকা অবয়বের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা থাকেন; তাঁহারা নব্য স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শে অনেক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় এমন কি অনেক অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গেও introduced হইবার পর হইতেই রীতিমত 'মেলা মেশা' করিয়া থাকেন। ফলে ইহাদের ঘরে স্বয়মিচ্ছু অনেক volunteer যুবক দিগকে নিয়ত হাজির দেখা

যায়। মেয়েদের মন যোগান, হারমোনিয়ম বা পিয়ানো বা টেবিলে বসিতে সহায়তা করা, ফরমাইস খাটা বা ফুলের তোড়া যোগানই তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, ঈদৃশ মেলামেশা হইতে অনেক সময়ে নৈতিক চরিত্রের অধোগতি হয়। শুনিতে শ্রুতিকঠোর হইলেও ইহা যে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ইউরোপ আমাদের অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধজনক আধুনিক স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এলিসন, সমগ্র ইয়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া, কি লিখিয়াছেন, একবার দেখুন।* কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত লব সাহেব বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের রীতি নীতি এমন অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত যে দিন দিন তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙ্গালিরা সে সকল কেন যে নির্দ্দোষ আদর্শজ্ঞানে নির্ব্বিকার চিত্তে অনুকরণ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারি না। যে স্থানে

---

* "If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause (female seclusion) in the East. Notwithstanding the immense advantages which Europe has long enjoyed from the energy of its character, the freedom of its institutions and the superiority of its knowledge, it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unrestrained social intercourse of the sexes, the incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women

সখা-সখীর ভাব হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই "চখা-চখীর" ভাব হওয়ার নিতান্তই সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে স্থানে মেলামেশার আইনের একটু বিশেষ 'কড়াকড়ি' হওয়া দরকার।

স্ত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার কথাও দুই একটা বলা আবশ্যক। স্ত্রী শিক্ষা যে এখন পূর্ব্ব হইতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে এ কথা কাহারও অবিদিত নাই এবং স্ত্রী শিক্ষা যে দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গল জনক তাহাতেও আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। মাতৃপদে আরোহণ করিয়া মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাঁহারা বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্য নরনারীদিগকে শিক্ষাদান ও তাঁহাদের চরিত্র গঠন করিবেন, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলকল্পে তাঁহাদের সুশিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়; এবং বর্ত্তমানে স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার আমি সর্ব্বতোভাবে দেশের অশেষ মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই ব্যাপারে একটুকু ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে। এখন যে ভাবে শিক্ষা প্রণালী

---

in great cities are accumulated together and the general license of manners, which has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks, in the East."

The enormous mass of female profligacy which overspreads all our towns is there almost unknown. From the Seclusion of the harem have in the middle classes, flowed purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes and the vehement passions to which it gives rise.

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আদর্শ শিক্ষা নহে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের যে তাহা একেবারে চক্ষে না পড়িয়াছে এমন নহে। মাতৃত্ব হইতে রমণীর আর শ্রেষ্ঠতর পদ নাই। আত্মত্যাগ, পবিত্রতা, মধুরতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, পরার্থ-প্রীতি, জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, প্রেম, স্নেহ সেবাব্রত ইত্যাদি যে সকল গুণাবলী দ্বারা আদর্শ মাতৃত্ব স্থাপিত হয়, যে সুশিক্ষাজনিত জ্ঞান দ্বারা সেগুলি নারীচরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া, পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া পরিশেষে অনন্ত দেবের অনন্ত মঙ্গল স্রোতে মিশিয়া যাইতে সক্ষম হয় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা অন্য শিক্ষা কেবল 'ছেলে ধরা' বা 'বাবু ধরা' শিক্ষা। তাহাতে জগতের বিশেষ কিছু 'ফায়দা' নাই।

ইংরেজ নিজের সন্তানকে সুশিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দিয়া সুশিক্ষিত ইংরাজ করিয়া তোলেন। এইরূপ ফরাসী নিজেদের সন্তানকে সুশিক্ষা দেন ও সুশিক্ষিত ফরাসী করিয়া তুলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। আর আমরা কি করি?—বর্ত্তমান শিক্ষা প্রভাবে আমরা বাঙ্গালী নর-নারীকে একবারে সাধারণ ট্যাস্ ফিরিঙ্গী বানাইয়া উঠাইতে চেষ্টা করি। যাঁহারা বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ করিয়া সেই স্থানে একবারে খাঁটি সাহেবীয়ানা ফলাইতে চাহেন, তাঁদৃশ বিচার-বিহীন বাতুলের মতে অবশ্যই এ শিক্ষা দূষণীয় না হইতে পারে। কিন্তু জাতি গত ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় উন্নতি বিধান ও কল্যাণ সাধন যাঁহাদিগের কাম্য, আধুনিক স্ত্রী শিক্ষা

প্রণালী তাঁহাদের নিকট অনেক দিক্ দিয়াই অসমীচীন বলিয়া বোধ হইবে। বিলাসিতা ও ফ্যাশনদুরস্ত-কায়দা এখনকার স্ত্রী শিক্ষার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিলাসিতার প্রভাবে আধুনিক বঙ্গমহিলারা দিন দিনই অকর্ম্মণ্য হইতেছেন,—স্বাস্থ্য হারাইতেছেন, গৃহ-কর্ম্ম ও আত্মীয়-স্বজনের সেবা কর্ম্মে উদাসীন ও অপটু হইতেছেন। তাঁহাদিগের অনেকে এমন 'ননীর পুতুল' হইয়া পড়িতেছেন যে, অন্য আত্মীয়স্বজনের সেবা কর্ম্ম দূরে থাকুক, অবশ্য কর্ত্তব্য স্বামী সেবায়ও একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিতেছেন। স্বামী অনেক সময় গ্রীষ্মের জ্বালায় অধীর হইয়া আপন গায়ে বাতাস করা উপলক্ষে শয্যাসহচরী পার্শ্ববর্ত্তিনী এই ফ্যাশনরোগকাতরা স্ত্রীর অঙ্গেই প্রকারান্তরে পাখা ঢুলাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন, ইহা যেমন লজ্জাকর তেমনই নিন্দনীয়। তাঁহাদিগের পক্ষে রান্না ঘরে আগুনের আঁচে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা এইরূপে গৃহ স্বামীর অর্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদের বিলাসের অনলে আহুতি দিয়া সংসারের অস্বচ্ছলতা দিন দিনই অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া ফেলিতেছেন। এই শ্রেণীর ফ্যাশন-বিলাসিনী মহিলাদিগের ফরমাইসের অন্ত নাই,—এক 'টয়লেট বা অঙ্গরাগ করিবার যে কত মাথামুণ্ড আছে তাহার আর সংখ্যা নাই।' তাঁহারা মুখে পাউডার কসমে-টিক কত কি ছাই ভস্ম মাখিয়া মুখের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য মলিন করিয়া ফেলেন। বাজারেও মুখের রং পরিষ্কার করিবার এবং চর্ম্ম মসৃণ করিবার যে কত জিনিষই, কত ভাবে কত রঙ্গে

বিজ্ঞাপনের বাহার দিয়া, বাহির হইতেছে তাহারও সংখ্যা নাই। এই ফ্যাশন-অন্ধ নর-নারীরা বোঝেন না যে, স্বাস্থ্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। জ্ঞান ও গুণ-ভাতি এবং পবিত্রতা ও মধুরতাই রূপের প্রকৃত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। এই শ্রেণীর ফ্যাশনদার নর-নারীদের বড় বড় মণিহারী সাহেব-দোকানের ক্যাটালগ নিত্যসঙ্গী। পাঠক যদি এই সকল ক্যাটালগ একবার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যান, তাহা হইলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার উপকরণ কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই সকল অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার সামগ্রী যে সকল নরনারী এখন অত্যন্ত আবশ্যকীয়রূপে ব্যবহার্য্য বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা যে বিলাসিতার সমুদ্রে ডুব দিয়া কত দূর তলাইয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহাও সহজে বুঝিতে পারিবেন। সংসারে যদি সকলেরই অফুরন্ত বৈভব থাকিত, এই বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া ব্যতীত যদি আর কাহারও কোন দিকে কোন কর্ত্তব্য না থাকিত তবে এক মাত্র স্বাস্থ্যটিকে অব্যাহত রাখিয়া এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু আমাদের অভাব অভিযোগ অনন্ত; কাজেই অনাবশ্যক বিলাসিতার চরণে এইরূপ আত্মোৎসর্গ নিতান্ত অবৈধ বলিয়া মনে করি। ইহাতে আমাদের সংসারে নানাভাবে নানাদিকে যে কর্ত্তব্য সকল আছে তাহা সাধনের পক্ষে গুরুতর অন্তরায় হইয়া পড়ে। বিলাসিতার ফলে অনেক মহিলা এখন আপনাদের সন্তান পালনের নিমিত্ত ‘আয়া,’ রাখিয়া থাকেন! এ সমস্তই বিলা-সিতার বিষময় ফল। কিন্তু, এই সকল ছাড়া বিলাসিতার আর

এক সাংঘাতিক ফল এই হইতেছে যে, ইহা মনকে অত্যন্ত লঘু করিয়া তুলিতেছে। ইহা কোন বিষয়কে গভীর ভাবে চিন্তা করিবার অবসর দেয় না, এমন কি, সেই শক্তিই একবারে অপহরণ করিয়া লয়—সুখ ও আরামের ক্রীত দাস করিয়া ফেলে। কষ্ট সহিষ্ণুতা আদৌ থাকে না—এবং সময়ে ইহা নৈতিক চরিত্রের অধোগতি সাধন করিয়া দুরপনেয় কলঙ্কের পথে আকর্ষণ করে।

আমরা যদি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত প্রকারের বিলাসিতায় অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে জাতীয় মেরুদণ্ড যে ঘুণেধরা বাঁশের মত নিরতিশয় ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে, তাহা সকলে চিন্তা করিয়া দেখেন কি? বিলাসিতা এবং আরাম একেবারে ভাল করিয়া অভ্যস্ত হইলে মানুষ তখন তাহার সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াও কেবল আরামই খুঁজিয়া বেড়ায়। কারণ, সে তখন ভোগ-সম্ভোগের ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। 'আত্মত্যাগ' এবং 'কষ্ট সহিষ্ণুতা বলিয়া' যে দুইটি কথা আছে তাহা তখন তাহার মধ্যে আর বিন্দুমাত্রও থাকে না। তখন তাহাকে জুতাই মার, আর পয়জারই মার, সে ঐ আরামের বিলাস ভোগের একটা ছিটাফোটা পাইবার প্রত্যাশায়ও তোমার পদ-লেহন করিবেই করিবে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। মোগল কিম্বা পাঠান দিগ্বিজয়ীরা যখন অন্য দেশ হইতে ভারত বিজেতৃরূপে প্রথম ভারতে আগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি অতুল শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম ও কর্ম্মক্ষমতারই না পরিচয় দিয়াছেন! কিন্তু, তৎপরে তাহাদের অনেকেই দিল্লীর 'তক্ত তাউসে' বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সারেঙ্গীর সুর, নর্ত্তকীর নৃত্য, মদিরেক্ষণার বিলোল কটাক্ষ,

সুপেয় সিরাজী এই সকল মধুর-মোহে মুগ্ধ হইয়া পুরুষকারের সেই মহনীয়মূর্ত্তিকে কেমন একটি ভোগ-বিলাসের স্ত্রৈণ-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া লইয়াছেন এবং অবশেষে বৈদেশিক আক্রমণে কেমন সহজে ধ্বংসের পথে গড়াইয়া পড়িয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। তাই বলি, যদি আধুনিক স্ত্রী শিক্ষায় বিলাসিতার B. A. পাশ দিবার এত বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে মহিলারা নিজে ত অকর্ম্মণ্য হইবেনই, ছেলে-দিগকেও ভোগ-বিলাসী করিয়া উঠাইবেন এবং মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকদের ঘরে বিবাহ হইলে বিলাস-ব্যবস্থার জন্য অকারণ অধিক অর্থ ব্যয় হেতু তাহাদের স্কন্ধে এক দুর্ব্বহ ভার হইয়া পড়িবেন। গার্হস্থ্য কর্ম্মের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার—স্ত্রী শিক্ষা বলিয়া কথা কি, সমস্ত প্রকার শিক্ষা প্রণালীরই এক গুরুতর অভাব ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক শূন্য শিক্ষা। পূর্ব্বে অশিক্ষিত প্রাচীনারাও আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতেন। সীতা সাবিত্রী প্রভৃতিই তাঁহাদের নারীধর্ম্মের বা নারীজীবনের আদর্শ এবং পূজা, ব্রত-আচরণ, সাত্বিক আচার নিষ্ঠা তাঁহাদের নিত্য করণীয় ছিল। গুরুজনে ভক্তি, পিতা মাতার সেবা, পতি সেবা, বাটীস্থ সকলের সেবা পরিচর্য্যা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য থাকিত। গার্হস্থ্য সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার ব্যবস্থা ছিল। এই পবিত্র শান্তিময় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে ক্রমে তাঁহাদের উচ্চতম

প্রেমভক্তি ও ত্যাগধর্ম্ম লাভ হইত। তাঁহারা অতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। দীন-দুঃখীকে দান, অতিথি সেবা, জলাশয় খনন, দেবতা প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্যের অন্তর্ভূ্ত ছিল। কেবল ভদ্র ও সম্পন্ন ঘরের মহিলাদিগের মধ্যেই যে ইহা ছিল এমন নহে। অতি বড় দীন দুঃখীও তাহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা এমনই একটা সৎকার্য্য করিয়া যাইবার জন্য প্রাণে লালায়িত থাকিত। এখন সে সকলের কিছুই নাই। এখন ঐ সকল কার্য্য প্রণালী ও অনুষ্ঠান আধুনিক শিক্ষাজনিত ফ্যাশনের জ্বালায়, অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক, আর অমনোযোগিতা হেতুই হউক, অধিকাংশ স্থলেই অবহেলিত হইতেছে। এখনকার শিক্ষা কেবল জ্যাকেট কামিজের বাহার দিয়া গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাওয়া এবং তোতার মত কতকগুলি বাঁধাবুলি মুখস্থ করা; ইহার পরে পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই সব ফুরাইয়া গেল। তখন যে তিনি শিক্ষাভিমানিনী, তাহা তাঁহার চেহারা দেখিবা মাত্রই 'মালুম' হইবে। তাহার দুর্ব্বল দেহ-যষ্টি শিক্ষার ভারে ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুবর্ণ স্ফূর্ত্তিহীন মুখশ্রী, জ্যোতির্হীন চক্ষু,—'দেহটি ব্যাধি মন্দির।' তবে বাহিরে অবশ্যই কোথাও চশমা কোথাও বা হালফ্যাশনের পার্শী শাড়ী বা ঢাকাই কাপড়ে পরিবার ঢং আবার কোথাও বা 'ক্ষুরওয়ালা' বিলাতী জুতা এই সকলই তাঁহার আধুনিক শিক্ষা ও হালফ্যাশনের নিশান উড়াইতেছে—যিনিই দেখিবেন, তাঁহারই তাঁহাকে সুশিক্ষিতা বলিয়া বুঝিয়া লইতে ভ্রম হইবেনা—সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝিবেন যে তিনি আলোকপ্রাপ্তা।

বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় সাদাসিদে অথচ কার্য্যকারণে সময় বিশেষে শিক্ষাও উৎকর্ষের মহিমা বিশেষরূপে স্বতঃই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এরূপ আদর্শ শিক্ষিতা স্ত্রী-লোকের সংখ্যা অতি বিরল—যাহাদের ললাটে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার ন্যায় বিজ্ঞাপনের এমন কিছু উড়িতে থাকে না, যাহাতে তাহাদিগকে দূর হইতেই চীৎকার করিয়া আলোকপ্রাপ্তা বলিয়া বিঘোষিত করিতে থাকে। ফলতঃ, চিত্তকে লঘু এবং কেবল বহির্ম্মুখী করিবার যত কিছু প্রকার প্রকরণ আছে তাহার আর বিশেষ কিছু আধুনিক স্ত্রী শিক্ষায় বাকী থাকে না। লোকে শিক্ষা শিক্ষা রব করে ;—কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান শিক্ষায় সাধিত হইতেছে কি না তাহা কেহই তলাইয়া দেখেন না। কেবল লোক দেখান পিয়ানো বা টেবিল হারমোনিয়মে বসিতে শিখিলে, পশমের গলাবন্ধ বা লেছ বুনিতে শিখিলে আর History Geographyর বাঁধি বোল মুখস্থ করিতে পারিলেই আদর্শ শিক্ষা হয় না।

বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগকে যে ভাবে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি হইতে অনাবশ্যক বিলাসিতা ও হাল-ফ্যাশনের ঢংটুকু বাদ দিয়া লইলে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সেই শিক্ষা তাহাদের উন্নতিবিধানকল্পে কার্য্যকরী নয়, আমি এমন কথা বলি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আদর্শ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যাবৎ না আমাদের দেশের সেই পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর মঙ্গল্য স্রোত মিশ্রিত হইবে—যাবৎ

না শিক্ষায় আমাদের সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি—সত্য, ত্যাগ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার উপর স্থাপিত হইবে—যাবৎ না এই শিক্ষায় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ আদর্শ মাতৃপদে অধিরোহণের প্রকৃত উপাদান পাইবেন, তাবৎ এই আধুনিক শিক্ষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে সমাজে যথেষ্ট ক্লিওপেট্রা বা হেলেনের আবির্ভাব হইতেছে বটে কিন্তু সীতা সাবিত্রীর ছাঁচ প্রায়শঃ প্রতিফলিত হইতেছে না।

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার আর এক ত্রুটি এই যে, ইহাতে সকলদিকেই উপর-পালিশ বা বার্ণিশ দিবার যত আয়োজন দেখা যায়—কোনদিকেই জ্ঞান একটু গভীর করিবার দিকে ততটা আগ্রহ দেখা যায় না। বাহির হইতে শোনা যায় অমুক মেয়ে French জানেন, অমুক লাটিন জানেন, অমুক Greek জানেন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ঈদৃশ পৌনে পোনের আনাস্থলেই ইহা পুরুষ-ঠকান চাল মাত্র। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা ঐ সকল ভাষায় না পারেন এক ছত্র লিখিতে—না পারেন একটি কথা বলিতে। ঐ সকল ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দুই একখানি পুস্তকের হয় ত দুই এক পাতা উল্টাইয়াছেন—তাহাতেই বাহিরে প্রচার তিনি ২।৩টি বিদেশী ভাষা জানেন। তাই বলিতেছি ইহাদের কেবল বাহির চমক এবং বার্ণিশের বাহার!

আজ কাল মহিলাদের সঙ্গীত বিদ্যার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে; কিন্তু প্রায় পোনর আনা স্থলেই সঙ্গীতের নাম

হারমোনিয়মের কর্ণবিদারক পেঁ—পো। অনেকে আবার এমনই ফ্যাশন-উন্মাদিনী যে, দেশীয় রাগরাগিণী সংবলিত সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইংরাজী গৎ শিখেন। যে ভারতীয় সঙ্গীতের পৃথিবীতে তুলনা নাই, ফ্যাশনের ঝোঁকে তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। দেশীয় নানারূপ উৎকৃষ্ট যন্ত্র থাকিতে হারমোনিয়মই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য। অনেকে আবার গ্রামোফোণ খরিদ করিয়াই সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। একদা আমার একটি হাস্যপরিহাস-প্রিয় রসিক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, অনেকে অনেক যন্ত্র বাজাইতে পারেন সত্য আমিও একটা যন্ত্র বাজাইতে পারি। আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম সে কি যন্ত্র? তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"গ্রামোফোণ"! চিত্র সম্পর্কেও ঐ একই কথা—সোজা বাঁকা কয়েকটা লাইন কাটিয়াই চিত্র সমাপ্ত হয়। তবে সেলাই কাজটা এক্ষণে অনেকে ভাল করিয়া শিক্ষা করেন এবং তাহার কোন কোনটি গৃহ কাজেও লাগে। বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে, স্ত্রীলোক কলম-কাটা ছুরী; যতই ধার দেওনা কেন পাঁঠা মহিষ কাটিবার কাজ কোন দিনও চলিবে না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়াই যেন মনে হয়। আজ কাল মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যায়াম চর্চ্চার অনুরাগিণী হইয়াছেন। পূর্ব্বে গৃহকর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের নানারূপ শ্রম হইত; এখন যখন অধিকাংশস্থলেই সে সকল নাই, তখন আধুনিক ব্যায়াম-চর্চ্চা তাহাদের পক্ষে আমি অসঙ্গত মনে

করি না। তাঁহারা চশমা লাগাইয়া বিলাসিতার যে সকল নানারূপ লক্ষ্মীছাড়া ফ্যাশন করেন, তাহা অপেক্ষা নিজ গৃহ-অঙ্গনে নিজেরা মিলিয়া যদি তাঁহারা ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা সবিশেষ মঙ্গলাস্পদ। তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় স্বাস্থ্য ইহাতে ফিরিয়া অসিবার সম্ভাবনা আছে। মোট কথা, আত্মরক্ষার্থ এবং সুস্থকায় বলিষ্ঠ সন্তান প্রসবের নিমিত্ত, তাঁহাদের এই বর্ত্তমান বিলাস-জীর্ণ দুর্ব্বল শারীরিক অবস্থা হইতে তাহাদের বহুগুণে সবল ও সুস্থ হওয়া একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতিকল্পে যে যে বিষয়ের সংস্কার বা অনুকরণ প্রয়োজনীয়, আমি আনন্দের সহিত সেগুলির অনুমোদন করিব। কিন্তু, বিলাসিতা, চরিত্রহীনতা, অজ্ঞানতা, ভীরুতা, আত্মঅস্তিত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধে অক্ষমতা, আত্মত্যাগে বিমুখতা ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা কোন ব্যক্তি বা জাতিকে কখনও উন্নত করিতে সমর্থ হয় নাই—কখনও হইবে না। সুতরাং সে সকলের প্রশ্রয় দেওয়া কখনও কাহারও সঙ্গত নহে।

নব্যবঙ্গের আর এক ফ্যাশন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপীয়ান বা ইউরেশীয়ান "গভারর্ণেছ্" (Governess) রাখা। বলাবাহুল্য, এই সকল গভারর্ণেছ্দের মধ্যে আদর্শস্থানীয় রমণী না আছেন এমন কথা নহে। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ইহাদের মধ্যে অনেকেই বংশ মর্য্যাদায় নিতান্ত খাঁটো। এবং যে পরিমাণে শিক্ষা এবং চরিত্র গৌরব ও গাম্ভীর্য্য থাকিলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রকৃতশিক্ষা ও চরিত্র

গঠনের সহায়তা হইতেপারে, তাহা ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই থাকে না। শুটকিমাছভোজী পাউডার-বিলাসিনী অকারণে-বাবুর্চ্চীর-বেতন-কর্ত্তনকারিণী কুক্কুট ও ডিম্ব-প্রিয় পোষাক সর্ব্বস্ব অর্থগৃধ্নু গভার্ণেছ্‌দের আজিকালি অনেক বাবুর গৃহেই প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের শিক্ষার ফলে অনেকস্থলে কালে ঐ সকল বাঙ্গালীর ছেলে বিলাসী 'ট্যাশ ফিরিঙ্গী' হইয়া দাঁড়ায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার সন্তানগণকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী করিতে চাহেন না—একেবারে সাহেব করিতে চাহেন। তাঁহাদের এই বিকৃত অনুকরণের ফলে ছেলেমেয়েগুলি Governess এর নিকট থাকিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে নানারূপের নানা ঢঙের বিলাতী ফ্যাশনের বিলাসিতা অভ্যাস করিয়া লয়। পাঠক, বাল্যকালের এই এই অভ্যাস যে কিরূপ অস্থিমজ্জাগত হয় তাহা বোধ হয় আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। বয়স হইলে সে একজন ট্যাশ্ ফিরিঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। অনেকস্থলে ধর্ম্মশিক্ষা ইহাদের আদৌ হয় না, নৈতিক চরিত্র উন্নতি বিষয়ে ইহারা উপযুক্তরূপ উপদিষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্যে গুরুজনে ভক্তি এবং স্বজন ও স্বজাতিপ্রীতির অভাবও দৃষ্ট হয় এবং ইহারা দেশের অতি মঙ্গল-জনক রীতি নীতি ও নিয়মাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে ও ঐ সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখে।

অনেকস্থলে স্বজাতিকে 'নেটিভ নিগার' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেও সে ছাড়ে না। পাঠক দেখুন, এখন এরূপ শিক্ষার ফল কি? যে শিক্ষায়, স্বদেশ, স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি না জন্মাইয়া বিদ্বেষ বা ঘৃণা জন্মায়,—দেশের জগৎ-পূজ্য ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, আচারনীতি ও পারিবারিক নীতিতে উপেক্ষার ভাব আনিয়া ফেলে,—পক্ষান্তরে কেবল বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধ-অনুকরণপ্রিয়তা বাড়াইয়া দেয়, সে শিক্ষা কি কেবল হ্যাট কোট বুট পরিয়া 'ফুট ফুটে' ট্যাশ ফীরিঙ্গীর মত চেহারা ধরিবার এবং তুবড়ীর মত ফুর ফুর করিয়া ইংরাজী কহিবার খাতিরেই গ্রহণযোগ্য? অনর্গল ইংরাজী কহিতে পারিলে কি একটু সাহেবী ঢং শিখিলেই কি আমাদের চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ) ফল লাভ হইবে? কিন্তু ফ্যাশন এমনই মোহ যে, ইহা অনেক সময় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও বিচার শক্তি লোপ করিয়া ফেলে। দেশে অনেক সুবিজ্ঞ চরিত্রবান্ বালকদিগের-চরিত্র-গঠনকর্ম্মে নিপুণ লোক আছেন যাঁহাদিগের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীপ্সিত কর্ম্মই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনেক হালফ্যাশনের বাবুদের মন উঠে না—শুধু ঢং এবং সঙ সজ্জার খাতিরে এবং কোথাও বা অন্য মতলবে Governess ছাড়া তাহাদের চলে না।

নব্য বঙ্গের আর এক ফ্যাশন্ বক্তৃতা। এখন আহারে বিহারে, আগমনে বিদায়ে, শোকে সুখে বাদে প্রতিবাদে

সকল সময়েই বক্তৃতার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সকলেই জানেন ভাবের গাধিক্যে ভাষা মূকের ন্যায় হইয়া যায়। যেখানে ভাব কম, সেখানে ভাষার আধিক্য কিছু বেশী হইয়া থাকে; শূন্য কুম্ভেই শব্দের ঘটা। যে কথায় বেশী, সে কাজে কম—ইহা প্রায়ঃশই দেখা যায়। নানাকার্য্যে, নানা উদ্দেশ্যে, বক্তৃতার প্রয়োজন নিতান্ত আবশ্যকীয়—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যখন দেশ শুধু বক্তৃতাসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে—যখন কার্য্য অপেক্ষা কথার পারিপাট্য অত্যধিক দৃষ্ট হয়—অথবা বক্তৃতাই যখন প্রকৃত কর্ম্মের স্থল অধিকার করিয়া বসে, তখনই বক্তৃতা ফ্যাশনরূপে গণ্য হইয়া একটু নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। অত্যন্ত বেশী কথার প্রভাবে যে আন্তরিকতার একটু অভাব দৃষ্ট হয় এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যাহাতে অতিরিক্ত বক্তৃতার প্রভাবে আমাদের আন্তরিক ভাবের গুরুত্ব বা কর্ম্ম করিবার দৃঢ়তা না হারাই—যাহাতে বক্তৃতাটা শুধু ফ্যাশনের অঙ্গ না হইয়া পড়ে, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত।

এক্ষণে শিষ্টাচার প্রদর্শনের আধুনিক ফ্যাশনের কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে কোন প্রিয়জন গৃহে উপস্থিত হইলে বুক ভরা আলিঙ্গন বা নয়নের আনন্দাশ্রুদ্বারা তাহার সংবর্দ্ধনা হইত। এখন একটু 'হ্যাল্লো' (Halloo) বলিয়া Handshake করিয়াই সে কার্য্য সম্পাদন করা হয়। তখন এ দেশে গুরু-স্থানীয় প্রণম্য জনকে, জানু পাতিয়া, ভূতলে মাথা লুটাইয়া, প্রণাম করা হইত। এতদ্ব্যতীত মান্য

ব্যক্তিমাত্রকেই অভিবাদন নমস্কার বা সেলাম দ্বারা সংবর্দ্ধনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রণাম বা নমস্কার হিন্দু রীতির অনুমোদিত—সেলাম মুসলমানী শিষ্টাচার। কিন্তু এক্ষণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম ও পদ-ধূলি গ্রহণ এক প্রকার উঠিয়া-গিয়াছে। এখনও যেখানে আছে, সেখানেও উহা লোকের আপন ঘরে গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সভা সমিতিতে প্রণামের অনুষ্ঠান অধুনা ঘোর অশিষ্টতা বা অসভ্যতারূপে গণ্য। নমস্কারও একবারে উঠিয়া যায় নাই। হিন্দুর মধ্যে স্থানে স্থানে নমস্কারের প্রথা বর্ত্তমান আছে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুয়ের মধ্যেই সেলামের রীতিটাও চলিত রহিয়াছে। কোর্ট ও দরবারে সেলামেরই প্রভুত্ব! কিন্তু ইহা ছাড়া, অন্য সর্ব্বত্রই প্রণাম নমস্কার ও সেলামকে তাড়াইয়া দিয়া 'গুড্‌মর্ণিং' আপনার এক চেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়াছে। বিনীত ভাবে হাত দুখানি যোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া সেই অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত কপালে ছোঁয়াইয়া সম্মান প্রদর্শন হিন্দুর নমস্কার। মাথা ও কটি নত করিয়া প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের উম্মুক্ত করতল ললাটে স্পর্শ করান মুসলমানের সেলাম। এক্ষণে এই নমস্কার ও সেলামের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্রই মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত গুড্‌মর্ণিং নিনাদ সহকারে উর্দ্ধদিকে চকিতে লাফাইয়া উঠিয়া কোথাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কোথাও বা বড়শীর আকারে বক্র তর্জ্জনী প্রদর্শন পূর্ব্বক, এক অভিনব অদ্ভুত প্রণালীতে সম্মান প্রদর্শনের রীতি রক্ষা করিতেছে। পাঠক, ছোট ও বড় উচ্চ ও নীচ শত্রু ও

মিত্র সকলে মিলিয়া জাতিকুল ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া শারদীয়া-পূজা-অন্তে বিজয়া দিনের সেই প্রাণ-ভরা বুকভরা কোলাকুলি বা আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে কি?—যখন নয়নে আপনি অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠে,—ক্ষণ-কালের তরেও সংসারের সকল বাদ-বিসম্বাদ যখন লুপ্ত হয়, প্রাণে কি এক সকরুণ বিষাদ-প্রেমের সুর বাজিতে থাকে! আজ তাহার স্থান অধিকার করিতে চাহে "হ্যাল্লো" বা "How do you do?" বা একখানি ছবিযুক্ত কার্ড! আজ কাল কোন বড় দরবার বা লেভী বা ইভ্‌নিং-পার্টি (evening party) বা গার্ডেন-পার্টিতে উপস্থিত থাকিলে আন্তরিকতা বিহীন নটলীলাপূর্ণ "হ্যাল্লো" Hand-shake এবং How do you doএর খুব বাহার দেখা যায়। সেখানে স্বর্ণ রৌপ্য খচিত কারুকার্য্যময় চোগা চাপকান পরিয়া, বায়ুভরে ঈষৎতুলিত শুভ্রপালকগুচ্ছ-শোভিত বিচিত্র মুকুট মস্তকে দিয়া, কটিবন্ধে সুবর্ণ নির্ম্মিত পিধানে ধারবিহীন তরবারি দোদুল্যমান করিয়া, ছোট বড় সজ্জিত পুতুলগুলি যখন ঘাসের উপর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে থাকেন,—সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর ধনী শিক্ষিত এবং হাকিম সম্প্রদায়ের অনেক লোক কেহ চোগা চাপকান্ শামলা, কেহ হ্যাট কোট কলার নেকটাই ইত্যাদি নানা ভাবে নানা ঢঙে একে অন্যের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যখন ইতস্ততঃ ঘুরিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সেখানে সকলেরই নিজকে খুব একটা smart এবং intelligent লোক বলিয়া সকলকে বুঝাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। সকলেই সেখানে ইংরাজী

বুলি বলেন। কারণ, তাহা না হইলে enlightened বলিয়া লোকে বুঝিবে কেন? সেখানে অনেকেরই কণ্ঠ এবং জিহ্বা স্বভাবতঃ শুষ্ক থাকে। যেহেতু, তথায় সমবেত অনেকেই কোন না কোনরূপে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বা অধীনভাবাপন্ন। কেহ কোন বিশেষ অভীষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনপ্রয়াসী, কেহ বা উপাধি-আকাঙ্ক্ষী এবং অন্যান্য অনেকে চাকরী বা নোকরী-ব্যবসায়ী। এ স্থলে একটুকু সশঙ্কচিত্ত ও শুষ্কমুখ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রভুপদে সমাসীন ব্যক্তিদিগের নিকট অধীন ভাবাপন্ন বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদের সকল স্থানেই এই অবস্থা: ইহা কোন অংশেও নূতন কথা নয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সে স্থানে উপস্থিত সজ্জিত ব্যক্তিগণ ওষ্ঠদ্বয় দুই কর্ণের দিকে যতদূর প্রসারণ করিতে পারা যায় ততদূর প্রসারিত করিয়া, অতি আহ্লাদের হাসি হাসিয়া সেই দুর্ব্বলতা সকলেই সকলের কাছে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। যাঁহাদের সঙ্গে হয়ত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার আধুনিক introduce হইবার কায়দায় এক মিনিটের জন্য একটুকু আলাপ পরিচয় মাত্র হইয়াছিল, তাহার পরে আর কোন সংবাদই নাই, তাঁহারাও দূর হইতে একে অন্যকে দেখিয়া, চীলে ছোঁ দিবার ন্যায়, দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া (Hallow) 'হাল্লো' বা How do you do বলিয়া অস্বাভাবিক রূপে অত্যধিক হাস্য করতঃ সুদীর্ঘ Handshake করেন। এই রূপে যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই ফ্যাশনের হাসি, ফ্যাশনের বুলি এবং পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁকাইয়া Handshake

এর ধূম। সেখানে আবার অনেকেরই কাম্য থাকে যে, যদি কোন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দয়া করিয়া কাহারও সঙ্গে দুই একটা কথা বলেন, তিনি যেন ঠিক সেই সময়ে সকলের দৃষ্টিপথে পড়েন। এ সকল স্থানে চিরদুর্ল্লভ বন্ধুত্ব অতি সহজলভ্য বা সুলভ। বন্ধুত্বসংঘটনে কেবল একটা introduction ভিন্ন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই অর্থাৎ উভয়ের পরিচিত মধ্যবর্ত্তী কোন এক জনের শুধু বলিবার অপেক্ষা যে তিনি অমুক সে অমুক, তাহা হইলেই অমনি চির-বন্ধুত্বের অভিনয় চলিতে থাকে। যে স্থলে সুখে দুঃখে কোনরূপ সমপ্রাণতা বা সমবেদনা না থাকার পরিচয় প্রতিপদে পাওয়া যায় সেখানেও ফ্যাশনের খাতিরে মানুষ আধুনিক সভ্যযুগের কপট বন্ধুতার মধু বিলাইয়া কেমন এক অস্বাভাবিক কৃত্রিম আনন্দে আনন্দিত হইয়া থাকেন। বলিহারি সভ্যতা! বলিহারি তোমার ফ্যাশন!

নব্যবঙ্গে 'চা পান' একটি সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে পান তামাক ও জলযোগের পারিপাট্যে যে অভ্যর্থনা হইত, এখন কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুব্যক্তি বাড়ী আসিলে চা পান করিতে দিয়া সেই অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে। সহরে স্থানে স্থানে এখন বিশ্রাম-আগার বা Refreshment-room নাম দিয়া চা-পানের আড্ডা হইয়াছে। তথায় যখনই যাও দেখিতে পাইবে বাবুরা চা পান করিতেছেন ও নানাপ্রকার মুখভঙ্গির সহিত বিস্কুট খাইতেছেন। গরমে যে দিন প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়, সে দিনও বাবুদের চা

চাই। কেহ বা এই পরিমাণে চা-খোর হইয়াছেন যে, সময় মত, কোন কারণে চা না পাইলে গরম জল খাইয়া চায়ের পিপাসা তৃপ্ত করেন ; বুঝুন এখন, কি উৎকট ব্যাধি!

বাড়ী ছাড়িয়া হোটেলে বা দোকানে বসিয়া যা তা খাইবার প্রবৃত্তি কেন যে এতটা প্রবল তাহা বুঝি না। বোধ হয় ইহা এ যুগের ফ্যাশন। 'চা' অথবা প্রকারান্তরে আসামী কুলীর রক্ত পান না করিলে যে আমাদের কি অনিষ্ট তাহা বুঝি না ; তথাপি এ বদ্-অভ্যাস করিতেই হইবে। সকলেই অনুরোধ ক্রমে বা দেখা-দেখি এই পাপ অভ্যাস করেন। কেন করেন—ইহাতে কি লাভ—তাহা তলাইয়া দেখেন না বা দেখিবার শক্তি রাখেন না। চা-পান গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী নহে। ইহাতে মাথা ও পেট গরম হয় ; অনেকস্থলে এই অভ্যাসের অপরিহার্য্য পরিণাম নানাবিধ কঠিন রোগের আকর, জীবন-ব্যাপী দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ডিস্পেপ্সিয়া। এই সাংঘাতিক পরিণাম-চিন্তা কয়জনের আছে? পালের এক ভেড়া লাফ দিলে তাহা দেখিয়া পালস্থ সব ভেড়াই লাফাইতে থাকে। ইহাই ভেড়ার ধর্ম্ম—ইহাই উহাদিগের জাতিগত সংস্কার। এখন ত এমন হইয়াছে যে, চা বন্ধ করিলে বোধ হয় সমাজের বার-আনা লোকের মৃত্যু হয়! সাবাস হালফ্যাশন! পয়সা লুঠিতে তুমিই জান, এমন নেশাই ধরাইয়াছ যে, তাহা আর ছুটিবার নহে।

সিগারেটের কথা আর কি বলিব? সিগারেট বঙ্গদেশের আধুনিক ফ্যাশনের বিজয়-পতাকা। এখন বোধ হয় বঙ্গদেশে সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই, মাতৃস্তন্য পানের পূর্ব্বে, সিগারেটে দুই একটি টান দিয়া লয়! পাঠক, আপনি এ কথাটা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। দাঁড়াইতে মাত্র শিখিয়াছে এমন নগ্নশিশুকে, পাঁচ বৎসরের শিশু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিগারেট টানার অনুকরণে, সিগারেটের পরিবর্ত্তে পাঁ-কাঠীতে আগুন দিয়া টানিতে টানিতে ঠোঁট পোড়াইয়া ফেলিতে দেখিয়াছি! কত অর্থ এবং কত লোকের স্বাস্থ্য যে ইহাতে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বদেশের উন্নতি কল্পে ধ্রুপদে সুর ধরিয়া অনেকে বড় বড় কথার অবতারণাপূর্ব্বক তার-স্বরে চীৎকার করেন; কিন্তু দেশের কত অপরিমিত অর্থ ও স্বাস্থ্য যে সিগারেটের ধূমে উড়িয়া অপব্যয়িত হয় তাহার গতিরোধ কল্পে কেহ চেষ্টা করেন কি? মহৎ কাজ করিতে হইলে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। দেশস্থ সকলে এই চা ও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করিয়া এতদর্থে তাহাদের প্রতি বৎসর যাহা খরচ হইত তাহা বাঁচাইয়া সেই অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যয় করুন দেখি। দেখিতে পাইবেন যে, ইহা দ্বারা দেশের কি এক কল্পনাতীত বৃহৎ কাজ হইয়া যাইবে। 'বয়কট' 'বয়কট' বলিয়া এত আন্দোলন শুনি, কিন্তু নিজেদের বদ-অভ্যাসগুলির বয়কট করিলেই ত প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। কিন্তু হায়! এ দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় কি?

আর এক ছোট খাট উপসর্গ সোডা লিমনেড। ইহা ছাড়া এক্ষণে সভ্যবাবুদিগের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। এখন সুমিষ্ট ডাব নারিকেলের জলও ঝাঁজাল সোডা লিমনেডের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। সুপেয় সরবৎও এখন সেই Effervescence বা ঝাঁজ না থাকার দরুণ বিস্বাদ লাগে। এ যুগের যত কিছু সুখ এবং সখ সকলই প্রদাহী এবং দদ্রু-কণ্ডুয়ণের ন্যায় জ্বালাময় হওয়া চাই নতুবা ত Romantic ই হইল না!

আজ কাল আবার কেহ কেহ বিলাতে যাইয়া ফ্যাশন করিয়া মেম বিবাহ করিয়া আসেন। তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে বড় বিলম্ব হয় না। তাঁহারা না পারেন সাহেবী সমাজে আসন পাইতে—না পাবেন স্বদেশী ও স্বজাতি সমাজে মিশিতে। তাঁহাদের তাঁতী কুলও যায়—বৈষ্ণব কুলও যায়। তার পরে অনেক স্থলেই মেম-স্ত্রী পোষা আর হাতী পোষা সমান হইয়া পড়ে। খরচে কুলায় না—কুক্কুট মাংসের পরিবর্ত্তে ভর্জ্জিত চিংড়ী আসিয়া খানার টেবিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লয়। তার পর অনেকগুলি ছেলেপিলে হইলে ত কথাই নাই। ফলে, শেষে যে তাঁহারা কোথায় যান—কোথায় যাইয়া ধ্বংসের মুখে গড়াইয়া পড়েন, তাহার খোঁজ খবরই আর পাওয়া যায় না।

সাহেবীফ্যাশনে মার্জ্জিত-রুচি হইতে হইলে যেমন আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম রীতি নীতি বেশ ভূষা ইত্যাদিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে হয় বেলফুল ঘৃণা

করিয়া বিদেশী অকিঞ্চিৎকর ফুলের দুর্গন্ধে বা গন্ধহীনতায়ই আনন্দে গদগদ হইতে হয়, তেমনই আবার সেই সকলের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতিও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হয়। কেহ কেহ দুই মাস বিলাতে থাকিয়াই মাতৃভাষা না কি ভুলিয়া যান; অথবা বাঁকা বাঁকা সাহেবী বাঙ্গালা বুলি ধরেন! কেহ বা বাঙ্গালায় সকল কথা প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়া যেন একটু গৌরব করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক ঘণ্টা কাল ইংরাজী বুকনী না মিশাইয়া অবিমিশ্র বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারেন এরূপ লোক অতি বিরল। বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালীর কাছেও ইংরাজীতেই চিঠী লিখিয়া থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলেন এবং বলিয়া মৃদুমন্দ হাসিয়া গৌরব বোধ করেন যে, তাঁহারা বাঙ্গলা লিখিলে লেখা অতি কদর্য্য হয় এবং লেখাতে অনেক লজ্জাজনক ভুল হইয়া পড়ে। লেখা যে কদর্য্য ও তাহাতে যে ভুল হয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু এতাদৃশ লজ্জাজনক অজ্ঞতায় তাঁহারা বিশেষ একটা গৌরব বোধ না করিলে অমন সরল ভাল মানুষটির মত ইহা কখনই যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়াইতেন না। তা ছাড়া ইংরাজী দু'ছত্র চিঠী কাহারও নিকট লিখিলে তাঁহারা যে খুব শিক্ষিত ও আলোপ্রাপ্ত উচ্চদরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইবেন অন্যথা দর কমিয়া যাইবে এই ভাবনাও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। এখন বহু স্থলেই পুত্র পিতার

নিকট বন্ধু বন্ধুর নিকট এমন কি পারিলে স্ত্রীও স্বামীর নিকট ইংরাজীতে চিঠী লিখেন। এই ফ্যাশনের হাত হইতে শিক্ষিত সমাজের লোকেরা মুক্তি পান নাই। ফ্যাশন অতি সংক্রামক রোগ। ইহার Bacilli বা কীটাণু বালক এবং যুবক-দিগকেই বেশী আক্রমণ করিয়া থাকে। পক্ককেশ লোল-চর্ম্মের উপর ইহার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পর দেখা হইলে ইংরাজীতেই আদর অভ্যর্থনা হয় এবং কথাবার্ত্তাও যাহা ইংরাজীতে না যোটে তাহাই শুধু বাঙ্গালায় হইয়া থাকে। অনেকেরই ধারণা যে, কথোপকথনের সময় দুই চারিটা ইংরাজী শব্দ না বলিলে নিজেকে enlightened বা আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া সকলকে বুঝাইবার পক্ষে একে-বারেই সুবিধা হয় না। বলা বাহুল্য যে, ইঁহাদের অনেকেরই ইংরাজীতে জ্ঞান তেমন বিশেষ কিছু নাই। বাবুরা অতি শঙ্কিত ভাবে ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখেন সদাই ভয় যে, ইংরাজীতে বা কোন ভুল থাকে এবং তাহা কাহারও কাছে বা ধরা পড়ে, তাহা হইলে ত একবারেই মাথা কাটা যাইবার কথা। কিন্তু বাঙ্গলা লিখিতে ভুল হইলে সে-টা গৌরবের বিষয়! এই অস্বাভাবিক বিসদৃশ ভাব আধুনিক বঙ্গের একটা প্রবল ফ্যাশন। যত নূতন ভাষা শিক্ষা হয় ততই ভাল—জ্ঞান ভাণ্ডার ততই পরিপুষ্ট হয় এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার ততই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃভাষার প্রতি ঐরূপ অনাদর ও এই শ্রেণীর অস্বাভাবিক অবজ্ঞা কোন অংশেই প্রার্থনীয় বা বাঞ্ছনীয় নহে।

বাঙ্গালা ভাষাকে বেওয়ারিশ মাল পাইয়া অনেক লেখক ইহাতে অনেক রকম খামখেয়ালী চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহাও একটা ফ্যাশন হইয়াছে। এই ফ্যাশনের ফলেই আমরা এখন 'বাংলা' "কী সুখী হইয়াছি" প্রভৃতি ভাষা-বিকার দেখিতেছি। বাঙ্গালা যদি "বাংলা" এই ভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী লিখিতে হইলে 'বাং-আলী' এই ভাবেই লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর বাঙ্গালা দেখিলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালা ভাষা, পিতৃ মাতৃহীনা অনাথার সাজে সাজিয়া, বাহির হইয়াছে।

কলিকাতার কথ্য ভাষার অনুকরণ স্থলবিশেষে আরও একটি হাস্যকর ফ্যাশনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম বা বরিশালের লোক অথবা অর্দ্ধশিক্ষিতা ফ্যাশন-সর্ব্বস্বা পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকেরা যখন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া 'কলকাত্তাই' ভাষার অনুকরণে এক অদ্ভুত বুলির সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। অনেক গ্রন্থকার এখন সরল ও সহজ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে যাইয়া কলিকাতার কথ্য ভাষার শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনায় এই ফ্যাশন বদ্ধমূল হইয়া গেলে ভাষাগত ওজোগুণ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা একেবারে মেয়েলি বা হিঁয়ালী ছন্দে পরিণত হইয়া কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিবে। প্রাদেশিক কথ্য ভাষা গ্রন্থের ভাষা হইলে যে ভাষার উন্নতি ও বিকাশের পথ চিররুদ্ধ

হইয়া যায় বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

আধুনিক যুগের আর একটি বড় অদ্ভুত ফ্যাশন এই যে—যিনি যত লোককে ঠকাইতে বা যত লোকের চোখে ধূলা দিতে পারেন—মিথ্যা কথা কহিতে পারেন—ন্যায্য প্রাপ্য না দেওয়ার পথ বাহির করিতে বা পরের সম্পত্তি কাড়িয়া নিতে বা নানা পাকচক্রে দখল করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ এক কথায় যিনি যত ভদ্রলোকের মুখোস পরিয়া ও সভ্যতার আবরণে যত রকম মিথ্যা জাল জালিয়াতী বা জুয়াচুরী করিতে বা কাহাকেও তদনুরূপ বুদ্ধি দিতে সক্ষম তিনিই তত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং সু চতুর বা চালাক বলিয়া সমাজে পূজ্য। বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে হইলে অনেকেই তাহাকে সমাজের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লয়। পূর্ব্বোক্ত রূপে দুষ্কর্ম্ম সকল যাহারা করিতে পারে না,—যাহারা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু—পরের কোনরূপ অনিষ্টে যায় না—তুবড়ীর মত যাহাদের নানারূপ বোল চাল বাহির হয় না,—নিজের যশঃ-ঢক্কা নিজে বাজাইতে যাহারা লজ্জিত হয়,—যাহারা সর্ব্বতোভাবেই অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির ভাল লোক, তাহাদের নাম, হয় 'বোকা' 'গাধা' বা এমনই একটা কিছু। পাঠক, ইহাতে সমাজের জন-সাধারণের মতি গতি সহজে কোন্ দিকে যাইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। এই যুগের ফ্যাশনে যেমন সাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা পোষা বাঁদরীর আদর বেশী—দুগ্ধ অপেক্ষা সুরার

আদর অধিক, এবং আসল অপেক্ষা নকলের চাকচিক্য বেশী, তেমন শিষ্ট শান্ত সৎলোক অপেক্ষা চতুর নামধারী ধূর্ত্ত দুর্জ্জনের সম্মান অধিক।

অকৃতজ্ঞতাকেও এ যুগের ফ্যাশন বলিলে অন্যায় হয় না। কারণ এই যুগে ইহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তুমি হয়ত যাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া দিয়াছ, সে হয়ত আজ তোমারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে—কিংবা তোমার প্রতি মৌখিক সম্মান দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে! যাহার সর্ব্বস্ব ঋণের দায়ে নীলাম হইয়া যাইতেছিল—দাঁড়াইবে কোথায় তাহার ঠাঁই ছিল না, তুমি স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া তাহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছ—আজ সে তোমারই সম্পত্তির অর্থ অপহরণ করিতেছে। যাহাকে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেবা শুশ্রূষার দ্বারা যম-রাজার ঘর হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ, আজ তোমার কঠিন পীড়ার সময় সে একবার তোমায় চক্ষের দেখাও দেখিতে আইসে না। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছ, যাহার মঙ্গলের জন্য বহু স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছ, সে আজ বিশ্বাসঘাতক হইয়া তোমারই প্রাণ কিংবা মান নাশের চেষ্টা করিতেছে। সংসারে এইরূপ দৃশ্যের অভাব নাই। এই শ্রেণীর অকৃতজ্ঞ লোকেরা দয়াশীল ও পরোপকারী ব্যক্তির চিত্ত বিকৃত করিয়া ফেলে। তাহাদের ঐ সকল

অকৃতজ্ঞ ব্যবহার স্মরণ করিয়া অনেক দয়াশীল ব্যক্তি প্রকৃত দয়ার পাত্রদিগেরও কোনরূপ উপকার করিতে কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হন। এখন দেখুন এই শ্রেণীর নরাধম অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা এক দিকে পরোপকারী ব্যক্তির পরোপকার বৃত্তির অনুশীলন করিবার পথে কাঁটা দেয়—অন্য দিকে প্রকৃত দয়ার পাত্র দীন দুঃখীদের উপকার পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে। যাহা হউক, এই সকল কথা মনে করিয়া পরোপকার রত ব্যক্তি যেন তাঁহার পরোপকার ব্রত বন্ধ না করেন। এ অংশ বঙ্গের সেই বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র আদর্শস্থানীয়। কেহ যদি তাঁহার কাছে বলিত "বিদ্যাসাগর মহাশয়! অমুক ব্যক্তি আপনার বড়ই নিন্দা কুৎসা করিতেছে।" তিনি ঠোঁটখানি কাঁপাইয়া সহাস্য মুখে বলিতেন "কেন, আমার প্রতি তার এত অনুগ্রহ কেন? আমি কখন তাহার কোনরূপ উপকার করিয়াছি বলিয়া ত মনে হইতেছে না, তবে সে কেন আমায় গালি দেয়?" তিনি যদিও এই যুগের মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার অজস্র পরিচয় পাইয়া চিত্তে মানুষের সম্পর্কে এইরূপ সংস্কার পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি পরের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার করুণ হৃদয় গলিয়া যাইত। এবং সেই দুঃখ মোচনার্থ দয়ার হস্ত আপনি প্রসারিত হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ প্রতিদানের প্রত্যাশায় কখন দান করিতে নাই, উপকারের প্রতিদানে অপকার পাইলেও ব্যথিত বা বিস্মিত হইতে নাই। কারণ, কর্ত্তব্য বোধে দয়াবৃত্তির

সার্থকতা সম্পাদনার্থই পরোপকার অনুষ্ঠান তাহাতে বাহিরের কোন ফলাফলের উপর নির্ভর না করিলেই ভাল। তুমি মন্দ বলিয়া আমি ভাল হইব না, তাহার কোন কারণ নাই।

অনধিকার চর্চ্চা এ যুগের আর একটি ফ্যাশন। যাহারা হয়ত পিতামাতার তাড়নায় পাঠশালায় পণ্ডিতকৃত কর্ণমর্দ্দন ফলে বাল্যকালে একবারমাত্র সরস্বতীব সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তৎপরে কেবল নাম স্বাক্ষর ব্যতিরেকে আর কোন অবস্থায়ই উক্ত দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে না তিনিও রাজা জমিদার বা ধনী বলিয়াই সাহিত্যের একটা প্রবীণ সমালোচনা বা সমজদার! এমন অনেকে আছেন যাঁহারা হয়ত বিদ্যা বুদ্ধি বলে আজ বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতি-কিম্বা অতি উচ্চ শ্রেণীর ডাক্তার বা উকীল কিম্বা কবি অথবা লেখক বা রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে একবারে নিরেট মূর্খ, তাঁহারাও আপন আপন ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ পাণ্ডিত্যের বলে সঙ্গীত বিষয়ে নির্লজ্জ ও নির্ব্বোধের ন্যায় ভাল মন্দের বিচার পূর্ব্বক মতামত প্রকাশ করেন এবং অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কাহাকেও 'মাষ্টার' কাহাকেও বা "প্রফেসর অব্ ইণ্ডিয়ান মিউজিক" কাহাকেও বা ওস্তাদজী বলিয়া সমাজে চালাইয়া দেন। ইহার ফল এই হয় যে, উচ্চ সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ জন-সাধারণও এতাদৃশ জ্ঞানবান্ ক্ষমতাবান্ বুদ্ধিমান্ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগের সার্টিফিকেট দেখিয়া রাংতাকে সোণা ভাবিয়া

ঐ অকিঞ্চিৎকর সঙ্গীতকেই অতি উচ্চ অঙ্গরে সঙ্গীত মনে করিয়া উহারই অনুকরণ করিতে শিখিতে থাকে। উচ্চ সঙ্গীতের যিনি চর্চ্চা না করিয়াছেন, তিনি রায়চাঁদ প্রেম চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তই হউন আর বেদান্তবাগীশই হউন অথবা অন্য যে কোন বিভাগেই প্রধান্য লাভ করিয়া থাকুন না কেন তাঁহার পক্ষে সঙ্গীতবিষয়ে কাহাকেও সার্টিফিকেট দিয়া জনসাধারণের নিকট তাঁহাকে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা-পূর্ব্বক তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের অর্থ অপব্যয় করাইবার পথ পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া নিতান্তই অদূরদর্শিতা ও নির্ল্লজ্জতার পরিচায়ক নহে কি? আহেল-বিলাতী সাহেবেরা আমাদের সঙ্গীত যেমন বোঝেন, ইহারাও প্রায় তদ্রূপই বুঝেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ঈদৃশ সমঝ্‌দার-সাহেবের নিকট হইতে উচ্চ ভারতীয় সঙ্গীত কিংম্বা বঙ্গ সাহিত্যের সার্টিফিকেট লওয়া নিতান্তই সহজ, কিন্তু তাহার যে মূল্য কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। এই সকল অসঙ্গীতজ্ঞ খেলো ওস্তাদেরা সর্ব্বদাই চেষ্টায় থাকে যে যাহাতে তাহারা সঙ্গীত বিষয়ে একেবারে 'নিরেট' অথচ বিদ্যাবুদ্ধিবলে সমাজের কোন এক বিভাগের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগকে সঙ্গীত শুনাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সার্টিফিকেট আদায় করিতে পারে। কারণ, এখানে একদিকে প্রশংসাপত্র পাওয়াও যেমন সহজ, হুজুগ-প্রিয় অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট এই সকল লোকদিগের প্রদত্ত সঙ্গীত বিষয়ক প্রশংসাপত্রের মাহাত্ম্যও তেমনই প্রবল। আজ কাল এই সকল কারণে বঙ্গ আমর

জননী আমার” বা এই শ্রেণীর কএকটা স্বদেশী গান বা সুকবি রচিত পদলালিত্যময় দুই চারিটা গান মেয়েলি সুরে গাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের নেতাদের দুই এক খানি অনুরোধ পত্র লইয়া অনেকে দেশের জন-সাধারণের নিকট হইতে যে অর্থ লুণ্ঠন করিতেছেন একজন প্রথম শ্রেণীর উচ্চ-সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়াও তাহার সিকিভাগ অর্থ বা সম্মান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন কিনা সন্দেহ। উল্লিখিতরূপ সার্টি-ফিকেট-প্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞেরা যদি পশ্চিমের অতি উচ্চ শ্রেণীর কোনও ওস্তাদের নিকট নিজেদের বিদ্যা প্রকাশ করিয়া প্রশংসা পত্র আনিতে যাইতেন তাহা হইলে দয়া করিয়া কাণ মলিয়া কাণ লাল না করিয়া দিলেও সেই ওস্তাদ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, লজ্জা ও আত্মসম্মান বোধ থাকিলে, আপনি কাণ লাল হইয়া উঠিত। আজ কাল সর্ব্বত্রই শিক্ষিত সমাজে উচ্চ সঙ্গীত চর্চ্চা বলিয়া উচ্চ রব পড়িয়া-গিয়াছে, এতদুদ্দেশ্যে অনেকস্থানে অনেক অনুষ্ঠান ও হইতেছে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ‘বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া’। অধিকাংশ স্থলে সঙ্গীতানুশীলনের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে সহরের স্থানীয় গাড়োয়ান বা রাস্তার ছেলেরা বিনা বেতনে, বিনা অনুরোধে, শ্রোতার ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক কর্ণে যে সঙ্গীত-ধারা ঢালিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা আমাদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত অনুশীলন স্থলে যে খুব বেশী উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের আলোচনা হয় তাহা আমার বোধ হয় না। সঙ্গীত বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ অথবা কিঞ্চিৎ হারমোণিয়মজ্ঞ শিক্ষিত

নেতাদের নিকটে এই শ্রেণীর সঙ্গীত খুব বাহবা পাইতে পারে! কিন্তু তাই বলিয়া উহা প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীত নহে। পরিচয় দিতে হইলেই লোকে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করে। যাঁহারা বাজারে এখন ওস্তাদজী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের অধিকাংশই কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে কোন উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকের নাম করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই ভূঁইফোঁড় ওস্তাদ। রীতিমত তালিম লইয়া ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করিবার উপযোগী অনুকূল বৈষয়িক বা মানসিক অবস্থা তাঁহাদিগের অনেকেরই নাই। তাঁহাদের কাণে শোনা বিদ্যা—কিছু মুখে, কিছু পেটে, কিছু ট্যাঁকে, কিছু কোঁচায় কিছু কাছায় থাকে; নিজের মতলব-মত যোড়াতাপি দিয়া লয়ের সঙ্গে কোনরূপে মিলাইয়া একটা আজগুবি চীজ খাড়া করাই তাহাদিগের নিত্য অভ্যস্ত কর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেক গায়কেরই গল-নিঃসৃত তান এমন বস্তু যে, পাঠক যদি যে কোন একটা সুর গলা দিয়া বাহির করিতে করিতে একজনকে দিয়া নিজের মাথা ঐ সময় একটুকু নাড়াইয়া লইতে পারেন তাহা হইলেই তাদৃশ তান বাহির হইবে। তাঁহারা চোখে দেখিয়া কিছু করিতে শিক্ষা করেন নাই, অনুমান ও স্বাভাবিক সংস্কারের উপরই তাঁহাদিগের শিক্ষা। ঈদৃশ গায়ক গলায় বা যন্ত্রে তান দিল বটে কিন্তু কি কি পরদা যে লাগিল তাহা সে জানে না। ফলে এক তান দুইবার ঠিক এক ভাবে দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। পাঠক! হয় ত ইহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে,

বিকৃত সুরেও একবার কিছু কাল চেঁচাইয়া কিছুক্ষণ পরে আবার তাহাই অনুকরণ করা সাধনা-সাপেক্ষ। অন্যথা, ঠিক একটির মত আর একটি কিছুতেই হইবে না। কিছু ব্যতিক্রম থাকিয়াই যাইবে। আর একটি বাহার এই যে, এই সকল ওস্তাদেরা বড় বড় গৎ বাজান বা গান গাহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ 'সা রে গা মা' নানারূপ প্রণালীতে গাহিতে বা বাজাইতে বলিলেই ইঁহাদের চক্ষু স্থির। তাহার কারণ এই যে, ইহারা চিরকালই ওস্তাদ হইয়া আছেন—জীবনে কখনও সাকরেদ হন নাই। ইঁহাদের সঙ্গীতের প্রধান শোভা লাটিমের ন্যায় বর্ত্তুলাকারে মস্তক চালনা বা হস্ত পদ সঞ্চালন ও মুখের নানারূপ বিকট ভঙ্গী ইত্যাদি মুদ্রাদোষ। অধিকাংশেরই স্বর রাসভ-বিনিন্দিত—এবং তাঁহারাই না কি আবার ধ্রুপদ গাহিবার উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া সম্মান পাইয়া থাকেন। যন্ত্রী অথবা গায়ক মুখে 'লয়' 'লয়' বলিয়া বড়ই বাগাড়ম্বর করেন, কিন্তু বাজাইতে বসিলে যখন কোন উচ্চ শ্রেণীর তবলা-বাদক নানারূপ বোল-পরণ বাজাইতে থাকেন, তখন তাঁহারা ফাঁপড়ে পড়িয়া তালকাটা হইয়া যন্ত্রে কেবল 'ডা-ডু-ডু' 'ডা-ডু-ডু' ধ্বনি বা গলায় 'আঁ' 'আঁ' করিতে থাকেন এবং এক দৃষ্টিতে তবলা-বাদকের দিকে চাহিয়া থাকেন—কোন্ সময়ে বোলে ফাঁকের মুখ আসে এবং ফাঁকের মুখ আসিলেই নিজের গদের মুখ বা গানের মুখ ধরিয়া সমের ঘরে মিলাইয়া দেন। পক্ষান্তরে, তবলচিও বেগতিক দেখিলে এই সনাতন প্রথা অবলম্বন করেন। সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ বুঝিয়া

না বুঝিয়া তালে বেতালে একে অন্যের দেখাদেখি বাহবা দেয়। আজ কাল আবার কতকগুলি বখাটে ছেলেদের কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে আমদানী হইয়া থাকে। ইহাদের আগমনের পরেই ইহারা স্থানীয় কতকগুলি উঠন্ত বয়সের ধনী ঘরের "সোণার চাল-কুমড়ো" বা কোন সখের রমণী রঞ্জন বা বিরাজ মোহনের স্কন্ধে আপতিত হয়; এবং তথায় দুই চারিটা গান গাইয়া খুব ওস্তাদি প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল কামধেনু-দের নিকট হইতে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও দোহন করিয়া থাকে। ইহারা নিজেই Professor of music বা master of music নাম ধারণ করে। গাড়োয়ান বা মেথরদের মত ইহাদের চুলের কাট, টেড়ীর বাহার কাপড় জামা ও জুতার ঠাটও যথেষ্ট থাকে। কেহ বা সোণার গিল্টী করা চশমা পরেন, মুখে সাবান মাখিয়া ঘষিয়া মাজিয়া রূপ বাড়ান,কেহবা পাউডারের শ্রাদ্ধ করেন অর্থাৎ কিসে চেহারাটা জমকাল ও মানান-সই হইবে তদ্বিষয়ে ইহাদের সকলেই বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন।

ইহাদের মুখে সর্ব্বদা বার হাত "কাঁকুড়ের তের হাত বিচি" র ন্যায় গল্প লাগিয়াই আছে; আকাশ ফাটা কথা শুনিয়া জন-সাধারণ অবাক হইয়া যায়। প্রশংসার ছলে অনন্তপ্রকারের ঠাট্টা করিলেও ইহাদের মস্তিষ্কে তাহা সহজে প্রবেশ পথ পায় না—মনে করিয়া লয় যে সেগুলি যথার্থই স্তুতিবাক্য। লোকে তাহাদিগকে লইয়া কত ভাবে কত ছলে কৌতুক ও আমোদ করে, কিন্তু

তাহারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং সেই সকল ঠাট্টাই প্রকৃত জ্ঞান করিয়া তাহাদের দাম্ভিকতা-বৃদ্ধির সহায়তা করে ও উত্তরোত্তর সমাজের চক্ষে আরও কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। যাহার বাড়ীতে হারমোণিয়ম আছে তানপুরা নাই তথায় যাইয়া ইঁহারা বলেন যে তানপূরা ছাড়া কি গান হয়? আবার যেখানে তানপূরা আছে সেখানে বলেন "যাক্ হারমোণিয়ম দিয়াই আজ গাই।" এগুলি সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন অকাল-কুষ্মাণ্ড, তেমন দাম্ভিকতারও প্রতিমূর্ত্তি। ইঁহারা অর্থ কোথাও পান না,—কেবলমাত্র জলখাবার খাইয়াই ওস্তাদি করিয়া ফিরেন। ইহাদের বোল চাল শুনিয়া সকলেই ভাবে বুঝিবা ইনি তানসেনেরই সুলভ সংস্করণ। আমাদের সমাজের কতকগুলি শিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ আবার এই শ্রেণীর 'বখাটে' ও বোল-চাল-সর্ব্বস্ব যুবকদিগের উপর নিজ পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই সকল ভূঁইফোড় ওস্তাদবাবুরা যেমনই উচ্চ সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ তেমনই চরিত্রাংশে খোঁজ নিলে, সর্ব্বতোভাবে ভদ্র পরিবারে মিশিবার অযোগ্য। সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ শিক্ষিত সমাজের বহু লোককে বোল চাল দ্বারা বোকা বানাইয়া এই সকল স্বকৃত Professor of music বা বাবু ওস্তাদেরা তথায় প্রবেশ-পথ পায় ইহা নিতান্তই ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। লোকে কথায় বলে মূর্খ বলার সমান গালি নাই। আমাদের দেশে যদি উচ্চ সঙ্গতের চর্চ্চা রীতিমত থাকিত তাহা হইলে এরূপ যে সে আসিয়া

ওস্তাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। বৃক্ষ-শূন্য দেশে এড়ণ্ডই বড় বৃক্ষ হইয়া পড়ে। যদি শিক্ষিত সমাজের নেতৃগণ বস্তুতঃই দেশে উচ্চ সঙ্গীতের চর্চ্চা প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া থকেন তাহা হইলে নিজের পাণ্ডিত্যের উপর নির্ব্বোধের ন্যায় নির্ভর না করিয়া যাঁহারা প্রকৃত সঙ্গীত বোঝেন এমন লোক দ্বারা এই সকল ব্যাপার প্রচলিত করুন। বিদেশ হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর দুই চারিটি নানা রূপ বাদ্য যন্ত্র ও গানের ওস্তাদ লইয়া আসুন এবং তাঁহাদের দ্বারা রীতিমত দেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন। কালে আমাদের দেশের লোকদ্বারাই উচ্চ সঙ্গীতের অনুশীলন ও শিক্ষা দেওয়ার কর্ম্ম চলিতে পারিবে। তখন আর তত বিদেশী বড় ওস্তাদ রাখিবার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে না। তাহা না হইলে, এখন তাঁহারা সঙ্গীত বিষয়ে যেরূপ কু বা অশিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে ইহার পরে উচ্চ সঙ্গীত শিখিবার সুবিধা হইলেও খারাপ শিক্ষা ভুলিতে এবং সেই পুরাতন কুশিক্ষার ঢং বদলাইতেই একযুগ পার হইয়া যাইবে। নূতন শিক্ষা করা অপেক্ষা পুরাতন ভুল শিক্ষা ও খারাপ ঢং সংশোধন করা অধিকতর কঠিন।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"It is more difficult to unlearn than to learn" অনেকে হয়ত অবগত আছেন যে, বিলাতী কোন কোন Band-master দের নিকট কেহ কোন যন্ত্র শিখিতে গেলে; তাঁহারা অতি সরল ও ভদ্র ভাবে জানিয়া লন যে, তিনি পূর্ব্বে ঐ যন্ত্র বাজাইয়াছেন কি না? যদি

জানিতে পারেন যে, তিনি পূর্ব্বে কিছু শিখিয়াছেন ও একআধটুকু বাজাইতে পারেন, তাহা হইলে, তাহাকে নিয়মের অতিরিক্ত চার্জ করা হয়; পক্ষান্তরে যে কিছুই শিখে নাই তাহাকে নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। এই অদ্ভুত আইনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে Band master রা বলেন যে, যাহারা কিছু শিখিয়াছে তাহাদের কুঅভ্যাস দূর করাইতে তাহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইবে। পক্ষান্তরে যে কিছু শিখে নাই সে বদশিক্ষার হাত হইতে এখনও মুক্ত আছে। কাজে কাজেই তাহাকে শিখান সহজ হইবে। গানের পরিবর্ত্তে কণ্ঠ কুর্দ্দন ও তালের অথবা লয়ের বদলে "তামাক কাটা" অথবা "ছাদ পিটান" শিক্ষা কাহারও অভীপ্সিত নহে। আমাদের দেশের সঙ্গীতের ঢং পশ্চিমের সঙ্গীতের তুলনায় অত্যন্ত বিশ্রী। শিক্ষিত সমাজ হয়ত আমার এই ঢং কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন না, তাই আমি ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমাদের দেশে ওস্তাদেরা যাহা গায় বা বাজায় তাহাতে কি রাগ-রাগিণী হয় না? এবং যদি হয় তবে আপনি তাহার এত নিন্দা করেন কেন? তদুত্তরে আমি বলি চাউল এবং ডাইলের দোকানে ঐ যে একটি খোট্টানী স্ত্রীলোক গলায় সোণার মোটা হাঁসলি পরিয়া রহিয়াছে, দরে এক হইলেও হ্যামিণ্টনের বাড়ীর একটি সোণার নেকলেছ উহা অপেক্ষা শত গুণে আপনারা পছন্দ করেন কেন? দুইটাই স্বর্ণ নির্ম্মিত—দুয়েরই মূল্য এক, তবে

কেন আপনি ঐ সাহেব বাড়ীর হারটি এত পছন্দ করিতেছেন? এবং অন্যটির পানে তাকাইয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া মুখ ফিরাইতেছেন? তখন আপনাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, সাহেব বাড়ীর হারটির ঢং ও কায়দা অতি সুন্দর,—মার্জ্জিত রুচির মনোমুগ্ধকর। আর অন্যটি সোণা হইলেও নিতান্ত অসভ্য জনোচিত রুচির পরিচায়ক। এই সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। রাগ রাগিণী থকিলে কি হইবে? ইহাদের ঢং নিতান্ত বিশ্রী পক্ষান্তরে পশ্চিমের ঢং অতি সুন্দর ও চিত্তহারী। ভারতীয় সঙ্গীতের আলাপই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গের জিনিষ। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদী-শূন্য ওস্তাদজীরা যে দুই চারিটি রাগিণীর গান জানেন সেই সকল গানই পদ বা ভাষা বর্জ্জিত করিয়া "তোম্ তা না না না" করিয়া একটুকু লম্বা করিয়া টানিয়া গাইয়াই অজ্ঞ জন-সাধারণকে ঐ সকল রাগিণীর আলাপ শুনাইয়া খুসী করিয়া থাকেন। ফলে, সঙ্গীতজ্ঞের নিকট ইহা আলাপ না হইয়া প্রলাপ হয়! অনেকে আবার তানপূরা লইয়া উদারা বা খাদের গ্রামের পরদা গলায় আনিতে যাইয়া, শব্দ বর্জ্জিত হইয়া, 'শুধু মুখ-ব্যাদানের ভঙ্গি সহকারে উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গলার কাজ ইশারায় সারিয়া দেয়! তানপূরার 'ম্যাও' 'ম্যাও' বা 'ঘন্' 'ঘন্' শব্দে কিছুই শুনা যায় না। মুখভঙ্গী দেখিয়াই শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়ের সহিত মনে করিয়া লন যে, ওস্তাদজী কতদূরই উদারা গ্রামে বা খাদের সুরে নামিয়াছেন। খুব

চড়া তারা গ্রামের পরদাও তাঁহাদের গলায় আসে না। গলা চাপা রক্তবর্ণ মুখশ্রী সহকারে বিকৃত-স্বরের চেঁচানি মাত্র বহির্গত হয়। কণ্ঠে অধিকাংশেরই এরূপ কফ বা শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে যে, হিমালয়ের অতি উচ্চ শৃঙ্গের তুষার রাশির ন্যায় তাহা গলিয়া যে এ জীবনে বাহির হইবে এমন আশা হয় না। উপযুক্তরূপে স্বর-সাধনা না করাতেই এই রূপ স্বর হইয়া থাকে! অথচ ইহাদের অধিকাংশেরই এমন মস্তিষ্ক আছে যে, ভাল লোকের নিকট রীতিমত শিক্ষা করিলে ইহারা সকলেই ন্যূনাধিকরূপে খুব বড় শ্রেণীর ওস্তাদ হইতে পারিতেন। কিন্তু জন্মাবধি ওস্তাদি করিয়া এখন কাহারও সাকরেদ হওয়া ইহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব এবং গলা বা হাত যে বিশ্রী ঢঙে একবার বসিয়া গিয়াছে পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে তাহার সংশোধনও প্রায় অসম্ভব। মূর্খের সমাজেই মূর্খের আদর ও কদর। যেখানে যেমন শ্রেণীর ভোক্তা, ভোজ্যও সেখানে তেমনই। আজ কাল পোনর আনা স্থলেই সঙ্গীত চর্চ্চার নাম হারমোণিয়মে কনসার্টের দুই একটা 'ভেঁ পু গৎ' বা থিয়েটারের দুই একটা ছেলে ভুলান গান। এইরূপ সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞের যথোচিত আদর ও উৎসাহদান নাই বলিয়াই দেশে প্রকৃত গুণী লোকের অভাব হইতেছে। যেখানে 'সকল ধানই বাইশ পশুরি' সেখানে ত প্রকৃত গুণী লোক ফুটিবার সম্ভাবনা অতি কম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞ ওস্তাদেরা দেশে অতি অপকৃষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত দ্বারা দেশস্থ

সকলের মনে সঙ্গীত বিষয়ক অতি নিকৃষ্ট রুচির বিকাশ ও পরিপুষ্টি ঘটাইতেছেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে, সমাজের লোকেরা প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া প্রকৃত গুণীর গুণ গ্রহণে অক্ষম হইতেছেন সুতরাং প্রকৃত গুণীকে উৎসাহ ও সাহায্যদানেও বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। ইহাতে প্রকৃত উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি দেশে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং অজ্ঞতাও নিকৃষ্ট রুচিই ভবিষ্যতের জন্যও আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিবার সুবিধা পাইতেছে। বাড়ীর ভাত খাইয়া,—বিদেশে কোন ভাল লোকের নিকট যাইয়া শিখিবার ব্যয় ভার বহন না করিয়া, বিনা কষ্টে বাড়ীর আর দশ কাজ করিয়া, গলায় একটা 'তানা না না' বা যন্ত্রে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ক্রন্দন-ধ্বনির ন্যায় "ফোঁ ফোঁ রব বা "ডা-ডু-ডু ডা ডু-ডু" বাহির করিয়া, সহরের নানাস্থানে ঘুরিয়া ওস্তাদি করিয়া ইহারাত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেনই, তৎসঙ্গে জন-সাধারণের নিকৃষ্ট রুচি জন্মাইয়া দিয়া ভবিষ্যতেও যেন এই শ্রেণীর জীবিকা নির্ব্বাহের পথ উন্মুক্ত থাকে তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশে এত বেশী আলোচনা হইতেছে বলিয়াই এ সম্বন্ধে এত কথা কহিলাম। বিশেষতঃ একটি গুরুতর আশঙ্কার বিষয় এই যে, এইরূপ কুশিক্ষার ফল যখন ক্রমে ক্রমে অনেক দিন পরে ভালকে ভাল না বুঝাইয়া মন্দকে ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তখন অবস্থা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া, রোগ

প্রায় অচিকিৎস্য হইয়া উঠে। কারণ, তখন আর কোন শ্রেণীর যুক্তি তর্কই প্রাণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং সংশোধনের আশাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ভুল হউক কিন্তু তাহা ভুল বলিয়া বুঝিবার শক্তি একেবারে লোপ পাইবার পূর্ব্বেই যাহাতে সমাজে সংশোধনের ক্রিয়া আরম্ভ হয় তদর্থে সমাজকে উদ্বোধিত করাও আমার এতগুলি কথা বলিবার অন্যতর কারণ। ভুলকে ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহার সংশোধনের জন্য ইচ্ছুক হওয়া স্বাভাবিক—আর যাহা করিতেছি, ভালই করিতেছি এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে আর সংশোধনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই সকল ওস্তাদের মাধুর্য্য ও লালিত্য-বিহীন কর্ক্কশ ও বিকৃত সুরের গান অথবা বাদ্য শুনিয়া অনেকের মনে ধারণা এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ওস্তাদি সঙ্গীত মাত্রই নিতান্ত শ্রুতি-কঠোর ও কর্ক্কশ। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত অন্য লোকদিগের মুখে শুনিয়াই ঐ সকল গানে ওস্তাদি আছে বলিয়া তাঁহারাও অগত্যা স্বীকার করেন; কিন্তু একটু লজ্জিত ও ভীত ভাবে বলেন যে, ঐ সকল ওস্তাদি গান তাঁহাদের নিকট একটুকুও মধুর বলিয়া বোধ হয় না। পাঠক ইহার কারণ কি বুঝিলেন? বিকৃত সুর অর্থাৎ ঠিক পরদা হাতে অথবা গলায় সুমিষ্ট ঢং মত না তুলিতে পারাই এই শ্রুতি-কঠোরতার মূল কারণ। নতুবা প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের ওস্তাদি কেহ বুঝুক আর না বুঝুক,

কাণে মিষ্ট লাগিবেই লাগিবে। যিনি বুঝেন তাহার আরও বেশী ভাল লাগিবে এই মাত্র পার্থক্য। এই কারণেই তানসেনের কণ্ঠে স্বর-সংযোগ সহকারে 'আজান ধ্বনি' বা ঈশ্বর আরাধনার শুষ্ক আহ্বানটি শুনিবা মাত্র উহার ভাবার্থ বোধ ব্যতিরেকেও সমগ্র দিল্লী নগরী আকুল ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। ইহা সুরের প্রাণস্পর্শিণী মাধুরীর স্বাভাবিক মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যে সঙ্গীত মধুরতম মধুরতার মধ্য দিয়া প্রাণের অব্যক্ত গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়া প্রাণে অনন্তত্বের আভা না ফলাইতে পারিল,—অনন্তের সহিত প্রাণের একত্ব বোধ না জন্মাইতে সমর্থ হইল,—সে ব্যর্থ সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া লাভ কি? নিম্ন-শ্রেণীর সঙ্গীতচর্চ্চার আর এক ভয়ঙ্কর দোষ এই যে, ইহাতে নৈতিক চরিত্রের অধোগতি সাধন করে। তর্কদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে বুঝা যায় যে সাধারণ 'খেলো' সঙ্গীতের চর্চ্চা, পরিণামে ক্রমে মার্জ্জিত এবং উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ জ্ঞানের পথ অবরোধ করিতে থাকে। এই হেতুই অনেকের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, সঙ্গীতের অনুশীলন করিলেই লোকের নৈতিক চরিত্র খারাপ হয়। প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর পদার্থের অনুশীলনে কখনও মানুষের অধোগতি হয় না—পক্ষান্তরে উহার অনুশীলনে নিকৃষ্ট রুচির উপর ঘৃণা জন্মায় ও মনুষ্য চরিত্রে দেবত্বের আভা ফলাইয়া দেয়। বস্তুতঃই উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ শ্রেণীর সুখের আস্বাদই অধোগতির বা অধঃপাতে

যাইবার পথে, একমাত্র প্রতিষেধক ঔষধ। সুখ-ভোগ-লালসা জীবমাত্রেরই অপরিহার্য্য বৃত্তি। তুমি যতই কেন সুনীতির বক্তৃতা বা অন্য দশ প্রকারের বাধা দেও না, বা চীৎকার করিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ কর না, যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে উচ্চ চিন্তা ও উচ্চশ্রেণীর সুখভোগের অধিকারী করিতে না পারিবে—যাবৎ না তাদৃশ অধিকার লাভ করিয়া নীচ শ্রেণীর ভোগ সুখের উপর আমার স্বভাবতঃ ঘৃণা বা ঔদাস্য আসিবে, তাবৎ মুখে যাহাই বলি, মন আমার ঐ নীচশ্রেণীর সুখ ভোগের জন্যই সময়ে সময়ে লালায়িত হইবে। মন্দ যে আমি ছাড়িব—ভালর মহিমা ও গৌরব তো আমার বুঝা চাই। নতুবা মন্দের মন্দত্ব আমি স্বীকার করিব কেন? আর তাহাতে যখন আমার ভোগ সুখ অনুভব হয় তাহা ছাড়িবই বা কেন?

উচ্চ সঙ্গীতের অনুশীলন থাকিলে "লেও সখি দেও ভর পিয়ালা" বা 'বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দিব না" শুনিয়া মাথা ঘূরিয়া যায় না—পিশাচীকে সৌন্দর্য্যের রাণী বলিয়া ভ্রম হয় না। প্রকৃত সৎ জিনিষ হইতে কখন অসতের উৎপত্তি হয় না এইতত্ত্ব বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত সুতরাং ধ্রুব সত্য। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, উচ্চসঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে হইলে উচ্চ শ্রেণীর ওস্তাদের প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত সঙ্গীত চর্চ্চা একপদও অগ্রসর হয় না। প্রকৃত ওস্তাদের ব্যয় ভার একের পক্ষে কঠিন হইলেও দশের পক্ষে কঠিন নয়। "ভাল জিনিষের অল্পও ভাল।"

"এটিকেট" শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা ফ্যাশনেরই আর একটি নাম। আজকালের ফ্যাশন এই যে, প্রাণে কিছু থাকুক আর না থাকুক বুদ্ধি যদি এমন কথা বলে যে ইহা বাহিরে দেখাইলে ফল ভাল হয় তখনই তাহা কপটতার আবরণে হাসিমুখে দেখাইতে হইবে। প্রাণ দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে অথচ এটিকেটের খাতিরে আমাকে হাসিতে হইতেছে, প্রাণে আমার কোন দুঃখ নাই তথাপি চক্ষুলজ্জার অনুরোধে বাহিরে কাঁদিবার ভাণ করিতেছি। আজকাল সভ্যতার দ্বিতীয় নাম কপটতা। বুকে ছুরী দিতে হয় দাও, কিন্তু মুখে মধুর হাসিটি হাসিয়া লইয়া উহা কর। বিষ খাওয়াইতে হইবে—'প্রিয়তম' বলিয়া মধুর স্বরে ডাকিয়া বিষের বাটী মুখের নিকট ধর! ইহারই নাম সভ্যতা! মনে যাহা থাকুক না কেন অষ্টপ্রহর সভ্যতার মুখোস পরিয়া থাক, এটিকেট রক্ষার্থ প্রাণপণ কর, কোন দোষ হইবে না। কারণ ইহাই সভ্যতা— ইহাই হইল ফ্যাশন।

আজ কাল ফ্যাশন না আছে এমন দিক্ নাই। অধুনা অনেকে নিজেদের নাম ও বংশ-বাচক উপাধিগুলির অতি বিচিত্র ভাবে বর্ণবিন্যাস করেন। এখন অনেক স্থলেই 'চৌধুরী' 'কাউড্রি' বা চাউড্রি, রায় 'রে' বা 'রয়', বন্দোপাধ্যায় 'বানার্জি' সেন 'সেইন' বসু 'বউস' দত্ত 'ডাট্' মিত্র 'মিটার' ঠাকুর 'টেগোর' সিংহ 'সিনহা' দাস 'ডস্' ইত্যাদি নানা ভঙ্গিক্রমে উঙ্গারিত হয়। বসু অথবা নাগের

পত্নী 'মিসেস বোসা' বা 'মিসেস নাগা' বলিয়া অনেক সময় অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন নামের ফ্যাশন, তেমনই আবার আজ কাল চুল কাটিবার, দাড়ি রাখিবারও নানা ফ্যাশন বাহির হইয়াছে। ঘাড়ের দিকে চুল এত ছোট করা হয় যে, চর্ম্ম দেখা যায় সম্মুখের চুল বড় থাকে, এবং সেই সম্মুখের চুলে কোথাও বা ভেড়ার এলবার্ট ফ্যাশন হয়, কোথাও বা কপাল শিঙের ন্যায় পর্য্যন্ত চুল পরিপাটী করিয়া একটু ঢেউ উঠাইয়া দেওয়া হয়। আবার কেশগুচ্ছ কোথাও বা সিঁথি-বিহীন হইয়া সম্মুখে একটি কদম্ব ফুলের স্তবকের ন্যায় হইয়া থাকে ইহা সাধারণতঃ carless কায়দা নামে খ্যাত। কখন বা সিঁথিটি উচ্ছ্রিত তোরণ-দ্বারের গর্ভস্থ পথের মত আলবার্টের ভিতর দিয়া চাহিয়া রহে। কেহ বা কাণের উপরের অংশের চুল ক্ষুর দ্বারা সোজ সুজি ভাবে নীচে পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেন। দাড়ি গোঁফ একবারে ফেলিরা দেওয়াই এখনকার অধিকাংশের ফ্যাশন কেহ কেহ বা দাড়ি ফ্রেঞ্চকাট্ করিয়া রাখেন অর্থাৎ গণ্ড দেশের দুইদিকেই একবারে চাম ছাটা করিয়া কেবল নিম্ন ওষ্ঠের নীচে একটু গুচ্ছাকৃতি ও অগ্রভাগ সরু করিয়া রাখেন। ফ্যাশন করিয়া অনেকে চশমা চোখে দেন। আবার কেহ কেহ যদি ছত্রে ছত্রে মিল দিয়া দুই একটি কবিতা লিখিতে পারেন তাহা হইলে "রবীন্দ্রিয় কেশ-দামের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া থাকেন—লম্বা চুল রাখিয়া তৈল বা মোম

ইত্যাদি লাগাইয়া কৃষ্ণমসৃণ লম্বিত কোকড়ান কেশ-গুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান করেন। কাহারও কাণ চুলকাইবার আন্দাজ সরু একটি ছড়ি হাতে থাকে। অনেকে আবার এমন কার্ত্তিকটির ন্যায় সাজ সজ্জা করেন যে, তিনি যে ময়ূরের উপর সমাসীন নহেন এজন্যই দর্শকের মমে দুঃখ হয়!

আজ কাল চাকুরী বা নোকরী করাও একটা ফ্যাশন হইয়াছে। কারণ, যখন দেখিতে পাই যাহাদের ব্যবসা বানিজ্য বা কৃষিকর্ম্ম করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা আছে তাহারাও চাকুরী বা নোকরী খোঁজে; তখন ইহাকে ফ্যাশন ছাড়া আর কি বলিব? ভূমিষ্ঠ হইয়া চাকুরীর উদ্দেশ্যেই সমস্ত লেখাপড়া ও শিক্ষা দীক্ষা।

ধনী লোকের, বড় বড় সাহেব সুবার বা হাকিম বাবুদের গা ঘেসিয়া সেলাম বাজাইয়া দশ জনের চক্ষে একটা প্রধান্য নেওয়ার প্রয়সাসও একটা ফ্যাশন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কতকগুলি গোবর গণেশ বা সোণার 'চাল কুমর' আছে 'সে গুলির বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই;—আছে শুধু হাম বড়া ভাবে প্রকট হইবার সখ ও তদ্দরুণ বে-কুবি। সেগুলিও এখন ভদ্র লোকের দুই চারিটা বাহ্যিক কায়দা Rehearsal দিয়া enlightened বলিয়া বলিয়া ফ্যাশন করিতে চাহে। "যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম" বাক্যের অনুসরণ করিয়া বহু ধূর্ত্ত

এবং ছোট লোক এই সকল 'আহাম্মখ'দের অর্থ ধ্বংশ, করিয়া থাকে। ভগবান্ বোধ হয় অর্থ বা ইহাদের চলিত ভাষায় কথিত 'টেকা' বা 'টেহা'র দ্বারাই ইহাদের কোন-রূপ বিদ্যা বুদ্ধি না দেওয়ার অভাব পূরণ করিয়াছেন।

অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাবে হইলেও দুই চারিটি বুকনী দেওয়া কথা বা বোলচাল দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ এবং সত্য হউক আর মিথ্যা হউক সর্ব্বদাই অত্যন্ত অক্লান্ত ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার বিষয় লোক-সমাজে এমন কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যেও বলিয়া বেড়ান এই দুইটিও আজকালের প্রবল ফ্যাশন। হাল ফ্যাশনের কেহই কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছুক নহেন যে, তিনি কোন সময়ও আলস্যে কর্ত্তন করেন। যিনি অধিকাংশ সময় ঘুমাইয়া কাটান তিনিও লোক-সমাজে বলিয়া বেড়ান Oh ! I am very busy. অথবা কেহ যদি তাঁহাকে কোন কাজের কথা বলে তিনি বলিয়া থাকেন I am sorry, I have no time. কেহ হয় ত, চেয়ারে বসিয়া ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতেছেন, এমন সময় কেহ দেখা করিতে আসিল, অমনি তাহাকে ঘরে ডাকিয়া সাক্ষাৎ করার পূর্ব্বে, তিনি কাগজের উপর খুব মনোযোগ ও ব্যস্ততার সহিত লিখিবার ভাণ করিয়া হিজি বিজি কত কি লিখিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য তাঁহার—আগন্তুক বুঝুন যে, তিনি অতি কাজের লোক!—একটুকু সময়ও তিনি আলস্যে কাটান না।

আর এক ফ্যাশন হইতেছে 'Not at home'. বাড়ীর কর্ত্তা যাহার সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছুক সে দর্শনার্থীরূপে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই কর্ত্তা লোকজনকে বলিয়া দেন "বল কর্ত্তা not at home" অর্থাৎ বাহিরে গিয়াছেন—বাটীতে নাই। দর্শনার্থী ব্যক্তি ইহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলেও নাচার—ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। বহু উমেদার যাঁহাদিগের দরবার করে এবং আপন পদ-গৌরবে বহুলোকের সহিত যাঁহাদিগের কারবার, একদিকে তাঁহারা এই Not at home ফ্যাশনের আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর করেন তাঁহারা,—যাঁহারা ঋণগ্রস্থ খাতকদার ও বাকী দারাণের তাগাদায় অধীর অথবা অন্য কোনরূপ চরিত্র মাহাত্ম্যে পলাতক আসামী। এ সকল বিলাতী রোগ। সাহেব মহোদয়গণের মধ্যেও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত! আমরা বাঙ্গালী, কাজেই অনুকরণ প্রভাবে আমরাও অনেকেই এই রোগগ্রস্ত। Fashion or Prestige এর অনুরোধে এবং নিজেকে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ চালাক ও কাজের লোক বা আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত করিতে আমাদিগের যে কত রকমেরই, মুখোস পরিতে, মিথ্যা আচরণ করিতে 'এবং নানা রকম ঢঙে Rehearsal দিতে হয় তাহার আর অবধি নাই। এ সকল ফ্যাশন দেখিলে স্থূলবুদ্ধি মূর্খেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়; কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম-দ্রষ্টা ও জ্ঞানী তাঁহারা এই সকল দেখিলে মমে মনে যথেষ্ট হাস্যরসের সুখানুভব করিয়া লন।

আজ কাল বংশ মর্য্যাদাহীন অনেক লোক নিজেদের নামের পরে কতকগুলি পতিত-পাবনী খিতাব যথা—'রায়' 'দাস' 'দেব' 'দত্ত' ইত্যাদি লাগাইয়া ভদ্রলোক হইবার ফ্যাশন করিতে চাহে। দুর্দ্দান্ত প্রজা-পীড়ক অনেক জমিদার বা সুদখোর নির্ম্মমপ্রকৃতি মহাজন 'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীর' ন্যায় হরিনামের ঝুলী লইয়া মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া ধার্ম্মিক বা পুণ্যাত্মা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইবার ফ্যাশন করেন। এইরূপে কত ফ্যাশন যে কত মূর্ত্তিতে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় সৃষ্ট হইতেছে ও বিলয় পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি মাত্র উল্লেখ করিলাম।

আর একটি বিশ্বব্যাপক ফ্যাশনের নাম 'চাল'। লোক সমাজে হামবড়া রূপে প্রকট হওয়াই ইহার মূলমন্ত্র। আজ কাল এই চাল বিশ্বব্যাপক এবং অতিশয় সংক্রামক। ছোট বড় প্রায় অধিকাংশেরই এই চালে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত। যিনি দিনান্তে অর্দ্ধপয়সার বাতাসা ভিজান একটু জল খাইয়াছেন তিনিই হয় ত বন্ধুসমাজে আসিয়া প্রকাণ্ড কএকটা উদ্গার তুলিয়া লুচী মাংস পোলাও কত কি খাইয়াছেন বলিয়া গল্প করিবেন। যিনি হয়ত পোনর-কুড়ি টাকা মাহিয়ানার মজুর, তিনিও হয় ত আধপেটা খাইয়া একসুট সাহেবী পোষাকের যোগাড় করিয়া, চোখে একটা চশমা আঁটিয়া গাড়োয়ানদের ফ্যাশনে চুল কাটাইয়া মুখে সাবান ঘষিয়া জিল্লা পালিস করিয়া, বন্ধুসমাজে বলিয়া বেড়াইবেন যে, তাঁহার মাহিয়ানা দেড়শত টাকা, ইহার উপর allowance ও পাইয়া থাকেন।

যাঁহার ঘর পুড়িলে এক মুষ্টি ভস্ম বাহির হইবে না, তিনি হয় ত বলিবেন, আমার বাড়ীতে চকমিলান দালান। মোট কথা লোকের কাছে জানান চাই যে তিনি একটা ভারী মান্য গণ্য ব্যক্তি। যাঁহার হয় ত কাঠা দুই ভূমি আছে তিনি আপনাকে জমিদার বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তারপরে আয়ের সম্পর্কে কথা হইলে ত কথাই নাই। যাঁহার আয় পাঁচ হাজার, তিনি বলেন পোনর হাজার। ইহাতে কোন দোষ দেওয়া যায় না; যেহেতু ইহা নিত্য প্রচলিত মিথ্যা-রূপে এখন সমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই চলিতেছে। যাহার একলক্ষ টাকার কারবার চলিতেছে তিনি হয় ত বলেন যে, আমার মূল্যধন পাঁচ লক্ষ টাকা। কেহ কেহ বা ব্যবসায় চালাইবার জন্য এই চালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উকীল কি বারিষ্টার সাহেব দুই বৎসর যাবৎ হয় ত একটি মক্কেলের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া চেয়ার গরম এবং ছারপোকার দংশন সহ্য করিতেছেন—একটি পয়সাও উপার্জ্জন নাই—কিন্তু তিনি বড় উপার্জ্জন-শীল ভাল উকীল বা বারিষ্টার বলিয়া বুঝাইবার জন্য ভাল বাসা ভাড়া করিয়া তাহা নানা আসবাব পত্রে সজ্জিত করিতেছেন। ফরসী, আলবলা তাকিয়া বা চেয়ার টেবিলের খুব ঘটা ফলাইয়া লইতেছেন। চাপরাসী আরদালীও রাখিতেছেন কেন না তাঁহার এই চাল দর্শনে যেন তাঁহাকে একটা বড় উকীল বা বারিষ্টার মনে করিয়া কোন মক্কেল তাঁহার ফাঁদে পা দেন। যাহারা নিতান্ত

সাধারণ শ্রেণীর লোক তাহারাও হয় ত নিজেদের দর ও ওজন বাড়াইবার নিমিত্ত বলিয়া থাকেন যে, অমুক অমুক রাজা মহারাজার সঙ্গে তাহাদের বড়ই ভাব অথবা তাঁহারা তাহাদের Personal friend, দেখা হইলেই, মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া প্রাসাদে লইয়া যান ও কিছুতেই ডিনার না খাওয়াইয়া আসিতে দেন না। কেহ বা বলেন জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনর সাহেবের সহিত তাঁহার বড় অন্তরঙ্গতা আছে, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই তাঁহারা অনেক কাজ করেন।

বড় বড় রাজা মহারাজা বা জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এই চাল দেখাইয়া 'হাম বড়া' রটাইবার জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন। কাহারও হয় ত ইয়াদিকৃদ্দ পাঠ লিখিতে লিখিতে ঋণে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি যায় যায় হইয়াছে তথাপিও চাল দেখাইবার জন্য যেখানে একশত টাকা খরচে বাড়ী হইতে কলিকাতা যাইতে পারিতেন সেখানে এক হাজার টাকা রোজে ষ্টীমার ভাড়া করিয়া কলিকাতায় লাট সাহেবের দরবারে গেলেন এবং পাঁচ সাত দিন তথায় থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার বাদসাহী চাল চালিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেহ বা বাড়ী ঘর বন্ধক দিয়া দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া লাট সাহেবকে একটুকু জল খাওয়াইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, যদি লাট সাহেব তাঁহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃত অবস্থা জানিতেন তাহা হইলে তিনি কখনও তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন কি না তাহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এইরূপ যে কোন

প্রকারেই হউক 'আমি সকলের বড়' ইহা প্রকাশের জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তদনুরূপ চাল দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন না।' শেষে অন্তিম অবস্থায় তাঁহাদের কেহ দেউলিয়া হইয়া, কেহ বা Courts of Wards এ অবশিষ্ট সম্পত্তি দিয়া গবর্ণমেণ্টে অযোগ্য নাম লিখাইয়া, স্বল্প কিছু মোসাহেরা পাইয়া কোনরূপে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন।

যাঁহারা চাল দেখাইয়া দর বাড়াইতে বা গণ্য মাণ্য হইতে চাহেন তাঁহ দিগকে খুব অনর্গল মিথ্যা কথা কহিতে অভ্যাস করিতে হয়। কারণ, এবম্বিধ অভ্যাস ব্যতিরেকে এতাদৃশ মিথ্যা আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতে মুখে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আর ইহাদের স্মরণ শক্তিও খুব প্রখর থাকা দরকার। তাহা না হইলে পদে পদে ইহাদিগকে নাকাল হইতে হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, Liars should have strong memory. এই চাল এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রেই প্রচলিত। অনেক স্থলেই, এই চাল না দেখান একটি পাপ মধ্যে গণ্য। এই শ্রেণীর অনেকেরই বাড়ীতে হাঁটুর উপর কাপড় কিন্তু বাহিরে খুব কোঁচার পত্তন! ভিতরে আহার হয় ত পান্থাভাত, আর বাসী ফুলুড়ি, কিন্তু বাহিরে উদ্গার দেন কালিয়া কোপ্তার—অন্তরে কিছু না থাকুক, কিন্তু মুখে গাল ভরা কথার বাহার খুব আছে।

আজ কালের দিনে prestige একটা বড় সাংঘাতিক ফ্যাশন। সমস্ত দেখি, সমস্ত বুঝি, কিন্তু তথাপি prestige

এর অনুরোধে কান্না আসিলেও হাসির অভিনয় করি। ফলে, আজ কাল যেমন বিশ্বব্যাপক ফ্যাশন হইয়াছে 'চাল'—ঠিক তেমনই বিশ্বব্যাপক fashion হইয়াছে Prestige. Prestige'এর খাতিরে না হইতে পারে এমন কোন কার্য্যই এখন সভ্য জগতে নাই। বলা বাহুল্য শিক্ষিত ও সভ্য জাতি বা সমাজ এই উৎকট Prestige রোগে যতটা আক্রান্ত, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত সমাজ তাহার সিকি ভাগও নহে। Prestige এর দেহ দুইটি তত্ত্ব দ্বার গঠিত। একটি চাল—অর্থাৎ বড়মান্‌ষি বা মান ইজ্জতের দাম্ভিকতাপূর্ণ আজগুবি রকম আদব-কায়দা—আর একটি হইল অভ্রান্ততা বা অভ্রান্তি অর্থাৎ আমি যাহা একবার করিয়াছি—লোক সমাজে যে সিদ্ধান্ত একবার প্রচার করিয়াছি তাহা মনে মনে ভয়ানক অন্যায় বুঝিলেও তাহাই ন্যায় বলিয়া বহাল রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা। আমি যদি মনে প্রাণে বিবেক বুদ্ধিতে নিশ্চিতরূপেও বুঝি যে, ইহা অন্যায়—তথাপি একবার হুকুম দিয়া, আবার তাহা ফিরাইয়া লইলে কি জানি যদি লোকের নিকট হালকা হইয়া পড়ি, এই ভয়ে সেই অন্যায়কে ন্যায় অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং অন্ধকারকেই আলো বলিয়া আমাকে চালাইতে হইবে। সভ্যতার প্রধান অঙ্গই এখন হইল prestige রক্ষা। অন্যায়, কপটতা, মিথ্যা-আচরণ, নৃশংসতা, দাম্ভিকতা সকলই prestige রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

এলোপ্যাথ ডাক্তার নিজের বাড়ীর ছেলেপিলের অসুখ হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেন, কিন্তু prestige এর খাতিরে বাহিরে বলিয়া বেড়ান যে 'হোমিওপ্যাথি' কিছুই নয়। অনেক সাহেব প্রাণে ইচ্ছা থাকিলেও prestige এর খাতিরে নেটিভের সঙ্গে মেশামিশি করিতে পারেন না। মোট কথা, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অন্যায় বা ভুল হইয়াছে বুঝিলেও prestige এর অনুরোধে তাহা সংশোধন করিব না—এমন কি যথা-সর্ব্বস্ব গেলেও prestige ছাড়িব না এই হইল এ কালের ফ্যাশন!

অনেক ভূম্যধিকারী বা ধনী-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক অবস্থাবিপাকে পড়িলেও সাবেক নাম কাম বজায় রাখিবার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টায় দুই একবার মাত্র অন্তিম-দীপ্তি প্রকাশ পূর্ব্বক চির অন্ধকারে ডুবিয়া যান।

আমি এ প্রবন্ধে যে সকল ফ্যাশনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার অধিকাংশই অধুনা কয়েক বৎসর হইতে ভগবানের কৃপায় দেশে একটু ম্লান হইয়া আসিয়াছে। এখন ঐ সকল ফ্যাশন করিলে অনেক স্থলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। দেশের যুবক বৃন্দের আহার-বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-পদ্ধতি সকল বিষয়েই যেন একটু অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়াছে—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে; ভগবানের কৃপায় ইহাদের মতি প্রবর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ফ্যাশন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—ভবিষ্যতেও বহু হইবে। ফ্যাশন কর, তাহাতে বিন্দু মাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা যেন সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, মিতব্যয়িতা ও মঙ্গল এই সকলের অবিরোধী হয় এবং তাহাতে যতটা জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে ততই ভাল।

অতএব ভালবাসা।

অমৃত নামে যদি জগতে কোন পদার্থ থাকিয়া থাকে, প্রেমই সেই অমৃত। প্রেমের পুণ্য মাহাত্ম্যেই জগৎপাতা জগদীশ্বর প্রেমময়রূপে জগৎ-পূজ্য। মানুষ এক দিকে যেমন জ্ঞান-সমুদ্রের কূল কিংবা তল পায় না, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রও তাহার নিকট চিরদিনই অপার ও অতলস্পর্শ থাকিয়া যায়। এই অনন্ত সৃষ্টি-রহস্যের যে দিকেই কেন দৃষ্টিপাত না কর, সর্ব্বত্রই প্রেমের মহিমা ও প্রেমের জয়। ভালবাসা এই প্রেমেরই সরল সংস্করণের নামান্তর মাত্র। মানুষ যে সুখ-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিতেছে এবং অবশেষে অধিকাংশ স্থলেই বিফল মনোরথ হইয়া ক্লান্ত দেহে ও অবসন্নপ্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে যথার্থ ভালবাসা বা প্রেম ব্যতীত সে সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

সুখ কি, দুঃখ কি ?—কিসে সুখ হয়, কিসে দুঃখ হয়, এই গভীর দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দান অথবা এই জটিল তত্ত্বের বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমি এ স্থলে এই মাত্র বলিতে চাই যে, ভালবাসার অন্তর্নিহিত কোন না কোন প্রকার সুখ-মধুর লালসায়ই জগতের মন-মধুকর চির-লালায়িত ও চির-উন্মত্ত।

এক্ষণে কথা এই যে, এ হেন ভালবাসা বা প্রেমের মুখ্যতত্ত্ব কি? আমি এই প্রশ্নের উত্তর যতটা আলোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার ইহাই দৃঢ় ধারণা যে, ইহার মুখ্যতত্ত্ব ও সার কথা স্বাধীনতা, সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতা। সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতা উহার উৎপত্তিস্থল এবং স্বাধীনতার সঞ্জীবন অমৃতরস-সঞ্চারে উহার পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও পরিরক্ষণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এবং পরিতাপের কথা যে, পৃথিবীর প্রায় পোনর আনা ভালবাসা বা ভালবাসার সুখ-স্বপ্নই স্বাধীনতা বা স্বাধীন নির্ব্বাচনের সম্পর্ক-শূন্য। মানুষ অধিকাংশ স্থলেই স্বাধীনভাবে আপনার সমজাতীয় প্রাণ বা হৃদয় খুঁজিয়া লইয়া প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণে, প্রেমের মঙ্গল্য সূত্র বন্ধনের সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। অবস্থার নিপীড়নে, ক্ষতি লাভ গণনার বশবর্ত্তী হইয়াই সামাজিকগণ প্রায়শঃ প্রেমের আবাহন বা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। কখন পেটের দায়ে, কখন কশাঘাত বা সম্মান হানির ভয়ে, কখনও বা স্বকীয় নানা প্রকারের স্বার্থ উদ্ধার কল্পেই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ভালবাসার আদান-প্রদান বা দোকানদারি চলিতেছে।

এই ভালবাসাকে কি বিশেষণে অলঙ্কৃত বা কোন্ আখ্যায় অভিহিত করিলে ইহার স্বরূপতত্ত্ব প্রকট বা আভাষিত হইতে পারে, অমি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম; অবশেষে উপপত্তি, যুক্তি ও প্রমাণের সকল কথা উহ্য রাখিয়া সকল প্রকার চরম সিদ্ধান্তের অগ্রদূত—"অতএব" এই অব্যয়টিকেই ইহার

মর্ম্মার্থজ্ঞাপক উপযুক্ত বিশেষণ মনে করিয়া লইলাম। এই শ্রেণীর "অতএব ভালবাসা" যে প্রকারান্তরে চিত্তের কুলটাবৃত্তি তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অতএব ভালবাসার লীলাক্ষেত্র বা ক্রীড়াভূমি অনন্ত। ঘরে, বাহিরে, হাটে বাজারে, বিলাসের বিনোদ কুঞ্জে, পদস্থের উচ্চ দরবারে, জীবন-সংগ্রামের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর,—যেখানেই অন্তর্দ্দর্শী স্থির চক্ষু খুলিয়া দেখিবার মত চাহিয়া দেখ, সেই খানেই অতএব ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির বিচিত্র অভিনয় দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইবে!

তোমার দৃষ্টি বিষ উদ্গীরণ করে, তোমার বাক্য তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় শ্রোতার মর্ম্মচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তোমার আবহাওয়ায় সদ্য প্রাণঘাতী মহামারীর বীজাণু ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু তথাপি তোমার হাতে আমার গুরুতর স্বার্থ; সুতরাং "তুভ্যং নমঃ" বলিয়া আমি ভাব-মুগ্ধ প্রেমিকের প্রাণে প্রতিনিয়ত তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হই; তোমার পুচ্ছ ধরিয়াই এ তুচ্ছ জীবন সার্থক করিতে ইচ্ছা করি, ইহা কেন?—না, তুমি আমার অতএব বন্ধু, অতএব ভালবাসার জন। আমি যাহার সর্ব্বনাশ করিতে মনে প্রাণে উৎসুক, তুমিও তাহার মর্ম্মান্তিক শত্রু, তুমি অন্য প্রকারে যেমনই হওনা কেন, তুমি আমার অতএব ভালবাসার পাত্র।

যাঁহারা রাজা অর্থাৎ রঞ্জকের প্রাণ লইয়া প্রজাদের ন্যায়-লভ্য সুখ-শান্তি বিধান করিবার জন্য রাজ-শক্তিরই

ক্ষুদ্র প্রতিনিধি বা কণিকারূপে রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও নিযুক্ত তাঁহাদের মধ্যেও এমন কেহ কেহ আছেন, যাহাদের প্রভুত্ব লোক-ভয়ঙ্কর দানবত্বেরই নামান্তর মাত্র। তাদৃশ প্রতিনিধি প্রভুদিগের প্রভুশক্তির পরিচালনার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যত জন বাস করে, তাহাদিগের প্রায় সকলকেই সেই দণ্ডধারী পুরুষের রোষ-রক্তিম বা লোভারুণ কটাক্ষে ন্যূনাধিকরূপে অহোরাত্র কম্পিত থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি ঐ সকল ব্যক্তির আন্তরিক ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধা থাকা মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ; কিন্তু ভ্রুকুঞ্চন যাহাতে কশাঘাতে পরিণত না হয়, তজ্জন্য দেখা হইলেই, বিনয়-নম্র হাস্যমুখে স্কন্ধটি আজানু পর্য্যন্ত নোয়াইয়া সেলাম, নমস্কার বা প্রণাম দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি অতএব ভালবাসা কিংবা অতএব প্রীতি শ্রদ্ধা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন বাধ্য হইতে হয়।

দেশস্থ রাজা বা জমিদারদিগের মধ্যে যাহারা বাঙ্গালার ইতিহাস-অপকীর্ত্তিত দেবীসিংহেরই স্থুলভ সংস্করণ এবং কুশীদজীবী মহাজনদিগের মধ্যে যাহারা ৺কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "নরমেধ-যজ্ঞের" রত্নদত্ত, তাহাদের নিকটও যাইয়া দেখ লোকে কত ভাবে কত সাজে অতএব ভালবাসা বা অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার মধু বর্ষণ করিতেছে। ধন্য তুমি স্বার্থ, ধন্য তুমি ভয়! তোমাদের প্রভাবে লাঞ্ছনার তীব্র কষাঘাতে মৃতপ্রায়, প্রতিহিংসা-বহ্নিতে মনে-প্রাণে অস্থি পঞ্জরে দগ্ধ, কিংবা কঙ্করময় মরুভূমি সদৃশ প্রাণ হইতেও

আশার মৃদু মোহন বাক্য সাহায্যে অতএব ভালবাসা বা ভক্তির পীযূষধারা বহির্গত হয়! আমরা জানি এ দেহ নশ্বর; এ সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়; পার্থিব-সম্পদের এক কণিকাও এ মরধাম হইতে চির-বিদায়ের সময় কেহ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না,—কিন্তু এই সকল জানা সত্ত্বেও তোমাদের প্রভাব কত অমোঘ! এ জগতে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন, বিবেক বলিদান ও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবার পক্ষে তোমাদের মত প্রভাব আর কাহারও আছে কি?

লৌকিকতা ও সামাজিকতার হিসাবেও প্রতিনিয়ত মানুষকে কতকগুলি অতএব-প্রীতি শ্রদ্ধা বা শিষ্টতার কপট অভিনয় দ্বারা ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কপট অভিনয়ের এক লীলাক্ষেত্র নব্যযুগের সান্ধ্য-সমিতি (Evening-party) উদ্যান-সমিতি (Garden-party) ডিনার পার্টি এবং বিবিধ প্রীতি-সম্মিলনী; অন্য রঙ্গভূমি, পুরাতন রীতির ভোজের বা নিমন্ত্রণের বৈঠক।

এই সকল লীলাক্ষেত্রে সাদরে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে চলে না। অথচ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেই কতকগুলি ক্লেশকর কপট অভিনয় করিতে হয়। যাহাদিগের সহিত কোন দিকেও সমপ্রাণতা নাই এমন কি যাহাদিগকে দেখিলে প্রাণে ভীতি বিরক্তি বা ঘৃণার ভাব স্বতঃই জাগিয়া উঠে, তাহাদিগেরও সঙ্গে দেখা হইবামাত্রই, বেগে সম্মুখীন হইয়া ওষ্ঠদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত পূর্ব্বক হাসিয়া হ্যাল্লো বা How do you do? বলিয়া করমর্দ্দন করিয়া

অতএব-ভালবাসা বা অতএব-প্রীতির উৎস খুলিয়া দিতে হয়। যেখানে হয় ত চিত্তের সরসতাউৎপাদক কথোপকথনের পরিবর্ত্তে আছে কেবল "প্রমোশন" "ডিগ্রেড" Transfer ও গোলামীর বা নোকরির অন্যান্য মামুলী কথা, সেখানেও হয় ত, বহিস্থ ব্যক্তিকে অন্তরে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিলেও, বাহিরে সহর্ষমুখে বাক্য-সুধা পান করিয়া অতি প্রীতিলাভ করিতেছেন, এইরূপ কপট অভিনয় করিতে হয়। যেখানে আন্তারিকতা প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেখানে কেবল অভিনয়েরই প্রাচুর্য্য, দুই চারিটা "চোরা" "ছেড়া" ইংরাজী বুলি বলিয়া নিজেকে বিদ্বান intelligent এবং "most up to date" বলিয়া পরিচিত করিতে যেখানে সমবেত জন-মণ্ডলীর সকলেরই প্রতিপদে হাস্যজনক অস্বাভাবিক প্রয়াস, সেখানে হৃদয়বান্ ব্যক্তি চিত্ত পরিতৃপ্তির কিছুই দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসেন।

যেখানে সমপ্রাণতা নাই, কাজেই ভালবাসা জনিত বন্ধুত্বও নাই, সে খানে চতুর্দ্দিকে লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও মানুষ নির্জ্জন বোধ করে। Bacon বলিয়াছেন For a crowd is not company and faces are but gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal where there is no love. সখের ডিনার-পার্টিতেও ঐরূপ শিষ্টতার শাসনে বাধ্য হইয়া অনেক সময় ন্যক্কারজনক অখাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পুরাতন রীতির ভোজের নিমন্ত্রণের বৈঠকে প্রায়শঃ ক্ষুধায় কণ্ঠাগত প্রাণ

হইয়াও পলান্ন' বা 'কোরমা" টা নামিবার প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত শুষ্কমুখে ভদ্রতার ও সামাজিকতার কতকগুলি বাঁধি বোল আওড়াইয়া, নিদান পক্ষে কড়িকাঠ গণনা পূর্ব্বক সময় ক্ষেপণ এবং নিমন্ত্রণকর্ত্তার মন রক্ষার নিমিত্ত "এ বিলম্বে কোনই কষ্ট হইতেছে না; সাড়ম্বর ভোজ ব্যাপারে ইহা অপরিহার্য্য" এই বলিয়া বারংবার শুষ্কমুখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়! ইহাও অতএব—শ্রেণীভুক্ত প্রীতি শ্রদ্ধা ও শিষ্টতার এক বিচিত্র অবস্থা

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ভালবাসার মূল-মন্ত্র স্বাধীনতা। তুলসী চন্দন যেমন দেবতার পূজার উপকরণ; ভালবাসাও সেইরূপ মানব জগতে হৃদয়িক আরাধনার একমাত্র সম্বল। কিন্তু তুলসী ও চন্দন যেমন পবিত্র স্থান হইতে সঙ্কলিত না হইলে দেবতার পূজায় উহার ব্যবহার শুধুই দূষ্য নহে,—পাতক জনক, ভালবাসাও সেইরূপ স্বাধীনতার সুখ-সমীর সেবিত সুরভি-শীতল হৃদয়-কানন হইতে সংগৃহীত না হইলে হৃদয়ান্তরের পূজার অযোগ্য। এই শ্রেণীর স্বাধীনতা আর উদভ্রান্ত-গতি ভোগলিপ্সা বা জড়ীয় সুখ-তৃষ্ণার স্বেচ্ছা-বিহার এক কথা নহে।

আর অধিক কি বলিব, ভালাবাসার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া আমরা যে আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া চলিয়াছি, সেই আলোকে বঙ্গসমাজকে পরীক্ষা করিলে, যেখানে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হেতু একের নাম 'প্রাণাধিক' 'প্রিয়তম' আর অন্যের নাম 'প্রাণাধিকা' 'প্রিয়তমা', সেই স্থানেও

স্বাধীনতা সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতার পরিমিশ্রণে অমৃত-তুল্য প্রকৃত ভালবাসা সর্ব্বত্র দৃষ্টি-গোচর হয় কি? ঈদৃশ অনেক স্থলেই হয় ত কোথাও ভালবাসার নাম কর্ত্তব্য কোথাও অনুগ্রহ, কোথাও সংস্কার-লব্ধ ভক্তি বা স্নেহ কোথাও বা কেবল মানব-জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের একটি অপরিহার্য্য অবলম্ব! শুধু বঙ্গ সমাজ বা ভারতীয় সমাজ বলিয়া কথা কি? যে সকল দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনে স্বাধীন নির্ব্বাচনের সামাজিক অধিকার আছে, সে সকল দেশেও, কখনও বা স্বার্থের সন্ধুক্ষণে, কখনও বা রূপজ-মোহের ক্ষণিক মোহে অথবা অন্য কোনরূপ দুর্ব্বুদ্ধির অন্ধ প্রেরণায় যথার্থ ভালবাসার ছদ্ম আবরণে অতএব-ভালবাসার যথেষ্ট অভিনয় হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ও উপন্যাসাদি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতএব-ভালবাসা বা অতএব-ভক্তি দ্বারা সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনেক স্থলে সফলতা সাধন সম্ভবপর হইলেও সত্যপ্রিয় সত্যদর্শী ব্যক্তির প্রাণে উহাতে কোন সুখ বা শান্তির সঞ্চার হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এ অবস্থার প্রতিকার কি? ধর্ম্মের কিরূপ সংস্করণ, সমাজ বন্ধনের কিরূপ বিশ্লেষণ বা দৃঢ়ী করণ অথবা মানবীয় স্বার্থ সংঘর্ষের কীদৃশ সমীকরণ দ্বারা অনায়াসে উল্লিখিত সত্যপ্রিয়, সত্যদর্শী ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রাণ-নিহিত প্রেম-সুখ-পিপাসার পরিতর্পণ ও হৃদয়ে প্রকৃত শান্তির সঞ্চার হইতে পারে, কে তাহার পথ প্রদর্শন করিবে?

চির তৃষাকুল মানব-হৃদয় কোথায় যাইয়া কাহার কাছে তৃষিত প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? চিত্তবৃত্তির যেরূপ সংগঠন, হৃদয়ের যেরূপ শিক্ষা এবং অন্তশ্চক্ষুর যেরূপ দৃষ্টিবলে কোন মানবই অতএব-ভালবাসার কৃত্রিম চমকে আত্মহারা হইয়া আপনি পরের ক্রীড়া পুত্তল সাজিবে না, অপরকেও ঐ রূপে আপনার ক্রীড়া পুত্তল করিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করিবে না; সকলেই প্রেমের বিনিময়ে ও প্রাণের ব্যবসায়ে কাচের আমদানী না করিয়া প্রকৃত কাঞ্চনেরই আশ্রয় লইবে—জানি না, পৃথিবীর সে সুদিন বা সে স্বর্ণযুগ কবে আসিবে? কখনও আসিবে কিনা—তাহাই বা কে জানে?

মানবীয় সভ্যতাকে এক হিসাবে গিল্টি বা বার্ণিশ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। গিল্টির প্রসাদে তামা পিত্তল এবং লোহাও যেমন সময়ে সময়ে সোণার চমক দেখাইয়া মন ভুলায় সভ্যতার উপর-ভাসা চাক-চিক্যেও তেমন অনেক সময় বর্ব্বর-বাবু, দানব ধর্ম্মাবতার, বঞ্চক ভট্টাচার্য্য এবং কামুক কুক্কুরও জিতেন্দ্রিয় ঠাকুররূপে ক্ষণকাল পূজা পাইয়া থাকে। সভ্য জগতে সভ্যতার গুণকীর্ত্তনে যদিও দিগ্‌বলয় অহোরাত্র নিনাদিত হইতেছে, তথাপি ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, অনেকস্থলেই সভ্যতা, ছদ্মাচার ও ছদ্ম ব্যবহারের একটা প্রকৃষ্ট বহিরাবরণরূপে ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত! মানুষ লোক-চক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জন প্রদেশে অন্ধকারে এক বস্তু এবং লোক-চক্ষুর সান্নিধ্যে প্রফুল্ল দিবালোকে আর এক পদার্থ!

মানুষ যেমন একদিকে সুপরিচ্ছদে আপন অঙ্গের খুঁৎ ও ক্ষত ঢাকিয়া লইয়া বহির্গত হয়, তেমন অন্যদিকে মনের উপরেও, সেই সময়ে, অতি সাবধানে এমন একটা আবরণ দিয়া লয় যে, যে দেখে, সে-ই প্রায়শঃ শ্যামকে রাম বুঝিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রেম বা ভালবাসার বাণিজ্যে স্বাধীন-নির্ব্বাচনের অবাধ অধিকার থাকিলেও, কোন্ স্থানে ভালবাসার মুখ্য উপাদান, প্রাণের সমতা ও হৃদয়ের সমগ্রামতা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া দুঃসাধ্য অথবা একবারেই অসাধ্য হইয়া উঠে।

এই অবস্থায় পুনরপি এই প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে যে, তবে কি মানব স্বভাবতঃ আজীবন লালায়িত রহিয়াও, কোন কালে কোন অবস্থাতেই সমধর্ম্মাক্রান্ত প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া অমৃত-আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইবে না? এ ক্ষেত্রে কি তবে তাহার কোনই আশা নাই? আমি বলি, আছে। জগতের গতি ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বনিয়ন্তার কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-শূন্য নিরর্থক বা আকস্মিক ঘটনা নহে। তিনি যেমন মানুষের প্রাণে তৃষ্ণা বা প্রবৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, তেমনই তাহার পরিতর্পণের জন্যও সর্ব্বত্র বিশদ বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, প্রাণে সৌন্দর্য্যানুরাগ,—বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের অনন্ত দৃশ্য; নাসিকায় ঘ্রাণ—বহির্জগতে সুগন্ধ ও সৌরভ; রসনায় স্বাদ—

বহির্জগতে সুস্বাদু দ্রব্য-সম্ভার। এই অবস্থায় মানব-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বজনীন বিধিনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রেম-তৃষ্ণা বা ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবাহ যে সর্ব্বথা নিরর্থক হইবে ইহা কখনও সম্ভব-পর নহে। প্রেমের চৌম্বক আকর্ষণে প্রেমের প্রাণ পরস্পরের অভিমুখে নিত্য আকৃষ্ট হইতেছে ও হইবে, এই বিধাতৃবিধানের কিছুতেই অন্যথা নাই। Like attracts the like, যে যেমন সে তেমনটিকে সততই আপন পানে টানিয়া লইতেছে, সৃষ্টির অণু পরমাণু হইতে ঐ জগদ্বিভাসক ভানু পর্য্যন্ত সমস্তই এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। এই হেতুই, আমার বিবেচনায়, ভালবাসার সারতত্ত্ব সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতার অনুসন্ধানে প্রতিনিয়ত গলদ্ঘর্ম্ম হইতে যাওয়া সর্ব্বথা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। এরূপ প্রয়াস ও পরিশ্রম প্রায় সকল স্থলেই মরীচিকা-ভ্রান্ত তৃষিত পান্থের মরুভূমিতে বারি অন্বেষণের ন্যায় সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, তুমি যে প্রাণ লইয়া, যে গ্রামে অবস্থিত আছ, কোনরূপ প্রতিকূল অন্তরায় বা অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধক হেতু বাধাপ্রাপ্ত না হইলে সেই গ্রামের হৃদয় ও প্রাণ আপনি তোমার পানে আকৃষ্ট হইবে, আপনি আসিয়া প্রাণের পীযূষ বিনিময়ে, আপনি শীতল হইবে তোমারও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে। বর্ত্তমান সমাজ-বন্ধন, বিবিধ স্বার্থের বিকট সংঘর্ষণ ও সাংসারিক অপরিহার্য্য প্রয়োজনের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যদি কোন স্থানে প্রেমিক পতি সমপ্রাণ ও সমগ্রামের প্রেমিকা পত্নী লাভে

কৃতার্থ হইতে পারে, প্রেমপ্রবণ বন্ধু যদি যথার্থ প্রাণের মানুষ পাইয়া প্রাণের বিনিময়ে সমর্থ হয়; তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও যে, তাহা তাহার স্বোপার্জ্জিত বা যত্ন-লব্ধ সম্পদ্ নহে, তাহা নিতান্তই ভগবৎকৃপা বা দৈবানুগ্রহের ফল। কিন্তু যাহার ভাগ্যে দৈবাৎ এই মণিকাঞ্চন সংযোগ না ঘটে, (অনেকের ভাগ্যে ইহা না ঘটিবারই কথা) যাহাকে চিরজীবন অবস্থা বৈগুণ্যে অতএব-ভালবাসারই আশ্রয় লইয়া নীরস কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক জীবন-ব্রতের শেষ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহার পক্ষেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আজ যাহা হইল না, কাল তাহা হইতে পারে। তাই বলি, নিরাশ হইও না, ধীর ও স্থিরভাবে তোমার বিধি-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। তোমার সম্মুখে অফুরন্ত পথ,—অনন্তের যাত্রী তুমি, অনন্ত জীবনের জীব। এক দিন না এক দিন, তোমার প্রাণের তৃষ্ণা ও মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই হইবে। ইহ-জীবনে আশার সাফল্য লাভ অবস্থা-বিপাকে তোমার ভাগ্যে ঘটিল না, পরপার-বিহীন পর-জীবন তোমার সম্মুখে। যেখানে পার্থিব সমাজ-বন্ধন নাই, সংসার সংগ্রামের ভীষণ গর্জ্জন ও হুহুঙ্কার নাই, যেখানে সভ্যতার নামে ছদ্মাচার এবং কপটতার কৃত্রিম আবরণের বৃথা আড়ম্বর নাই,—আছে কেবল নির্ম্মুক্ত স্বাধীন-জীবনের সমপ্রাণতা ও সমগ্রামতার অব্যর্থ ও অমোঘ আকর্ষণ—সেই পর জীবন তোমার সম্মুখে। সেই পুণ্যময় পবিত্রধামে অবশ্যই একদিন তুমি তোমার প্রাণের মানুষের দেখা পাইবে। সেখানে প্রেম আছে,

প্রেমে আত্মদান ও উচ্ছ্বাস আছে, নাই কেবল স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্কোচন ও প্রয়োজনের বিকর্ষণ। সে খানে প্রেমের নাম প্রেম, সোণার নাম সোণা। গিল্টি করা তামা সেখানে সোণা বলিয়া চলে না। সেখানে প্রকৃত ভালবাসা আছে, অতএব-ভালবাসার কুলটা-বৃত্তি সেখানে একেবারেই অসম্ভব। তাই পুনরপি বলি যে, এক দিন তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই হইবে; ইহলোকেই হউক আর পর লোকেই হউক, এক দিন অবশ্যই তুমি তোমার প্রাণের মানুষের অমৃতময় বিমল আকর্ষণে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে সমর্থ হইবে। শর-শয্যায় শায়িত শান্তনুনন্দন যেমন ভোগবতীর চির-স্নিগ্ধ শীতল প্রবাহে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনই লাঞ্ছনার অসংখ্য কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকিলেও, একদিন না এক দিন প্রকৃত প্রেমের অমৃত আস্বাদে চিরতৃপ্তি ও চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

"When, freed from earth, unlimited its powers,
Mind shall with mind direct communion hold,
And kindred spirits meet to part no more."

সমাপ্ত।